মালঙ্গীর কথা

(উপন্যাস)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—সাড়ে চার টাকা—

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকা

প্রভু প্রেস, ৩০, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মু

এই লেখকের—

গৌরীগ্রাম

শতাব্দী

কাজল

কুরপালা

চক্রবাক্

মৃত ও অমৃত

কয়েকটি গল্প

এক

ছোট্ট খ'ড়ো ঘর। সামনের বারান্দার চালা এত নিচু যে প্রায় কোমর পর্যন্ত মাথা নোয়াইয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। একটা হোগলার বেড়া ঘরখানাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

ডানদিকের অংশে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা কেরোসিনের কুপি জ্বলে, তার মাথায় লাল একটা শিখা—অন্ধকার পটভূমিকায় শিল্পীর টানা উজ্জ্বল রেখার মতন। রেখার প্রান্তে ধোঁয়ার পুচ্ছ বাতাসে কাঁপে, হোগলার বেড়ার উপর আঁধার ও আলো যেন পাশাপাশি নাচিয়া বেড়ায়।

ঘরখানা কাদায় প্যাচপ্যাচ করে, মাটির ভিভের উপর কেঁচো হাঁটে।

কুপির নিচে ভিজা ময়লা কাঁথায় একটা শিশু শুইয়া—শীর্ণ, শিবনেত্র, সারাদেহে কালির পোঁচ। এক একবার তার হাতে পায়ে খিল ধরে, ক্ষুদ্র দেহ ধনুকের মতন বাঁকিয়া যায়। ছেলেটি যন্ত্রণায় কাতরাইয়া ওঠে, মনে হয় বাজের থাবার ভিতরে পাখীর ছানা চিঁ চিঁ করিতেছে।

পাশে বসিয়া একটি তরুণী, বয়স কুড়ি বাইশ। ফরসা রং, ছিপ-ছিপে গড়ন, টিকালো নাক। মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু তার মুখে একটা বিষাদের ছাপ। পরনের ছিন্ন মলিন বসনে, লজ্জা নিবারণের চেয়ে দেহের সেই করুণ রূপই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে শিশুটির হাতে-পায়ে সেঁক দেয়। সে কাঁদিয়া উঠিলে সান্ত্বনা দেয়, না কাঁদে না, সোনা মানিক আমার, নীলু আমার।

সেই বাণী ছেলের কানে পৌছায় না। সাদা পাথরের মতন নিষ্পলক চোখ দু'টি দিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া থাকে।

এই দৃশ্যের সঙ্গে তরুণীর পরিচয় বড় নিবিড়। তার স্বামীরও ঐ রকমই হইয়াছিল। সে বাঁচিল না। ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া মায়ের চিন্তাধারা সেই দিকেই অগ্রসর হয়। তার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে।

নীলুর মাথার ধারে খুঁটিতে হেলান দিয়া, মাটিতে পা ছড়াইয়া আর একটি স্ত্রীলোক ঝিমাইতেছিল। তার হাতে একখানি পাখা। বয়স অনুমান করা মুশকিল; ত্রিশ চল্লিশ এমন কি পঁয়তাল্লিশও হইতে পারে। গায়ের রং কালো, সামনের তিনটি দাঁতই উঁচু, বুকের কাপড় খোলা।

সে এক একবার জাগিয়া ওঠে, তিন চার বার জোরে পাখা নাড়ে। আবার শুরু হয় ঝিমানো আর নাক ডাকা।

ছেলেটির অন্তিম অবস্থা, সামনে জা'য়ের এই রূপ আর বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। মাটির বুক ফুঁড়িয়া কালো কালো গাছগুলি দৈত্যের মতন দাঁড়াইয়া আছে। তারা হাত পা মাথা নাড়ে। পরস্পর কি যেন ইশারা করে, ফিস ফিস কথা কয়।

সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘরের পাশে একটা ব্যাঙ অবিশ্রান্ত ডাকে, ডাকে না যেন অভিশাপ দেয়। তরুণী একবার ঢিল ছুড়িয়া মারিয়াছিল। ব্যাঙটার চীৎকার সেই হইতে আরও বাড়িয়াছে।

তরুণীর ভয় করে। সে একটু নড়ে না, বিছানা ছাড়িয়া ওঠে না। ভাবে, উঠিলে যদি—

তার বিশ্বাস স্বামীর অসুখের সময় তার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া না উঠিলে যমের সাধ্য ছিল না তাকে ছিনাইয়া নেয়। কী কুক্ষণেই না উঠিয়াছিল। নীলুর বেলায় সে ভুল আর করিবে না।

তার চোখ ছেলের দিকে আর কান বাহিরে। বাহিরে কান পাতিয়া সে কিসের যেন প্রতীক্ষা করে। আর ভাবে নিজের ভাগ্যের কথা।

তরুণীর নাম কুন্তী। তার জন্ম চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে। বানের জলে গাছপালার মতন সেখান হইতে সে এই অচিন দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে দু'মুঠা ভাতের জন্য বাপ মা তাকে কলিকাতায় লইয়া আসে। না খাইতে পাইয়া বৃদ্ধ পিতা ডাস্টবিনের ধারে মরিয়া থাকে। তার দু'দিন পরে পুলিস কুন্তীর মাকে লরিতে করিয়া লঙ্গরখানায়

চালান দেয়। লঙ্গরখানার সম্পর্কে এই মেয়েটির মনে ছিল এক অদ্ভুত বিভীষিকা। সে তখন ছুটিয়া এক চা'এর দোকনে আশ্রয় নেয়। দোকানের মালিক এই মালঙ্গী গাঁয়েব নিশিকান্ত তাকে বিবাহ করিয়া দেশে আনে। ভিন্‌দেশী অপরিচিতা মেয়েটিকে সমাজপতিরা গ্রহণ করিতে চান না। সবচেয়ে বেশি আপত্তি করে প্রৌঢ় উপেন। নিশিকান্তর স্ত্রী অত সুন্দরী হইবে ইহা যেন সে সহ্য করিতে পারে না।

কুন্তী যে তাদের স্বজাতির মেয়ে, কুলীন কন্যা ইহা প্রমাণ করিয়াও নিশি রেহাই পাইল না। সমাজের কর্তারা কহিলেন, পাচিত্তির কর, নিশি। মাংস পোলাও দই সন্দেশ করতে না পার নিদেন পক্ষে মাছ খাওয়াও। মাছ আর দই।

নিশি বলিল, আমি ত কোন অন্যায় করিনি। পাচিত্তির আবার কিসের?

কুন্তীর রূপের জন্য তার বড জা ভাবিনী প্রথম হইতেই তাকে হিংসা করিত। এক-ঘবে হওয়ার পর শুরু করিল অত্যাচার।

এর কিছুদিন পবে কলেরায় নিশিকান্তব মৃত্যু হয। নীলু তখন মাতৃগর্ভে।

গরিব চাষী পরিবার। জমি এত অল্প যে তার ফসলে সংসার চলে না। কলিকাতায় একটি চা-খানা খুলিয়া নিশিকান্ত কোন রকমে দিন গুজরান করিতেছিল। সবাইকে সে ভাসাইয়া দিয়া গেল। বিশেষ করিয়া কুন্তীকে।

কয়েক মাস পরে নীলু আসিল দুর্লভ রূপ লইয়া। গরিবের ঘরে এমনটি হয় না। মায়ের বুক জুড়াইল। শখ করিয়া সে ছেলের নাম রাখিল নীলু। প্রতিবেশী ধীরেন বাঁড়ুয্যের ছেলে সুনীলের নামে এই নামকরণ। সবাই তাকে ডাকে নীলু বলিয়া। সে লেখাপড়ায় ভাল, সুশ্রী, লোকের মুখে মুখে তার প্রশংসা। কুন্তী চায় তার ছেলে বাঁড়ুয্যেদের সুনীলের মতন হৌক।

আজ কিন্তু নিজেব লোভের জন্য তার ভয় করিতেছিল। অত গরিব

হইয়াও সে কিনা স্বনীলের মতন ছেলে চায়। তার ভাগ্যদেবতা ইহা সহ্য করিবেন কেন ?

সময় আর কাটে না। এক একটা মুহূর্ত মনে হয় এক এক যুগ। এই সময় জায়ের তন্দ্রা ভাঙ্গিলে কুন্তী বলিল, অনেকক্ষণ ত হয়ে গেল দিদি। ভাসুর ঠাকুব রাজা বাবুকে নিয়ে আসছেন না যে।

ভাবিনী উত্তর করিল, তোর ত ভাসুর। রাস্তায় কারও ঘুম ভাঙ্গিয়ে হয়ত গল্প জুড়ে দিয়েছে।

তার কথার ধরনই এই। কারণে অকারণে ছোট জাকে খোঁটা দিয়া কথা বলে।

কুন্তী বলিল, না দিদি, আজ ভাসুর ঠাকুর দেরি করবে না।

এই সময় বাহিরে পদশব্দ শোনা যায় আর কার যেন কণ্ঠস্বর— শালার কলোরে হচ্ছে আপনাদেরই মতন গাঁয়ের আর এক জমিদার। শালা আবার কাঁচা খেকো, সাল-সাল জ্যান্ত মানুষ খাজনা চাই। এই বছরই ধরুন—

. বলিতে বলিতে কুন্তীর ভাসুর হরিচরণ ঘরের মধ্যে হোগলার পার্টিশনের মাঝখানে প্রবেশপথে আসিয়া দাঁড়ায়।

মোটা সোটা মানুষ, গড়ন খানিকটা ঢিলা। রৌদ্রে পোড়া, বৃষ্টি-ভেজা তামাটে রং, উঁচু কপাল, চোখ দুটি ড্যাবডেবে, মাথার সামনের দিকে টাক পড়িয়াছে। দু'পাশে কানের উপর কাঁচা পাকা চুল। মাথায় চেকের গামছা দিয়া বাঁধা পাগড়ি। এক হাতে বাঁশের লাঠি আর এক হাতে চামড়ার ব্যাগ।

পিছনে ত্রিশ বত্রিশ বছরের এক যুবা, লম্বা রোগা, সরু সরু হাত পা, কুচকুচে কালো দেহের তুলনায় মাথাটা অত্যন্ত ছোট। কপালের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত প্রায় আধ ইঞ্চি চওড়া, সাদা একটা দাগ। পাখী তাড়াইবার জন্য চাষীরা বাঁশের উপর যেরকম চুন মাখানো কালো হাঁড়ি টাঙাইয়া রাখে, যুবাটিকে দেখিলেই মনে পড়ে পাখী তাড়ানো নকল সেই প্রেতমূর্তির কথা।

নাম তার বৈদ্যনাথ। জলঙ্গী মালঙ্গী মিয়াপুরের সে জমিদার। গরিব দুঃখীর বন্ধু। তারা অসুখে বিসুখে তাকে ডাকে, আপদে বিপদে তার কাছে ছুটিয়া যায়। সে ঔষধ দেয়, পথ্য দেয় রোগীর সেবা করে।

বৈদ্যনাথ চিকিৎসা ব্যবসায়ী নয়, নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি শিখিয়াছে। চিকিৎসা ভালই করে। সে বলিল, ঘর যে কেরোসিনের গন্ধে ভরে গেছে। দক্ষিণ দিকের ঝাঁপটা খুলে দাও দেখি।

হরিচরণ বলিল, লাল তেলের গন্ধ। কণ্টোলের মাল ত, শালার কণ্টোল যা হয়েছে, দাম নেবে আগের পাঁচগুণ আর মাল দেবে নীরেস।

বৈদ্যনাথ বলিল, তুমি আগে ঝাঁপটা খোল দেখি।

নীলুর ঠাণ্ডা লাগবে না ?

এ রকম থাকলে যে ওর দম বন্ধ হয়ে যাবে। ঘর একেবারে গ্যাসে ভরে গেছে।

হরিচরণ একবার কলিকাতায় গিয়াছিল ; তখন গ্যাস দেখিয়াছে। 'গ্যাসে ভরে গেছে' শুনিয়া সে বৈদ্যনাথের দিকে তাকাইয়া বলিল, গেস কোথায় কত্তা ? তানারা ত আলোর পরী। কোলকাতার রাস্তার দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন।

বৈদ্যনাথ বলিল, দেখছ না, গন্ধ আসছে।

ওঃ গন্দ—এবার জিনিসটা হরিচরণের কাছে যেন জলের মতন পবিষ্কার হইয়া গেল। সে ঝাঁপ খুলিয়া দিল।

বাতাসে কুপির আলো কাঁপে। হরিচরণ বলে, পবনদেব ত মুশকিল বাধালেন দেখছি। কুপিটা এখুনি নিবে যাবে।

ওটা নিবিয়ে দাও, হারিকেনই ত আছে।

সারিকেনটা ফিরিয়ে দিতে হবে, করতা। ওর মালিক পাশের ঘরের কার্তিক। ঠেকার সময় বাড়ির পাঁচ গেরস্তই অবিশ্যি ঐ দিয়ে কাজ চালিয়ে নি। দোরপদি ঠাকরুণকে দিয়ে যেমন—বৈদ্যনাথের চোখে চোখ পড়ায় হরিচরণ কথার মাঝখানটায় চুপ করিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ নীলুর পাশে বসিয়া তার গায়ে হাত দিয়া দেখে সারা শরীর ঠাণ্ডা, একেবারে হিমশীতল। নাড়ী পাওয়া যায় না, শ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

সে রোগী দেখে আর হরিচরণ অনর্গল বকিয়া যায়, নিশি ছিল আমার পরানের সোদর ভাই, এই তার এক ফোঁটা চিহ্ন। ওকে সারিয়ে তুলুন, হুজুর। ওর মায়ের যা বরাত তাতে আমার ডর লাগছে। বাপ না খেয়ে কলকেতার রাস্তায় পটল তুলল, মায়েরও ঠিকেনা নেই, সোয়ামী চলে গেছে। ঐ ছেলে এখন ছোট বৌয়ের হাতের নোয়া; আর, আর আমি—

কথাগুলি বৈদ্যনাথ কিংবা কুন্তী কারও কানে যায় না। বৈদ্যনাথ আবার নাড়ী দেখে, বুকে স্টেথস্কোপ বসায়। তারপর প্রশ্ন করে, প্রস্রাব হয়েছে কতক্ষণ আগে?

হরিচরণ বলিল, তা হবেন ঘড়ি দুই তিন।

কুন্তী মাথা নাড়াইয়া জানায়, না।

বৈদ্যনাথ বলে, তুমিই বল।

কুন্তী বলে, হয়েছে দুপুরের আগে।

অসুখ হয়েছে কখন?

কাল সন্ধ্যায়।

শেষবার পাইখানা?

ওর জেঠা আপনার ওখানে যাওয়ার পর।

রং কেমন?

যেন ঘাটের জল। আগে ছিল ঘোলের মতন।

বৈদ্যনাথ হরিচরণকে প্রশ্ন করিল, আগে খবর দাওনি কেন?

যদু ঠাকুরের জল পড়া দিয়েছি। সেই যে টিকি মাথায় মোটা যদু।

এতক্ষণ তাই খাইয়েছ বুঝি?

আজ্ঞে করতা। যদু ঠাকুর পিয় ঠাকুর ওনাদের জলপড়া কথা কয়।

বৈদ্যনাথ ব্যাগ খুলিয়া বই বাহির করিয়া লক্ষণের সঙ্গে ঔষধ মিলায়। হরিচরণ বক বক করে, নিশি জমি-জিরেত সব খুইয়ে গেছে বটে কিন্তু আমি ত আছি। আমার ভিটে আর জমিই নয় বন্ধক কিন্তু হাল লাঙল আছে, মাছ ধরা জাল আছে। আমি চোখ বুজলে সবই ত ওর হবে। আমার সবেধন নীলমণির।

বৈদ্যনাথ ঔষধ দেয়, জলে মিশানো এক ফোঁটা হাইড্রোসিয়ানিক য়্যাসিডের চার ভাগের এক ভাগ। সে নীলুর মুখে ঔষধ ঢালার সঙ্গে সঙ্গে হরিচরণ বলিয়া উঠিল, জয় জয় গুরু। ও নিশ্চয় সেরে উঠবে। এই ত সেদিন তোমার এক ফোঁটা জল খেয়ে ষষ্ঠীর ছেলে চাঙা হয়ে উঠল।

বৈদ্যনাথ বলিল, তুমি একটু চুপ কর দেখি। রোগীর এতে কষ্ট হয়।

এতেও কেলেশ! হবে—বলিয়া হরিচরণ মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া থাকে।

এতক্ষণ ছিল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, এবার জোরে জল আরম্ভ হয়। বাতাস বাড়ে। শুরু হয় ঝড়। জীর্ণ কুঁড়ে খানা ঝিনঝিনিয়া রোগীর মতন কাঁপিতে থাকে। বাঁশের খুঁটি গুলিতে মটমট শব্দ হয়—মনে হয় রূপকথার কোন বুড়ী নিজের শিথিল আঙুল মটকাইতেছে।

রোগীর বিছানার চার ধারে, এমন কি তার গায়ের উপরও বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ে। কুন্তী ছেলের গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সব অঙ্গ দিয়া তার কচি দেহ ঢাকিয়া দেয়—পাখী যেমন করিয়া শাবককে জল-ঝড় হইতে রক্ষা করে ঠিক তেমনি।

বৈদ্যনাথের গায়েও জল পড়ে। সে নীরবে বসিয়া এদিক ওদিক তাকায়। নীলুর মায়ের দিকে চায়।

মানুষের এই কষ্টের সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড়। ঘরে ঘরে একই দৃশ্য। চালার ছণ নাই, মানুষের পরনে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই। একবার অসুখ করিলে ঔষধ ত দূরের কথা, একটু বার্লিও যোগাড় করিতে

পারে না। দেখিয়া দেখিয়া জগতের উপরই তার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। আজ ইচ্ছা হইল দরিদ্রের ভাগ্যবিধাতাকে অভিশাপ দেয়, তুমি কানা, তুমি একচোখো। এক দিকই শুধু দেখতে পাও। হোক্, তোমার দু'টো চোখই কানা হোক।

ঘণ্টা দুই পরে। চলো দিয়া তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। হোগলার বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আসে হিমেল হাওয়া।

বাহিরে ব্যাঙের ডাক ও ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ থামিয়াছে। ঘরের ভিতরটাও নিস্তব্ধ। শুধু নীলুর নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় আর ভাবিনীর নাক ডাকার শব্দ। বৈদ্যনাথ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে পার্টিশনের ওধারে যাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। তার কিছু সময় পরে গিয়াছে হরিচরণ।

নীলুর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। বৈদ্যনাথ ঔষধের কথা ভাবিতেছিল এই সময় উঠানে দাঁড়াইয়া কে একজন ডাকিল, ও হরিদা, কর্তাবাবু এখনও আছেন? আমাদের রাজা বাবু।

হরিচরণ ঘুমাইতেছিল। উত্তর করিল বৈদ্যনাথ, হ্যাঁ, আছি। তুমি কে?

আমি কাতিক, যুগিনের ছেলে কাতিক।

বৈদ্যনাথ বলিল, আমাকে দিয়ে কি দরকার?

আমার পরিবার ধুঁকছেন। আপনাকে একবারটি যেতে হবে।

ধুঁকছে কি রে? কি হয়েছে?

খিঁচুনি হচ্ছেন। জোর খিঁচুনি।

হঠাৎ খিঁচুনি হ'ল যে?

দু'বার পাইখানা, তার পরই খিঁচুনি। নরম শরীর ত, একেবারে শিমুল তুলো। তার উপর বড় লোকের মেয়ে। পাগলী আমার কেলেশ সইতে পারে না।

চল, দেখে আসি।

সারিকেনটাও নিতে হবে। ওটা আমার, পাগলীর বাবা দিয়েছিল। আপনি ছিলে তাই এতক্ষণ নেই নি।

সারিকেন নিতে হবে শুনিয়া হরিচরণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল, তোর সারিকেন, তুইত নিবিই। তুই তবু বেভার করতে দিয়েছিলি। তাই বা দেয় কোন্ শালা ?

কার্তিক বলিল, আমার পরিবার যায় যায়। নইলে নিতুম না।

হরিচরণ বলিল, এঁ্যা! কলোরে হয় নি ত ?

উনুমান (অনুমান) ত সেই রকমই হচ্ছে। হুজুর গেলে একটা ফয়সালা হবে।

দেশলাইটা ভিজা, তাই কুপি ধরাইতে সময় লাগে। কুপি জ্বালাইয়া বৈদ্যনাথ কার্তিকের সঙ্গে চলিয়া যায়।

কুন্তীর মনে এতক্ষণ তবু একটা নির্ভরতা ছিল। বৈদ্যনাথ বাহির হইয়া গেলে তার ভয় করিতে লাগিল।

কার্তিক হরিচরণের জ্ঞাতি ভাই। তার ঘর বাড়ির আর এক প্রান্তে। তার সঙ্গে যাইতে যাইতে বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করিল, বমি হয়েছিল ?

না বমি হন নি। তবে উকি হচ্ছেন ঘন ঘন, তাতে কেলেশ দিচ্ছেন।

প্রথমবার পাইখানা হয়েছে কখন ?

যৎকিঞ্চিৎ আগে। পর পর দু'বার। দেবতার নীলে ত। বাগানে গিছল, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

কার্তিকের ঘরখানি গোলপাতার। ছোট্ট ঘর। মাঝখানে বিছানা। শতরঞ্চি, তোশক, বালিশ সবই আছে, শুধু চাদর নাই।

বিছানায় তের চৌদ্দ বছরের একটি তরুণী শুইয়া। মেয়েটি সুন্দরী তবে তাড়াতাড়ি ডিম ফুটাইবার মতন তা দিয়া যৌবন ফুটাইবার চেষ্টা করিলে যেমন হয় তেমনি পাকা পাকা ভাব।

বৈদ্যনাথকে দেখিয়াই সে বলিল, আমি আর বাঁচব না, রাজাবাবু।

ভয় নেই, এক্ষুনি কমে যাবে।

মেয়েটি অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

বৈদ্যনাথ তাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দেয়, আশ্বাস দেয়। কিন্তু বাহিরে আসিয়া কার্তিককে ডাকিয়া বলে, আর কাউকে ডাক। আমি ভরসা পাচ্ছি না।

ততক্ষণে হরিচরণও আসিয়া জুটিয়াছে। সে বলিল, আপনি ভরসা পাও না। তা হলে ত ভাবনারই কথা।

হ্যা, ভাবনারই কথা। তা ছাড়া আমি ডাক্তার নই।

হরিচরণ বলিল, তা নও, কিন্তু ডাক্তের বদ্যির বাবা আপনি।

কার্তিক কহিল পড়্যাত ডাক্তার চার টাকার কম আসবে না। আমার হাতে একটি পয়সা নেই। যা হয় আপনিই কর। বাঁচা মরা ছিবিকিষ্টের হাত।

বৈদ্যনাথ ঔষধ দিয়াছে শুনিয়া হরিচরণ আবার বলিল জয়, জয় গুরু।

কার্তিক ঘরে ফিরিলে তার কিশোরী বধূ বলিল আমার জন্য পড়্‌ ডাক্তারকে ডেকে আর মিছিমিছি দেনা ক'র না।

কার্তিক কহিল, দেনাই বা দিচ্ছে কে? ঘটি বাটি সবই ত বন্ধক। তবু এই হারিকেনটা বেচে একবার পড়্যাত ডাক্তারকে আনাই। মানুষটা রাজ-কপালে, তানার ওষুধে তুই নিশ্চয়ই সেরে উঠবি।

লণ্ঠন বেচার দরকার নেই বরং বিছানা আর বালিশগুলা সরিয়ে নাও। আমি গেলে বিছানাটাও যাবে।

তাদের বিবাহের যৌতুক এই বিছানা আর ঐ হারিকেনটা ছাড়া আর কিছুই নাই। বিছানার চাদরখানাও কার্তিক বেচিয়াছে দেনার সুদ মিটাইবার জন্য। মেয়েটির ইচ্ছা স্বামীর জন্য বাকী এই চিহ্নটুকু রাখিয়া যায়।

কার্তিক বলিল, তুমি গেলে এ বিছানা দিয়ে কি করব?

আর পাঁচজন যা করে। শোবে—বলিয়া পাগলী স্বামীর হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

কাতিক বলিল, শোব! তুই মলেও শোব?

তবে কি ঘোড়ার মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবে?

যাব বিবাগী হয়ে—যেদিকে চোখ যায়।

বধূটি হাসে। স্বামীর প্রেমের জন্য হাসি, না অবিশ্বাসের হাসি ঠিক বোঝা যায় না। সে হয়ত ভাবে কাতিক এখন এই কথা বলিল বটে কিন্তু হাতে টাকা হইলে তার মৃত্যুর পর এক মাসের মধ্যেই নূতন বধূ আনিবে। তাকে লইয়া এই বিছানায় শুইবে। তাকে আদর করিবে।

তার হাসি দেখিয়া কাতিক বাপান্ত শপথ করিতে যাইতেছিল, আমি যদি বিয়ে করি ত যুগিনের—

বধূ তার স্বামীর মুখে তারই একখানা হাত চাপা দিয়া বলিল, ছিঃ, কিরে করে না।

আমার মুখ তুই নিজের হাতে চাপতে পারলি না?—কাতিক আক্ষেপ করে।

আমার যে কলোরে—বলিয়া বধূটি করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকায়।

বৈদ্যনাথ এঘর ওঘর করে। একবার নীলুকে দেখে, একবার কাতিকের বউকে। বই পড়ে, ঔষধ পালটায় কিন্তু নিজেরই মনে হয় অন্ধকারে হাতড়াইতেছে।

নীলুর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। তার চোখ নিঃশেষিত-তৈল দীপশিখার মতন জ্বল জ্বল করে, যাওয়ার আগে তার বাপের চোখও বুঝি এই রকমই জ্বলিয়াছিল। কুন্তী ভয় পায়, সে একবার ছেলের দিকে তাকায়, আবার বৈদ্যনাথের দিকে। তার চোখ দু'টি নীরবে প্রশ্ন করে, কি হবে বাবু?

একটা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করিয়া কাত্‌রাইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই একদল হাঁসের কলরব শোনা যায়।

হরিচরণ আবার স্ত্রীর পাশে যাইয়া শুইয়াছিল। শালার শিয়াল

কেলোকে নিয়ে গেল রে—বলিয়া সে লাঠি হাতে উঠানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। শিয়ালের পিছু পিছু ছোটে আর বলে, শালার শিয়াল।

বৈদ্যনাথের হাসি পায়। আর কুন্তীর মনে হয়, যমের দূতই হয়ত শিয়ালের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল। ভাগ্যিস্ ভাসুর ঠাকুর তাকে তাড়াইয়া দিল।

রাত্রির অন্ধকার ফিকে হইয়া আসে। যেন কোন অদৃশ্য মঞ্চ-শিল্পী মাটির বুকের উপর হইতে কালো যবনিকা সরাইয়া নেয়।

এই সময় পাশের ঘর হইতে কার্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল, না, না, তুই যেতে পারবি না। তোকে ছাড়ব না পাগলি।

ঘণ্টা খানেক পরে বৈদ্যনাথ তার উঠানের উপর দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। কার্তিক ডাকিল, হুজুর।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৈদ্যনাথ ফিরিয়া দাঁড়ায়। তাকাইয়া দেখে কার্তিক তার স্ত্রীর শব আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে, প্রায় জড়াইয়া বলিলেই চলে। তার চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সে বলিল, রাজাবাবু, আমার পাগলী চলে গেছেন—আমার উজল। মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তার পরান পাখী—

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বধূটি তার হাতে মরিল এইজন্য নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়।

কার্তিক চুপ করিয়াছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, আপনি এখন যাও, কর্তা। আপনি যাও। আমার বৌকে আর দেখা না দিলে—

গলার স্বর অস্বাভাবিক। 'আমার বৌকে আর দেখা না দিলে' - কথাটার অর্থ বৈদ্যনাথ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তার কানে হেঁয়ালির মতন বাজে। সে ধীরপদে চলিয়া যায়।

দুই

হরিচরণের বাড়ির নিচেই মাঠ, ভেজা ঘাস পাতায় আলোর ঝিলিমিলি আলো মাথায় করিয়া গাছপালা হাসে, মৃদু মৃদু দোল খায়।

আলের উপর আঁকাবাঁকা পথ। খানিকটা পরেই খাল। খাল নাচিয়া নাচিয়া নদীর দিকে চলিয়াছে নৌকার নিচে ছোট ছোট তরঙ্গের মৃদু মৃদু বোল তুলিয়া।

খালপাড় দিয়া যাইতে যাইতে বৈদ্যনাথ অন্যমনস্কভাবে এই দৃশ্য দেখে। তার চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে কার্তিকের ঘরের ছবি। কানে বাজে তার আর্তকণ্ঠ, হুজুর আমার পাগলী চলে গেছে।

আর মনে পড়ে নীলুর মায়ের করুণ মুখ। সুন্দর ঐ মুখে একটু হাসি ফুটাইতে পারিলে কী আনন্দই না হইত। কিন্তু সে কি সম্ভব?

মরণে মরণে দুঃখ দারিদ্র্যে দেশটা ছাইয়া গেল। এই অঞ্চলে বছরে একবার কলেরা লাগে আর একবার বিষম জ্বর; তার উপর কোন কোন বছর আসে বসন্ত। বিনা ওষুধে, বিনা পথ্যে মানুষগুলা পোকামাকড়ের মতন মরে। নির্মল একটু জল পর্যন্ত পায় না।

এবার গ্রামে কলেরা লাগিয়াছে আজ দু'মাস। তার হাতেই তিনটি রোগী মরিল, নীলুরও কি হয় বলা যায় না।

সে খালের উপর সাঁকোর সামনে আসিয়া পড়ে। এই অঞ্চলে এইটাই সবচেয়ে বড় সাঁকো। দূর হইতে মনে হয় কোন ধানুকী বাঁশের ধনু দিয়া খালের এপার ওপার বাঁধিয়াছেন।

সাঁকোর মাঝখানে আলগা দু'টা বাঁশ, এই জায়গাটাই সবচেয়ে উঁচু। এখানে দাঁড়াইয়া নিচের দিকে চাহিলে জলের তলায় মাটি পর্যন্ত দেখা যায় আর কতগুলি জলজ তৃণ, কাঁটা শেওলা। বাঁশের গায়ে ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া জল দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। কয়েকটা বাঁশে কচুরিপানা জড়াইয়া গিয়াছে।

বৈদ্যনাথ জলের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল এই সময় হরিচরণ আসিয়া সাঁকোয় উঠিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখানে যে? খুব ভোরে উঠে গিছলে কোথায়?

হরিচরণ কহিল, গিছলুম সমৃদ্ধিদের কাছে। সেখান থেকে লঙ্কার ভাও জেনে এলাম।

নীলুকে ঐ অবস্থায় ফেলে তুমি গেলে লঙ্কার ভাও জানতে!

কি করব হুজুর? কথা দিয়েছি যে। কিন্তু দেখলেন কাণ্ড? আমি এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে লঙ্কার দাম জেনে এলুম আর তুই কিনা উধাও হয়ে গেলি! এই বুদ্ধি নিয়ে করবি কারবার? ছোঃ!

ব্যাপারটা এই, গত রাত্রে হরিচরণ যখন বৈদ্যনাথকে লইয়া যায় তখন সাঁকোর নিচে নৌকার একটি মাঝি রান্না করিতেছিল, হরিচরণ প্রশ্ন করে, রসুই করে কে?

মাঝি উত্তর দেয়, আমি ভিন্‌দেশী মানুষ। লঙ্কা নিয়ে এসেছি, পয়সার হাটে বেচব ব'লে।

পয়সা মালঙ্গীর ক্রোশ দুই দূরে এক গ্রাম। এই অঞ্চলে সেখানকার হাটই বেশী জমে।

হরিচরণ বলে, তা এই নিশুতি রাতে রসুই করছেন যে?

গণে গণে আসতে দেরি হয়ে গেছে, পয়সার হাটে লঙ্কার ভাও কত বলতে পার মশায়?

কাঁচা লঙ্কা না, শুকনো?

শুকনা, বড় বড় যশুরে লঙ্কা, ঝাল খুব।

হরিচরণ বলিল, পয়সা কোরোশ দুই রাস্তা। সেখানে যশুরে লঙ্কার ভাও কত বলতে পারব না। তবে শুনছি গেল হাটে খড় খুব সস্তা গেছে। খড় আর কাছিমের ভাগা।

মাঝিটি বলিল, শোভানাল্লা, আমি জানতে চাই লঙ্কার ভাও।

হরিচরণ উত্তর করে, আমার সম্বন্ধিদের ঐ হাটে দোকান আছে। তাদের নিকট শুধিয়ে কাল সকালে এসে আপনাকে জানিয়ে যাব। যশুরে লঙ্কা।

ভোরে মরণাপন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রকে ফেলিয়া সে সামতায় শ্যালকদের নিকট গিয়াছিল লঙ্কার দর জানিতে। সেখান হইতে খবর লইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বলিল, মাঝিটা বড় আহাম্মক ত। তোমার মেহনতের কদর বুঝল না।

হরিচরণ আমতা আমতা করিয়া কহিল, গরিবলোক, তায় বিদেশী—তানার একটু উপকার করতে চেয়েছিলুম হুজুর।

বৈদ্যনাথের বাড়িতে একটি বৃদ্ধ সদর দরজায় বসিয়া তার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কালো মানুষ, মাথায় একরাশ সাদা চুল। চোখের ভুরু হাতের রোঁয়া পর্যন্ত সাদা। শরীরে এক সময় প্রচুর শক্তি ছিল। বুকের ছাতি হাতের কব্জি তার সাক্ষ্য দেয়। বয়স সত্তরের উপর। তাকে দেখিয়া বৈদ্যনাথ বলিল, চায়ের জল গরম করে বসে আছ বুঝি, জেঠামণি?

বৃদ্ধ উত্তরে একটু হাসে।

বৈদ্যনাথ রোগীর সেবা কিংবা অন্য যে কোন কারণেই রাত্রে বাহিরে থাকুক না কেন সকালে একবার বাড়ি ফেরে। হাতমুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া ঘুমায়।

অন্য লোক আছে কিন্তু তার জেঠামণি নিজে তার চা ও জলখাবার করিয়া রাখে। যত্ন করিয়া খাওয়ায়। ভাল কোন জিনিস হইলে নিজে রাঁধে।

আজও কেৎলিতে ফুটন্ত জল লইয়া মহিম তার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, নিশির ছেলেটি কেমন, জেঠামণি?

তারা একে অপরকে জেঠামণি বলিয়া ডাকে।

বৈদ্যনাথ বলিল, ভালনা, তা ছাড়া রাত্তিরে আর একজন মারা গেল।

কে?

ঐ বাড়ির কার্তিকের বউ, অসুখ হয়ে তিন ঘণ্টাও ছিল না।

বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করিল, আহা, বেচারী বিয়ের পর বউ নিয়ে এক বছরও ঘর করল না!

হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে বৈদ্যনাথ বলিল, ওষুধের উপর দিন দিন ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। এত ওষুধ দিলুম একটুও যদি ফল হত।

বৃদ্ধ বলিল, নিশির ছেলেটি দেখো ঠিক সেরে উঠবে।

ভরসা পাচ্ছিনা জেঠামণি, ছেলেটির মায়ের মুখ যদি দেখতে। খাসা মেয়ে, যেমন সুন্দর তেমনি—কথার মাঝেখানে বৈদ্যনাথ থামিয়া যায়।

তার জেঠামণি বলে, আমি বৌটিকে দেখেছি।

কোথাকার মেয়ে যেন ?—প্রশ্ন করে বৈদ্যনাথ।

শুনেছি চব্বিশপরগনার, দুর্ভিক্ষের বছর পুলিসের তাড়া খেয়ে নিশির দোকানে এসে লুকোয়। সুন্দর দেখে নিশি বিয়ে করে এনেছে। যাক তুমি কি ভাবছ বল দেখি ?

ভাবছি চিকিৎসা ছেড়ে দেব।

মহিম মনে মনে বলিল, ভগবান করুন তাহাই যেন হয়।

সে চায় না যে বৈদ্যনাথ আর পাঁচ জনের অসুখ বিসুখে আপদে বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেকে বিপন্ন করে।

বৈদ্যনাথ কি যেন ভাবিতেছিল, একটু পরে বলিল, আমার মনে হয় লোকের আমি ক্ষতি করি।

তুমি কর ক্ষতি।

এইত এবার আমার হাতে তিনটে রোগী ম'ল। নিশির ছেলেটির সম্বন্ধেও কোন ভরসা পাচ্ছি না।

লোকে মরবে, তুমি তা আটকাবে কি করে ?

ভাল ডাক্তার আটকাতে পারে বৈ কি। আমাকে না পেলে কার্তিক হয়ত ভিটে মাটি বেচে প্রদ্যোত ডাক্তারকে ডাকত।

পদু ডাক্তার। সে তোমার চেয়ে বড় হল কিসে ?

তার প্রতি বৃদ্ধের এই আস্থায় বৈদ্যনাথ যেমন আনন্দ পায় তেমনই বোধ করে কৌতুক। বলে, না তোমার জেঠামনির তুল্য ডাক্তার এ তল্লাটে আর নেই।

নেই—ই ত, সুরেনের বউর তুমি প্রাণ দিলে। জহুরীর নাতি, গুরুদাসের মেয়ে, মঙ্গলঘোষ, পদু ডাক্তার পারত এদের সাবিয়ে তুলতে ?

প্রতিবাদ করিলে ফর্দটা আরও দীর্ঘ হইত, তাই বৈদ্যনাথ কোন প্রতিবাদ করিল না।

রাতজাগার পর অন্য দিন সে ঘুমায়, আজ ঘুমাইল না, মোটা একটা হোমিওপ্যাথিক বই খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এক একটা ঔষধ পড়ে আর লক্ষণ মিলায়, কোন ঔষধই মনে ধরে না। কুন্তীর মুখে হাসি ফুটাইবার পক্ষে এর কোনটাই যেন যথেষ্ট নয়।

কিছুক্ষণ পরে খান-দুই বই ও কয়েকটি ঔষধ ব্যাগে ভরিয়া সে পিতার ছবির সামনে যাইয়া প্রণাম করিল।

তার মা তাকে খুব ছোটটি রাখিয়া মারা যান; মায়ের স্নেহ দিয়া বাবাই তাকে পালন করেন। বাবা আর এই জেঠামণি।

পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন বৈদ্যনাথের বয়স আট কি নয় কিন্তু শৈশবের পিতৃস্নেহের স্মৃতি আজও তার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই স্নেহের বুঝি তুলনা নাই।

সে মনে করে পিতা সাক্ষাৎ দেবতা। এখনও বাহির হওয়ার সময় প্রতিটিবার তাঁর ছবির উদ্দেশ্যে প্রণাম করে। তার বিশ্বাস এতে মঙ্গল হয়, তার রোগীদের মঙ্গল, নিজের মঙ্গল।

আজ সে বাহির হওয়ার সময় জেঠামণি ডাকিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।

বৃদ্ধের নাম মহিম। সে বিদেশী মানুষ। কলমের চারার মতন এই মালঙ্গীর জমিতে বাড়িয়া উঠিয়াছে। নিজেকে মানাইয়া লইয়াছেও বেশ।

বৈদ্যনাথের ঠাকুরদা ননীভূষণ কাটনিতে রেলের কাজ করিতেন। সেখানে সবে তখন রেলের লাইন বসিতেছে।

একদিন কুলী ধাওড়ে অচেতন অবস্থায় একটি ছেলেকে পাওয়া যায়। ননীবাবু তাকে বাড়িতে আনিয়া ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা করান। ছেলেটি ধীরে ধীরে সারিয়া ওঠে। নিজের পরিচয় কিংবা ঐখানে সে কেমন করিয়া আসিল কিছুই বলিতে পারে না। অনেকেই অনুমান করে কোনও আড়কাঠি হয়ত একদল কুলীর সঙ্গে ছেলেটিকে আসামে, মালয়ে কিংবা সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান করিতেছিল। সে অসুস্থ হইয়া পড়ায় পথে ফেলিয়া গিয়াছে।

ননীবাবু এবং অন্য সকলের প্রশ্নের উত্তরে সে বারবার একই জবাব দেয়, মা-ই-ম, মা-ই-ম। ননীবাবু তাই তার নাম রাখেন মহিম।

বৈদ্যনাথকে ও তার বাবাকে সেই কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাহার বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, বিরক্ত হইলে কখনো চড়টা চাপড়টা মারিয়াছে।

সে এই পরিবারে আছে আজ অর্ধ শতাব্দীর উপর। যেন তাদেরই একজন। তার আর কোন বন্ধন নাই, পৃথক্ কোন সত্ত্বাই নাই।

বৈদ্যনাথের টাকাকড়ি বিষয় আশয় সব কিছুর ভার তার উপর। সে বছরে আট দশ হাজার টাকা খাজনা আদায় করে, হিসাব রাখে, গরিব প্রজার খাজনা মকুব করে, দরকার মত মামলা মকদ্দমার তদ্বির করিতে জেলার সদরে মহকুমায় যায়।

বৈদ্যনাথ নিজে কিছু দেখে না। দেখার সময়ও তার নাই। সে ব্যস্ত পাঁচজনের কাজ লইয়া, নৈশ বিদ্যালয় লইয়া। যেখানে অসুখ বিসুখ, আপদ বিপদ সেইখানেই বৈদ্যনাথ।

দেশের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সে কলিকাতায় যাইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়। থাকিত কলেজ হোস্টেলে।

বাল্যে মাতৃহীন, বাড়িতে সমবয়সী কেহ ছিল না। আশে পাশে যারা ছিল তারা সবাই ননীভূষণের প্রজা। চাষী মজুরই বেশি, ভদ্রশ্রেণীর মাত্র কয়েক ঘর। তারা অবস্থায় হীন বলিয়া তিনি পৌত্রকে তাদের সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। বলিতেন, এতে আমাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। ব্লু ব্লাডেড্ য়্যারিষ্ট্রক্র্যাসি।

নীলরঙের আভিজাত্য বজায় রাখিতে গিয়া পৌত্রকে তিনি অস্বাভাবিকভাবে গড়িয়া তুলিলেন। বুদ্ধিমান ছেলে, সৎপ্রকৃতি, অন্তঃকরণও ভাল কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিতে জানে না, পরিহাস বোঝে না। হঠাৎ এমন একটা গোঁ ধরিয়া বসে যাহা হইতে কিছুতেই তাকে নড়ানো যায় না।

তার উপর চেহারাও কুৎসিত, এই সব কারণে সহপাঠিরা, বোর্ডিংএর

ছেলেরা তার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তারা তাকে দেখিয়া মুচকি হাসিত। পরোক্ষে এমন ভাবে ঠাট্টা করিত যে কথাগুলি তার কানে যায়।

সে একদিন ট্রাঙ্ক, সুটকেস বিছানা লইয়া লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। মহিম প্রশ্ন করিল, কি জেঠামণি চলে এলে যে?

বৈদ্যনাথ সংক্ষেপে জবাব দিল, অত বড় শহরে ভদ্রলোক থাকতে পারে না, জেঠামণি।

মহিম হাসে।

দেশে ফিরিয়া বৈদ্যনাথের ইচ্ছা ছিল কংগ্রেসে যোগ দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের তখন কোনও জোরালো প্রোগ্রাম ছিল না। লবণ আন্দোলনের পর সবে গান্ধী আরুইন চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহা লইয়া চলিতেছে চুল-চেরা তর্ক।

কংগ্রেস তাকে টানিল না, টানিল সেবা ব্রত। সেই হইতে সে উহা লইয়াই আছে।

প্রথম প্রথম মহিম তাকে বাধা দিত; আজ কাল আর দেয় না। দেখিয়া দেখিয়া তার ধারণা জন্মিয়াছে, যারা পরের ভাল করে তাদের কোন অনিষ্ট হয় না। এমন পরোপকারী মানুষ বৈদ্যনাথ, দেবতা তার কোন অমঙ্গল করিবেন না।

বৈদ্যনাথ শুধু চিকিৎসাই করে না, দরকার হইলে রোগীর সেবাও করে, নিজ হাতে ঔষধ পথ্য দেয়, বাতাস করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রোগীর শিয়রে বসিয়া আশ্বাস দেয়, ভাল হবে, যন্ত্রণা এক্ষুনি কমবে। ভয় নেই।

আজ কয়দিন সে নীলুর অবিশ্রান্ত সেবা করিতেছে। তার পাশে থাকে কুন্তী। দেবতার অনুকম্পা, না বৈদ্যনাথের চিকিৎসা নৈপুণ্য, কোন্‌টার প্রতি যে তার নির্ভরতা বেশী তা বোঝা যায় না। সে গ্রামের প্রায় সব মন্দিরের আশীর্বাদী ফুল পাতা যোগাড় করিয়াছে,

বহু দেবতার চরণামৃত; ছেলেকে পাঁচ পয়সা দামের একটি কবচও পরাইয়াছে।

আবার ছেলের যাতনা একটু বাড়িলেই বৈদ্যনাথকেও কাতর কণ্ঠে বলে, এটা কমিয়ে দিন বাবু।

তার জা রোগীর কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। সংসারী আর পাঁচটা কাজের ফাঁকে দু' একবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, নীলমণি এখন কেমন? একটু ভাল ত?

বৈদ্যনাথের তাকে ভাল লাগে না। তার চাহনির সামনে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। আর জাকে দেখিলে কুন্তী ত ভয়েই কোঁকড়াইয়া যায়।

সে বদলাইয়া বদলাইয়া মাত্র দু' তিনখানা কাঁথা ব্যবহার করিতেছিল। বৈদ্যনাথ বাড়ি হইতে কতকগুলি কাপড় আনিয়া দিল। কুন্তী তার একখানা মাত্র হোগলার উপর বিছাইয়া দিলে সে বলিল, কতগুলি কাপড় একসঙ্গে পুরু করে দাও, ছেলে আরাম পাবে।

কুন্তী কহিল, ভাবছিলুম কাঁথা করব।

আচ্ছা, কাঁথার কাপড় আমি দেব'খন—বৈদ্যনাথ তার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমিও ত এ দু'দিন এক কাপড়ে আছ, ওখানা ছেড়ে ফেল, নইলে অসুখ করবে যে।

কুন্তী সলজ্জ-কণ্ঠে বলিল, আর নেই ত।

বৈদ্যনাথ বলিল, আচ্ছা আমি—

কুন্তী বলিল, না থাক্।

বৈদ্যনাথের প্রস্তাব ভাবিনীর কানেও গিয়াছিল। সে চলিয়া গেলে ভাবিনী কুন্তীকে বলিল, তুই কি বোকা মাইরি। তোকে কাটলে দু' দু'টো আস্ত বোকা বেরোয়।

কেন দিদি?

বদি বাবু বড়লোক, তোকে কাপড় দিতে চাইল। তুই না বললি। আমি হলে সবার জন্যে কাপড় চেয়ে নিতুম।

আমার লজ্জা করল।

ওঃ আমার লজ্জাবতী লতা। বাতাসের ছোঁয়ায় কুঁকড়ে যায়। আর এই যে সারাদিন যুবো মানুষটার সামনে বসে থাকিস্ তাতে লজ্জা করে না?

কুন্তী ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। এ কী, দিদির মুখে এ কি কথা?

ভাবিনী বলিল, বদিবাবু দেখিস্ আবার জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমার জন্যও একখানা কাপড় চেয়ে নিস্। কল্কা পেড়ে। হেসে চাইবি কিন্তু—

কুন্তী কোন উত্তর করিল না।

তিন

বৈদ্যনাথ পরদিন বৈকালে আসিয়া দেখে কুন্তী একমনে কাঁথা সেলাই করিতেছে। শিল্পীর মতন তার সূক্ষ্মাগ্র আঙুলগুলি ছুঁচের সঙ্গে ঢেউ খেলিয়া যায়। বাহু একটু একটু নড়ে।

তার নিবিষ্টতা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বুঝিল নীলুর অবস্থা অনেকটা ভাল। তার জন্য যে কাঁথার কাপড় দিয়াছিল কুন্তী তারই একখানা পরিয়াছে। জীর্ণ কিন্তু পরিষ্কার ঐ কাপড়টুকুতেই তাকে বেশ দেখায়।

কুন্তী হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখে বৈদ্যনাথ তার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

তার সামনে এই কয়দিন সে ঘোমটা দেয় নাই, আজ মাথার কাপড়টা তাড়াতাড়ি টানিয়া দিল। বৈদ্যনাথ বলিল, হঠাৎ আজ লজ্জা করছ যে?

কুন্তী নীরব। বৈদ্যনাথ আবার প্রশ্ন করে। এবারের প্রশ্নে ছিল ব্যগ্রতা। কুন্তী অগত্যা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, এতদিন যে ভয় ছিল।

সে বলিতে চায় এতদিন বিপদ ছিল তাই লজ্জা ছিল না।

খাসা উত্তর। স্বভাব-লাজুক মেয়েটির এই উত্তরে সে ভারী খুশি হয়। কুন্তী শুধু সুন্দরী ও লাজুক নয়, বুদ্ধিমতীও বটে।

এই কয়দিন নীলুর মনে কোন ছাপ পড়ে নাই, না মানুষের,

না ব্যাধির। বৈদ্যনাথকে সে যেন আজ প্রথম দেখিল। তার দিকে চাহিয়া মাকে প্রশ্ন করিল, তে মা ?

উত্তর দিল বৈদ্যনাথ, আমি মানুষ।

নীলু বার দুই আওড়াইল, মানুত, মানুত। তার পর নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করিল, তি মানুত ?

কুন্তী বলিল, ভাল মানুষ।

মানুত, ভাল—বলিতেই শীর্ণ শিশুর মুখে ক্লান্তি নামিয়া আসে। সে আবার চোখ বোজে। মনে হয় হাসিতেছে। কুন্তী বলিয়া উঠিল, দেখুন, দেখুন।

বৈদ্যনাথ বলিল, খাসা মুখ, তোমার ছেলে ত।—বলিয়াই কেমন যেন লজ্জা বোধ করে। চাহিয়া দেখে কুন্তীর মুখও লজ্জায় রাঙা হইয়া গিয়াছে।

যাওয়ার সময় সে হরিচরণকে বলিল, এবার থেকে তুমি গিয়ে ওষুধ নিয়ে এসো।

হরিচরণ বলিল, কেন, তুমি, আপনি আসবে না আমার নীলমণিকে দেখতে ?

আর দরকার নেই।

দেখো বাবু, বংশের ঐ পিদ্দিম। নিশি বাউণ্ডুলে ছিল বটে কিন্তু সোদর ভাই ত, তার ছেলে। তা ছাড়া আমার হাল গরু মাছ ধরার জাল—

হরিচরণ এর মধ্যেই বৈদ্যনাথের কাছে বার দুই তিন অভিযোগ করিয়াছে, নিশি সবই উড়িয়ে গেল, নইলে আজ এই দশা ? একা বিন্দু গাইটাই দু'সের দুধ দিত, ইয়া মস্ত ওলান।

নিশির বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বরং সেই সংসার চালাইত। এতদিন ছেলের অসুখের বাড়াবাড়ির জন্য কুন্তী ওদিকে কান দেয় নাই। আজ স্বামীর অযথা নিন্দায় তার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল উহা বৈদ্যনাথের দৃষ্টি এড়াইল না।

পাছে হরিচরণ পিছু লয় এই ভয়ে সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ওঠে সে বাহির হইয়া যাওয়ার পর।

কুন্তী জিজ্ঞাসা করে, নীলুকে ভাত দেবেন কবে?

দেরি হবে আরও চার পাঁচ দিন।

কাল আসবেন?

বৈদ্যনাথ বলিল, না।—কথাটা বলিয়া পরক্ষণেই মনে হইল পালটাইয়া নেয়। নিলও কিছুটা, খবর পাঠিও, দরকার হলে আসব। নইলে হরির হাতে—

কুন্তী বলিল, আমি বড় অনাথা। নীলু ভাত না খাওয়া অবধি রোজ একটি বার করে দেখে যাবেন।

বেশ, তুমি যখন বলছ আসব।

কুন্তীর মুখখানা প্রসন্ন হয়। বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলে সে গলায় কাপড়ের খুঁট জড়াইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করে।

নীলুর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বৈদ্যনাথের মনে হয় আর একটুক্ষণ থাকিল না কেন? না থাকার জন্য কেমন যেন অজানা বেদনা বোধ করে।

কুৎসিত চেহারার জন্য নিজের প্রতি তার ছিল এক অপরিসীম বিরক্তি। এই কয়দিনে সেটুকু কাটিয়া গিয়াছে। জীবনের সে এক নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছে, লভিয়াছে এক নূতন জীবন বেদ। সবই এখানে ভাল, অর্থপূর্ণ, বৃথা কিছু নয়। সকলই মধুর, সুন্দর।

তার নবলব্ধ জীবন-বেদ মহিমের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সে ইহাতে আনন্দ পায়, সেও চায় যে তার জেঠামণির জীবনের প্রতি আকর্ষণ হোক, মমত্ব বোধ জন্মাক।

বৃদ্ধের মনে এক একবার প্রশ্ন জাগে, এ আনন্দের উৎস কোথায়? নূতন এই জীবন অনুভূতি কাহাকে কেন্দ্র করিয়া? দরদী মানুষ সে, বুক তার স্নেহ ও সহানুভূতিতে ভরা। বৈদ্যনাথ ফিরিলে সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করে, নীলু কেমন আছে, আর বিপদ নাই ত?

ওঠে কুন্তীর কথা। হরিচরণ ও ভাবিনীর কথা। মহিমের কখনও মনে হয় কুন্তীর নাম শুনিলে জেঠামণির চোখ দুইটা কেমন যেন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

বৈদ্যনাথ সে দিন ফিরিতেছিল গোপালের পুকুর পার দিয়া। জায়গাটা হরিচরণের বাড়ি হইতে কিছুটা দূর। তাদের বাড়িতে ভাল জলাশয় নাই। ভাবিনী তাই এখানে গা ধুইতে আসে, পুকুর হইতে জল লইয়া যায়।

পুকুরের পাড়েই পথ, পথের পাশে হলদে ফুলে ফুলে ভরা বড় একটা গাছ, ওপারে আর একটা। দুটিতে মিলিয়া জলের উপর হলুদ ও সবুজের তোরণ গড়িয়াছে।

পুকুর পাড় দিয়া দুইটা কুকুর ছুটাছুটি করে, লকলকে জিভ বাহির করিয়া তীরের মতন চারটা দিক ঘোরে। সামনেরটা কুকুরী, পিছনে কুকুর।

নির্জন জায়গা, তখন পর্যন্ত কেহ গা ধুইতে বা জল বইতে আসে নাই। ভাবিনী গা ধুইয়া জলভরা কলসী কাঁখে করিয়া সবে পারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পরনে ভিজা কাপড়, গায়ের জল শুকায় নাই।

সকল দেহের মধ্যে সুন্দর তার নিতম্ব। যেমন পরিপুষ্ট, তেমনই নিটোল। ভিজা কাপড়ের মধ্য দিয়া যৌবনের সেই ইঙ্গিত আজও যেন ফুটিয়া বাহির হয়, এই পরিণত বয়সে।

কলসী মাটিতে রাখিয়া সে ভিজা চুল ঝাড়িতেছিল। পিছনে মানুষের পায়ের শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখে বৈদ্যনাথ আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি হাঁটুর নিচে কাপড় টানিয়া দেয়, বুক ঢাকে।

বৈদ্যনাথ পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। ভাবিনী বলিল, বাড়ি ফিরছ বুঝি করতা? তা আজ এত আগে?

এখন আর থাকবার দরকার নেই।

নীলুর কোন ভয় নেই ত?

না, মনে হয় বিপদ কেটে গেছে।

কাটলেই রক্ষে। তা আপনি ব, কেলেশ করলেন বাবু। বড় দয়ার শরীল আপনার।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, পেরথমে আপনাকে ডাকলে ছেলেটা এত ভুগত না।

বৈদ্যনাথ বলিল, আগে ডাকলেই হত।

আমি ত খপর দিতে বলেছিনু কিন্তু ছোট বৌ মানা করল।

কে? নীলুর মা?

হ্যাঁ, নীলুর মা।

সে মানা করল কেন?

ভাবিনী ইতস্ততঃ করে, কথাটা যেন বলিতে চায় না।

বৈদ্যনাথ বলিল, চুপ করে রইলে যে?

ঘাড় বাঁকাইয়া একটু সঙ্কোচের অভিনয় করিয়া ভাবিনী বলিল, সে থাক্।

থাকবে কেন?

আপনি তা হলে কেলেশ পাবে।

কেলেশ! ক্লেশ কিসের বল, বল কুন্তী আপত্তি করল কেন?

শুধু অপিত্তি! ও বললে, বোদে বাবুকে দেখলেই ছেলে আমার ডরিয়ে মরবে। ওর যা চেহারা।

বৈদ্যনাথ বলিল, এ্যাঁ, কুন্তী এই কথা বললে?

ভাবিনী আরও নিষ্ঠুর আঘাত করিল, শুধু কি তাই? এখন ত শুনি কাত্তিকের বউ পাগলীও নাকি তোমায় দেখে ডরিয়ে মরেছে। সে যখন বাগানে যায় আপনিও কি তখন বাইরে গিছলে?

না।

ও কথাও কি নীলুর মা বলেছে?

হ্যাঁ।

বৈদ্যনাথের চোখে মুখে ফুটিয়া ওঠে এক অব্যক্ত বেদনা। আর

ভাবিনীর চোখে উল্লাস। শিকারের নাড়ি-ভুঁড়ি দেখিলে ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রী যেরূপ উল্লসিত হয় সেই রকম।

বৈদ্যনাথ দাঁড়ায় না, দ্রুতপদে চলিয়া যায়। চলে মাতালের মত টলিতে টলিতে।

এই সময় কুকুর দুইটা দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভাবিনীর গায়ের উপর আসিয়া পড়িলে সে বলিল, আ মর্, এদুটোতেও খুব মজেছে দেখছি।

ছল ছলাৎ ছল—কলসীর ভিতরে জল-তরঙ্গের বোল তুলিতে তুলিতে সে হেলিয়া দুলিয়া চলে। চলে হারানো যৌবন ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দে।

সে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল কুন্তী কাঁথা সেলাই করিতেছে। সেলাই করিতে করিতে সে ছেলের দিকে তাকায়। আনন্দে তার বুক ভরিয়া ওঠে। সে ডাকে, নীলু, নীলুয়া।

তারপর মনে পড়ে বৈদ্যনাথের কথা। কী ভাল ডাক্তার তিনি। নীলুকে সারাইয়া তুলিলেন। বেশ লোক, যেমন বড় মানুষ, তেমনি দয়ালু। চেহারাটা যদি আর একটু—

নীলুর বাপের অসুখের সময় তাকে ডাকিলে সেও সারিয়া উঠিত।

কুনী—উঠান হইতে ভাবিনী ডাকিল, কুনী।

কুন্তী কাঁপিয়া ওঠে। ভাবিনী কখনও সরলমনে তাকে কুনী ডাকে না। বুকে যখন গরল জমিয়া ওঠে তখনই বাহির হয় এই ডাক।

কুন্তী মুখ তুলিয়া বলিল, কি দিদি ?

ভাবিনী বলিল, বদি বাবু গেল বুঝি ? কি বলে গেল ?

বললে নীলুর আর ভয় নেই।

আবার আসবে কবে ?

বাবু বলছিল আর আসবে না।

কেন, তোর উপর গোসা করেছে বুঝি ?

কুন্তী উত্তর করে না। ভাবিনী বলিল, তুই বললি না ভাত দেওয়া অবধি নীলুকে রোজ একবার দেখতে ?

হ্যাঁ বলেছি, শেষটায় রাজীও হয়েছে।

না এসে যাবে কোথায়? কাতল. গেঁথেছিস ভাল। যাক, আমার কাপড়ের কি করলি?

আমার লজ্জা করল।

ওরে আমার লজ্জাবতী লতা। নিজের ত বেশ গুছিয়ে নিয়েছিস, যত লজ্জা পরের বেলায়।

উনি নিজে থেকে নীলুর কাঁথার জন্য এগুলো দিয়েছেন। তাই থেকে একখানা পরেছি।

ভাবিনী বলিল, নেকি! কাঁথার জন্য দিয়েছেন, তাই থেকে পরেছি। মরে গেনু।

কুন্তী কোন উত্তর করে না।

যাক এবার আমার জন্য চাইবি, বুঝলি? কি, জবাব দিচ্ছিস না কেন?

দু'তিনবার জায়ের মুখ ঝামটা খাওয়ার পর কুন্তী কহিল, কাপড় চাইতে আমি পারব না।

ভিখারীর আবার মান কি রে, হারামজাদী? আমার খাবি পরবি আবার আমার মুখের উপর না বলবি।—ভাবিনী রাগে কাঁপিতে থাকে। তার হাত হইতে মাটির কলসীটা উঠানে পড়িয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যায়।

চার

উদ্দেশ্যহীন ভাবে বহুক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া বৈদ্যনাথ রাত প্রায় এক প্রহরের সময় বাড়ি ফিরিল। তার মুখের ভাব দেখিয়া মহিম আর কোন প্রশ্ন করিল না। খানিকটা পরে রাঁধুনী নটবর খাবার লইয়া গিয়া দেখে বাবু জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে।

সে বলিল, আপনার খাবার, বাবু।

বৈদ্যনাথ উত্তর করে না। সে শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া নটবর আবার ডাকে। বার দুই তিন ডাকার পর বৈদ্যনাথ বলে, হুঁ।

রাত বাড়ে, নিস্তব্ধতাও বাড়ে—যেন মহাকালের অন্তহীন গভীর নৈস্তব্ধ্য। অন্ধকার রাত্রি, ছোট ছোট জ্যোতিষ্কগুলি আকাশে জ্বল জ্বল করে। ঈশান কোণের তারাটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল। তার নিচে নীলুর ঘর। সেখানে নীলু আছে, তার মা কুন্তী—

সে বলিয়াছে বোদে বাবুকে দেখলেই ছেলে ডরিয়ে মরবে, ওর যা চেহারা।

বৈদ্যনাথের সমস্ত মন বিষাইয়া ওঠে। মুখখানা কোঁকড়াইয়া যায়।

কী নিষ্ঠুর এই মেয়ে জাতটা!

কিন্তু, কিন্তু কার্তিকের বউও যে তাকে দেখিয়া ডরাইয়া মরিল। স্ত্রীর মৃত্যুর দিন কার্তিক এইজন্যই বলিয়াছিল, আপনি এখন যাও কর্তা, আমার বৌকে আর দেখা না দিলে।

সেই রাত্রে কার্তিক ডাকার আগে সে হরিচরণের ঘর হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। তবু ত কথাটা উঠিল। তুলিল কে, কুন্তী না কার্তিক?

বৈদ্যনাথ একবারও ভাবিল না যে তারা দুজন ছাড়াও অপর কেহ এই গুজব রটাইতে পারে।

কুশ্রীতার জন্য বহু আঘাত আসিয়াছে কিন্তু আজকে আঘাত সব-চেয়ে স্বতন্ত্র, সে গরিবকে ওষুধ দেয়, পথ্য দেয়, আতুরের সেবা করে আর লোকে বলে, শিশুরা রোগীরা তাকে দেখিয়া ডরাইয়া মরে। পুরস্কার বটে! দুনিয়া এমন পুরস্কারই দেয়।

মনে পড়ে বাল্যের একটা ঘটনা। তার পিতামহর একখানি বজরা ছিল, তিনি ও বৈদ্যনাথ একদিন বজরায় করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। নৌকা চলিয়াছে শিমুলিয়ার গাং বাহিয়া। ছোট্ট গাং কিন্তু ফুটন্ত যৌবনা কিশোরীর মতন নিজের গতিবেগে নিজেই উচ্ছল।

গাংপারে গৃহস্থের বসতি, গোশাল, ঢেঁকিশাল, মানুষপ্রমাণ উঁচু খড়ের গাদা, ধানের মড়াই। বধূরা ঘাটে ঘাটে কাজ করে, বাসন

মাজে, খালুইয়ে করিয়া মাছ ধোয়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গাংয়ের দিকে তাকায়, সপ্রশংস দৃষ্টিতে বজরাখানা দেখে।

নদীর ধারে লাল ফুলে ফুলে ছাওয়া একটা শিমুল গাছ। নিজেকে উজাড় করিয়া সে যেন আকাশে তার বুকের লাল রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে। গাছের নিচে গোলাপী রং-এর ফ্রক পরা একটি মেয়ে ছুটাছুটি করিতেছিল।

মেয়েটিকে বৈদ্যনাথের লাগে বেশ। ইচ্ছা হয় বজরা হইতে নামিয়া তার হাত ধরিয়া বলে, ওগো মেয়ে, গোলাপী মেয়ে, তুমি বড্ড ভাল। তোমায় আমার বড় ভাল লেগেছে। আমায় বিয়ে করবে? আমি ননীবাবুর নাতি, ফণীবাবুর ছেলে, আমাদের দালান আছে, আছে আলমারি আয়না, সিন্দুক, চেয়ার। তোমায় আমি আয়নার সামনে চেয়ারে বসাব, পুতুল কিনে দেব, তোমারই মতন মিষ্টি পুতুল।

কিশোরের মন সবুজ ও লালে, হরিত ফসল ও পড়ন্ত রোদের জাদুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। গাংয়ের জলেরই মতন স্বচ্ছ তার গতি-বেগ, ছলছল মুখর। মনের সেই অনাবিল ধারা হঠাৎ যেন একটা পাথরের উপর আছড়াইয়া পড়ে। কল্পনা মুহূর্তে খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। তার কানে আসে, পয়সা থাকলে কাকেও ময়ূর সাজতে পারে।

বৈদ্যনাথ মুখ ফিরাইয়া তাকায়। তাদের পাশ দিয়া বড় একটা পালের নৌকা যাইতেছিল। কথাটা বলে ঐ নৌকার হালের মাঝি। আর একটি লোক পালের দড়ি ধরিয়া ছইয়ের উপর বসিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম?

মাঝি বলিল, দেখছ না বজরার উপরের ছেলেটা কেমন সেজেছে, তাই বলছিলাম।

কুশ্রীতা লইয়া ইহাই প্রথম আঘাত।

আর একদিন। ননীবাবুর মৃত্যুর পরের কথা, বয়স তখন তার বারো। সে পাশের গাঁয়ের যোগেশবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। যোগেশ বাবুরা তাদের পালটা ঘর, দূর কুটুম্বও বটে। মহিম তাই তাকে ভাল

করিয়া সাজাইয়া দেয়। শান্তিপুরের মিহি ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী আর দামী জুতা পরায়। তেড়ি কাটিয়া মুখে মাথায় সুগন্ধি পাউডার।

বৈদ্যনাথ যোগেশের উঠানে এক ইজিচেয়ারে বসিয়া পা দুলাইতেছিল, হঠাৎ একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, বাঃ রে নূরজাহান।

ওঠে হাসির লহর। বৈদ্যনাথের সর্ব অঙ্গে যেন হুল বিঁধিতে থাকে। তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরিয়া সে জামাটা ছিঁড়িয়া ফেলে, ঘষিয়া মুখের পাউডার তোলে। মহিমকে দুমদুম করিয়া কিলায়।

মহিম প্রশ্ন করে, হ'ল কি, জ্যেঠামণি?

হ'ল হাতি। তোমার মাথা।

তারপর মনের আবেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে সে মহিমকে প্রশ্ন করিল, আমার চেহারা এত খারাপ কেন?

মহিম কোন উত্তর করে না। বৈদ্যনাথ বলে, তুমি আমায় ভালবাস না, এসবই মিথ্যে।

কি মিথ্যে?

এই আদর-যত্ন।

বৈদ্যনাথকে ছোট রাখিয়া তার মা মারা যান, আগে হইতেই মা ও ছেলের অসুখ চলিতেছিল, সর্বাঙ্গে ঘা, দেহ খসিয়া পড়ে।

মহিলার জীবিত অবস্থায়ও মহিমই বৈদ্যনাথকে লালন পালন করিত। তার মৃত্যুর পর শিশুটির সম্পূর্ণ ভার পড়িল তার উপর, লালন পালনের ভার, শুশ্রূষার ভার। সে নিজ হাতে ঘা ধোয়ায়, মলম মাখায়; সারারাত তাকে কোলে করিয়া ঘোরে। ভুলায় চাঁদ দেখাইয়া, ছেলে ভুলানো ছড়া আওড়াইয়া। বৈদ্যনাথ বড় হইয়া ওঠে। তার হাতে-খড়ি হয় মহিমের কাছে। সে তার কাছে রামায়ণ মহাভারতের গল্প করে, বলে ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা বিদুরের কাহিনী।

তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতেছে। মহিম রোজই জ্যেঠামণিকে খবরের কাগজ পড়িয়া শুনায়। শেখায় কাইজর কে, লয়েড জর্জ, ক্লেমেন্সো, পোঁত্যা, উইলসন, ফস্ এঁরা কারা।

যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর সে বলিয়াছিল, দিকৃপালদের এই রকমই হয়। তুনিয়া তাদের সহ্য করতে পারে না। মানুষ হিসাবে কাইসার ছিলেন দিকৃপাল, যেমন রাবণ নেপোলিয়ন।

ননীবাবু বলিতেন, তুমি একাধারে ওর মা বাপ গুরু ও দাইর কাজ করছ। বৌমা বেঁচে থাকলেও এতটা পারত না।

মহিম খুশি হইত। তার মনে পড়িল সেই সব কথা। সে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে বুঝলে ভালবাসি না?

বাসলে আমার গলা টিপে মেরে ফেলতে। কি দরকার ছিল আমায় বাঁচিয়ে রাখার?—বলিয়া বৈদ্যনাথ কান্না জুড়িয়া দেয়। সে কান্না আর থামে না।

মহিম শেষটায় বিরক্ত হইয়া বলে, সে শুনবে আমার মরার দিন, তার আগে নয়। বলার পর আমি আর বাঁচব না কিন্তু।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া যায়। কিন্তু সেই হইতে সে ভাল পোশাক পরা ছাড়িয়া দেয়। টেড়ি কাটে না, পাঁচজনের সঙ্গে মেশে না, সভা সমিতিতে যায় না, গেলেও এককোণে বসিয়া থাকে। ভিড় দেখিলে কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ফলে, সামাজিক জীবনের পক্ষে তার চরিত্রে কতগুলি ত্রুটি থাকিয়া যায়।

আগে গ্রামের লোকে তাকে পছন্দ করিত না। পরোক্ষে নিন্দা করিত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পাঁচজনের প্রীতি অর্জন করিল। শুধু ননীরায়ের নাতি ও ফনীরায়ের ছেলে বলিয়া নয়, লোকের ভালবাসা পাইল সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিয়া।

আজ কুন্তীর দেওয়া আঘাত তাই বুকে এত বাজিল। ভাবিনীর নিকট হইতে আসিলেও জিনিসটা কুন্তীর দান। ভাবিনী আঘাত দিতে পারিত না, কার্তিকও না। সমস্ত মালঙ্গীও নয়।

ঘরের ভিতরে পায়ের শব্দ হয়। বৈদ্যনাথ চমকিয়া ওঠে। বলে, কে?

আমি। এ কী? তোমার খাবার পড়ে রয়েছে যে? কি ভাবছ তুমি?—প্রশ্ন করে মহিম।

বৈদ্যনাথ বলিল, আচ্ছা আমি কি মানুষ মারতে পারি, জেঠামণি ?

মহিম ত অবাক্। সে বলিল, তার মানে ?

রোগীরা শিশুরা আমায় দেখে ডরিয়ে মরে।

মহিম যেন জ্বলিয়া উঠিল, কে, কে বলেছে ? এত আস্পর্ধা কার ?

কার আর হবে ? যাকে—বৈদ্যনাথ মাঝখানে থামিয়া গেল।

ঠিক এই সময় ধ্বনি উঠিল, বল হরি হরি বোল।

মনে হইল কয়লার খনির মতন গাঢ় অন্ধকারের বুকে কে যেন গাঁইতি দিয়া আঘাত করিতেছে। অন্ধকার কাঁপিয়া উঠিল। আলোর কাঁপন বৈদ্যনাথ অনেক দেখিয়াছে কিন্তু আঁধারের কাঁপন দেখিল এই প্রথম। তার বুকের ভিতরটা ঢিবঢিব করিতে লাগিল।

হরিধ্বনি ওঠে খালের ওপারে, হরিচরণের বাড়ির কাছে। বৈদ্যনাথ ঐ দিকে জানালার ধারে যাইয়া দাঁড়ায়। কান পাতিয়া শোনে। তার ভয় করে। তবে, তবে কি নীলুর—

পরক্ষণেই ভাবে, এ ভয় কেন, কিসের জন্য ? না না, যারা তাকে মরণের দূত মনে করে তাদের কথা সে আর ভাবিবে না।

মহিম নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। জেঠামণির হাব ভাবে তার কেমন যেন শঙ্কা হইল। মা, মা তারা, বলিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

নীলুর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। চোখ দু'টি দু'টুকরা মণির মতন জল জল করে। সে মায়ের হাতের আঙুল লইয়া খেলে। তার মুখের প্রতিটি ছবি মায়ের মুখে প্রতিফলিত হয়। সে হাসিলে কুন্তীর চোখে হাসি ফোটে আবার একটু কাতর শব্দ করিলেই তার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যায়।

কাল বৈকাল হইতে ছেলের মুখে এক ফোঁটা ঔষধ পড়ে নাই। বিনা ঔষধে আর কতক্ষণ থাকিবে ?

দুপুর কাটে। কুন্তীর ভাবনা হয় ভাসুর ঠাকুর ত অনেকক্ষণ হইল

রাজাবাবুর ওখানে গিয়াছেন। এখনও ফিরিতেছেন না কেন? বাবুর হাতে নিশ্চয়ই খুব শক্ত কোন রোগী আসিয়াছে, তাহা না হইলে তিনি নিশ্চয়ই আসিতেন। অমন ভাল মানুষ, অমন দয়ালু, শুধু চেহারাটা যা—

ছিঃ ছিঃ চেহারার কথা সে ভাবে কেন?

এই সময় ভাবিনী আসিয়া নীলুর পাশে বসিল। পাশেই একটা বাটিতে ছিল বার্লির জল। সে নীলুকে এক ঝিনুক বার্লির জল দিতে গেলে কুন্তী বলিল, থাক্।

"বেশ থাক" ভাবিনীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

কুন্তী ভয়ে ভয়ে বলে, একটু আগে আমি দিয়েছি কিনা। রাজাবাবু ঘন ঘন দিতে মানা করেছে। তা তুমি দাও, এক ঝিনুক বাল্লিক ত।

আমি ত মা নই। যতই করি না কেন আমি হনু জেঠাইমা, তাছাড়া তোর রাজাবাবু গোসা করতে পারে।

সে আর গোসা করেছে—বলিতে বলিতে হরিচরণ ঘরে ঢুকিল।

ভাবিনী ও কুন্তী দুজনেই বিস্মিতভাবে তার দিকে চাহিল। ভাবিনী বলিল, কেন? কি হল তার?

পাগল হয়ে গেছে।

এক রাত্তিরে পাগল! কি বলছ?

এক রাত্তির! এক লহমায় কত লোককে পাগল হতে দেখনু—বলিয়াই হরিচরণ এক লহমায় পাগল হওয়া লোকের ফিরিস্তি শুরু করিয়া দেয়। উপসংহার করে এই বলিয়া—তোর সিঁথির সিঁদুরের জোর খুব তাই ফিরে আসতে পেরেছি। একবার নাগাল পেলে আর আস্ত রাখত না। গোড়ায় ভ্যান ভ্যান করলে। তার পর এই চীৎকার, আমি মানুষখেকো। লোকে আমায় দেখে ডরিয়ে মরে।

বাবা, সে কী চেহারা! যদি দেখতে—

ভাবিনী যেন কথাগুলি গেলে, আর কুন্তী ভাবে এ কী? মানুষ-খেকো, ডরিয়ে-মরা এ সবের মানে?

ব্যাপারটা এই ; হরিচরণ যখন নীলুর খবর দিতে যায় বৈদ্যনাথ তখন পুকুরে গা ধুইতেছিল। হরিচরণ জিজ্ঞাসা করে, আপনার এ তড়াগে মচ্ছ আছেন কেমন, হুজুর ?

বৈদ্যনাথ কোন উত্তর করে না। এর একটু আগে মঙ্গল আসিয়াছিল। তার স্ত্রীরও কলেরা। বৈদ্যনাথ তাকে ফিরাইয়া দিয়াছে।

হরিচরণ আবার বলে, জয় জয় গুরু, শুনেছি এই সরোবরের জল খুব শেতল। ও ! আপনি মন্তর পড়ছ বুঝি ? যাক, আমি একটু অপিক্ষে করি।

কিন্তু চুপ করিয়া থাকা তার পোষায় না। মিনিট খানেক পরেই সে শুরু করে, আপনি একটা গাইর কথা বলছিলে না ? ছিল একটা হাড় মাস তোলা সাদা গাই, জনার্দন সেটা বায়না করেছে ; গরুটা এত রোগা যে বিওবে ব'লে মনে হয় না।

বৈদ্যনাথের দিকে চাহিয়া কথাটা সে ঘুরাইয়া নিল, এসেছি নীলমণির খবর নিয়ে। পাঠিয়েছে ছোট বৌ।

কে, কে পাঠিয়েছে ?—বৈদ্যনাথ গর্জন করিয়া উঠিল।

ছোট বৌ, নিশির ইস্ত্রি, নীলমণির মা—

ড্যাম্ ইট্। যত সব নিমকহারাম। বলিস্ তাকে আমি মানুষ খেকো। হে ! হে !···বৈদ্যনাথের মুখখানা একেবারে বীভৎস হইয়া ওঠে।

হরিচরণ বাড়ি ফিরিয়া রং চড়াইয়া ঘটনার বিবরণ দেয়। আর ভাবিনী ভিতরে ভিতরে কৌতুক ও আনন্দ বোধ করে। পুরুষের দুর্বলতায় আনন্দ। পুরুষ জাতটাই যেন কেমন, নারীর দেওয়া সামান্য আঘাতও সহ্য করিতে পারে না। একটুতেই মুষড়িয়া পড়ে, পাগল বনিয়া যায়।

বৈদ্যনাথ কুশ্রী, কুরূপ কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলে, বড় মানুষ। তার ভালবাসার দাম আছে। তাকে উপেক্ষা করিয়া লোকটা কুন্তীতে মজিল, ভাবিনীর ইহা অসহ্য। সে তাই কুন্তীর নাম করিয়া তাকে আঘাত করিল।

কার্তিক হরিচরণকে বলিয়াছে, বৌটা ভয় পেয়ে মরে গেল, দাদা।

বৈদ্যনাথের নামও সে করে নাই। কিন্তু ভাবিনী তাকে বলিল, 'কার্তিক ঠাকুরপোর বৌটোও না কি তোমায় দেখে ডরিয়ে মরেছে'। শুধু তাকেই নয়, যাতে ধরা পড়িতে না হয় এরূপ সুকৌশলে আর পাঁচজনকেও জানাইয়াছে।

নিজের অনর্থ করার এই শক্তিতে ভাবিনী উল্লসিত হয়, গর্ব অনুভব করে। আবার কুন্তীর দিকে চাহিয়া মনে মনে বলে, কেমন জব্দ!

নীলু সারিয়া উঠিল। কয়েকদিন পরে কলেরাও মালঙ্গী হইতে বিদায় লইল। গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর মতন এই সব মহামারীও প্রতি বছর নিয়ম বাঁধিয়া আসে। মাস দুই থাকিয়া আপন নিয়মেই চলিয়া যায়। পিছনে রাখিয়া যায় শোক দুঃখ অভাব ও হাহাকার।

রোগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য লোকে কীর্তন করে, হরিধ্বনি দেয়, দেব মন্দিরে ভোগ মানত করে। গরিবরা ছুটিয়া যায় বৈদ্যনাথের কাছে।

সে ঔষধ পথ্য দিয়া হয়ত একজনকে সারাইয়া তুলিয়াছে। দু' দিন পরে তার মা আসিয়া বলিল, করতা, বাত্সা-ভোগের জন্য সওয়া পাঁচ আনা পয়সা দেও।

বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তাও আমায় দিতে হবে?

নারীটি উত্তর করিল, ছেলের বাড়াবাড়ির সময় আমি যে মানত করেছিলাম পীরের দরগায়।

বৈদ্যনাথ খুশি মনেই দেয়।

এবারও এক মালঙ্গী গ্রামেরই আট দশ জনকে সে সারাইয়া তুলিল; কাহাকেও বা অর্থ সাহায্য করিল।

সে হঠাৎ নিজেকে গুটাইয়া নেয়। শুধু রোগীর সেবা ও চিকিৎসা নয়, তার নৈশ বিদ্যালয়ও বন্ধ হয়। লোকে ভাবে ব্যাপার কি?

কেহ বলে, ওর মাথা খারাপ হয়েছে! কেহ বা টিপ্পনী করে, এর মধ্যে রস আছে হে, মেয়ে ঘটিত ব্যাপার।

রসের কথা শুনিয়া অনেকেই উৎসাহিত হইয়া ওঠে, নানারকম কানা-ঘুসা চলে, বহু গুজব। এই গুজবের কারণ ভাবিনী ও হরিচরণ।

ভাবিনীর ধূর্ততায় তার জন্ম আর প্রসার হরিচরণের নির্বুদ্ধিতায়।

কেহ যদি বলে, এ সব শুনছি কি হরি? ছেলের অসুখের সময় নিশির বৌটো নাকি বোদে বাবুর সঙ্গে—

হরিচরণ কানে আঙুল দিয়া বলে, রাম রাম, ভাদ্দর বৌর কেচ্ছা শোনা মহাপাপ। আমার কানে কেউ তুলো না।

লোকে মনে করে, কুৎসাটা তাহলে ভিত্তিহীন নয়।

কুন্তীর কানেও ওঠে। সে নিরালায় চোখের জল ফেলে। এক একবার ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে, তুই এর শোধ তুলিস্ নীলু, তুলিস কিন্তু। ওদের খুব শাস্তি দিস্।

পাঁচ

এতদিন আপদে বিপদে যারা বৈদ্যনাথের কাছে ছুটিয়া গিয়াছে, বরাবর তাহার সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে, তার উপর নির্ভর করিয়াছে আজ তারা পদে পদে হতাশ হয়। কারও অসুখ করিলে সে দেখে না, দরকারের সময় তার কাছে একটা টাকা ধার পাওয়া যায় না, এমনকি পরামর্শ চাহিতে গেলেও নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেয়। ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইলে লোকে যেমন রাগ করে, সর্বপ্রকার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া গ্রামের লোকেও তার উপর তেমনই রাগ করিল।

এই সময় আসিল গণেশজননী পূজা। যুবার দল বৈদ্যনাথের কাছে চাঁদার জন্য গেল। সে চাঁদা ত দিলই না উপরন্তু কটুকথা বলিল, অপমান করিল।

কয়েকদিন পরে বৈদ্যনাথ পাশের গ্রাম জলঙ্গী হইতে মালঙ্গীর প্রাইমারী স্কুলের সামনে দিয়া বাড়ি ফিরিতে ছিল। দেখিল স্কুলের মাঠে এক দল ছেলে জটলা করিতেছে। তাদের সঙ্গে বয়স্কও আছে দু'এক জন।

তাকে দেখিয়া ছোটরা ছুটিয়া পলায়। অভিরাম গম্ভীর ভাবে সামনের তালগাছের পাতা গুণিতে আরম্ভ করে, হরিচরণ লুকায় একটা সরুগাছের আড়ালে। কিন্তু তার লাল গামছার পাগড়ি বা দেহ কিছুই ঢাকা পড়ে না।

মাঠে ফুটবল খেলার চারটা গোলপোস্টের প্রত্যেকটির উপরই একটা করিয়া কালো হাঁড়ি বসানো। তাতে সাদা খড়ি দিয়া চোখ আঁকা হইয়াছে। নাকের জায়গায় দু'টা গর্ত। হাঁড়ির উপর লেখা 'রায় বাড়ির ভূত।' 'বোদেশালা'।

বৈদ্যনাথ নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়া চাপিয়া একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে তারপর হনহন করিয়া চলিয়া যায়। তার পিছুপিছু ওঠে হাসির লহর। তার মধ্যে হরিচরণের কণ্ঠই সবচেয়ে জোরালো।

মহিম বিষয় সম্পত্তির হিসাব দেখিতেছিল। জমির খাজনা ও সুদ বাবদ কার কাছে কি পাওনা সে তার একটা ফর্দ করিয়াছে। লম্বা ফর্দ। লোকের ঋণ শোধ করার প্রবৃত্তি দিনদিনই কমিয়া যাইতেছে; শক্তিও কমিতেছে। শক্তির অভাবই হয়ত প্রবৃত্তিকে খাটো করিয়াছে।

দেখিয়া দেখিয়া তার কেমন যেন ক্লান্তি আসিয়াছিল এই সময় বৈদ্যনাথ উল্কার মতন ঘরে ঢুকিল। তার সর্ব শরীর হইতে ঘৃণা ও বিরক্তি যেন ফাটিয়া পড়ে। সে মহিমকে বলিল, কালই মহকুমায় যাও, প্রজাদের নামে মামলা রুজু কর। যত শিগগির পার। সকলের আগে জব্দ কর হরে বেটাকে।

মহিম কোন উত্তর করিল না।

বৈকালে বৈদ্যনাথ কথাটা আবার তুলিলে মহিম বলিল, এখন থাক্।

থাকবে কেন?

রাগের মাথায় কিছু করতে নেই, জেঠামণি।

আমার অতগুলো টাকা পাওনা, সবাই ঠকিয়ে খাচ্ছে আর তুমি বলছ দেরি করতে!

পাওনা আদায় করতে নিষেধ করিনি, তবে এতদিন কড়া তাগাদা পর্যন্ত করা হয় নি, আজ হঠাৎ নালিশ করলে ওরা যে বড় বিপদে পড়বে।

বৈদ্যনাথ বলিল, তোমার খালি দয়া আর দয়া।

দয়া যে তোমার আরও বেশী—বলিয়া মহিম হাসে।

ক'দিন আগেও সে প্রজাদের কড়া তাগাদা করিলে বৈদ্যনাথ বলিত, গরিব মেরে কাজ, কি জেঠামণি? চলুক না যতদিন চলে। আজ সে কহিল, না। দয়ার ওরা অযোগ্য, এই গরিবরা।

মহিমের মনে পড়িল বৈদ্যনাথের পিতামহর সম্পত্তি করার কাহিনী। জলঙ্গী, মালঙ্গী মিয়াপুরের গরিব দুঃখীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস। সে বলিল, ওদের দয়ার অযোগ্য করে তুলেছি আমরা, আর—আর করেছে সমাজ।

বৈদ্যনাথ রাগ করিল। বলিল, তুমি আমায় এই কথা বললে?

বৃদ্ধ উত্তর করিল, তোমাকে কি আমি জানি না জেঠামণি? তোমায় কিছু বলিনি, বলেছি এই সমাজ ব্যবস্থাকে যাতে গরিব দিনের পর দিন আরও গরিব হয়। ওদের এই সব অবস্থার জন্য দায়ী আমরা।

বৈদ্যনাথ এদিক দিয়া গেল না। বলিল, তুমি যদি না পার তবে আমার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

মহিম বৈদ্যনাথের কাছে এই জবাব আশা করে নাই। সে অবাক হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, আমিও ভাবছিলুম তোমায় বলব, আমার শরীর আর বইছে না।

বৈদ্যনাথ তখন কিছু বলিল না। বৈকালে জলঙ্গীর মেঘনাদ চক্রবর্তীকে ডাকিয়া পাঠাইল। লোকটি বিষয়-কর্মে নিপুণ, কিছুদিন আগেও শ্রীধরপুর এষ্টেটে নায়েবি করিত। কি এক অপরাধে বরখাস্ত হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ তাকে বলিল, জেঠামণির শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে, বয়সও হ'ল অনেক। এখন থেকে তুমিই সব দেখাশুনো কর। ওঁর কাছ থেকে কাগজ-পত্তর বুঝে নাও। প্রজাদের নামে মামলা রুজু করতে হবে।

নূতন এই ব্যবস্থায় মহিম আঘাত পাইল খুবই। পদ্মাপারের গ্রাম

নদীতে ভাঙিয়া পড়ার আগে মাটির বুকে যেমন দাগ পড়ে বৃদ্ধের বুকের ভিতরটাও আগে হইতে সেই রকম চিড় খাইয়া গিয়াছিল। সে অনুভব করিত জীবন-দীপের তেল যেন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তবু কাজ করিত, করিত স্নেহের তাগিদে, কিছুটা বা অভ্যাসের বশে।

সেই কাজ বন্ধ হওয়ায় শরীর দ্রুত ভাঙিতে লাগিল, আসিল অক্ষুধা, অরুচি, মাথা ঘোরা।

বৈদ্যনাথ কিন্তু ভুল বুঝিল। মনে করিল বৃদ্ধের অসুস্থতার কারণ ঈর্ষা। মেঘনাদকে রাখায় সে রাগ করিয়াছে। সেও তার নিকট হইতে সরিয়া গেল।

মহিমও অভিমান করিল। অর্ধশতাব্দীব্যাপী স্নেহ, সেবা, প্রীতি ও প্রেমের ভিত্তি যে এত শিথিল সে ইহা কল্পনাও করে নাই। নিজেকে সে গুটাইয়া নেয়। অসুস্থতার কথা বৈদ্যনাথকে জানিতে দেয় না। ওষুধ ত খায়ই না, সময় মতন পথ্যও নয়।

তার সতর্ক দৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরবাকরদের কাজ কমিল, স্বাধীনতাও বাড়িল। তারা খুশি হইল, সবচেয়ে খুশি হইল মেঘনাদ।

বৈদ্যনাথের প্রজারা আদালতের শমন পাইল। মামলা সে করে না। তাগাদাও করে খুব কম। দশ টাকা পাওনার জায়গায় দুই টাকা দিয়া মহিমকে ধরিয়া পড়িলেই সময় পাওয়া যায়। প্রতি কিস্তিতেই পাওনা কিছুটা মকুব হয়।

জমিদার মহাজন দয়ালু হইলে যাহা হয় এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। গরিবের ঋণ বাড়িয়াছে। ধনীর পাওনার অঙ্ক স্ফীত হইয়াছে।

এবার শুধু নালিশই হয় নাই। পাওনার চেয়ে দাবি হইয়াছে ঢের বেশী। যার কাছে পাঁচ টাকা পাওনা সে পনের টাকার শমন পাইয়াছে। টাকার সুদও ধরা হইয়াছে।

ভাবিনী স্বামীকে বলিল, বাবুর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা কর।

হরিচরণ বলিল, লাভ নেই। বাবু দেখা করবেন না।

তবু যাও, খোশামুদি কর, বড় মানুষের মন আশ্বিনে মেঘের মতন, এই বৃষ্টি হচ্ছে, এই ফুরুক করে উড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু, কিন্তু তিনি কি বৌমার ঘর নিলেমে তুলবে?

মরণ দশা! একটা মুর্গীর বুদ্ধিও কি তোমার নেই?

রামচন্দ্দর, রামচন্দর। হাঁসের সঙ্গেই নয় তুলনা করতিস। হিন্দুর ছেলে আমি—বলিয়া হরিচরণ সরিয়া পড়ে।

পর পর কয়েকটা বৈঠক করিয়া চাষীরা স্থির করিল দল বাঁধিয়া বৈদ্যনাথের বাড়ি যাইবে। তাদের বক্তব্য একটা দরখাস্তে লিখিয়া তার কাছে পেশ করিবে। এই দরখাস্ত সম্পর্কে একমত হইতেই লাগিল পুরা দুইটা বৈঠক। উহা লিখিল মঙ্গলের পুত্র বেঁটে বীরু। সে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়িয়াছে। বর্তমানে কলিকাতায় বার্মাশেলের আপিসে ব্যয়রাগিরি করে।

সবাই বার বার এই দরখাস্ত শুনিল, অনেক কাটাকুটির পর উহা দাঁড়াইল এইরূপ—

মহামহিম মহিমার্ণব জমিদার, প্রতিপালকপ্রবর শ্রীল বৈদ্যনাথ রায় অর্ণবপোতেষু—

অশেষ প্রণাম মিনতি পূর্বক দরখাস্ত কার্য্যঞ্চাগে, আমরা আপনকার অধীনস্থ ভিটাবাড়ি তথা জমি খাই। আপনার দয়ার ছত্র-ছায়াতলে স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া এতদিন সুখেই বাস্তব্য করিতেছিলাম। হঠাৎ বিনামেঘে অশনি নিপাত হইয়াছে। আমাদের নামে পাওনার নালিশ হইয়াছে। আমরা মহামহিম আদালতের লুটিশ পাইয়াছি। উহাতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রমাদ আছে। অনেকের নিকটই পাওনার চেয়ে বেশী দাবি করা হইয়াছে। সেগুলি অত্র দরখাস্তর সঙ্গে বেত্রের কাঁটা দিয়া আটকানো 'অ' তপশিলে লিখিত হইল। অতএব হুজুরে আরজি এই যে আপনি অধীন জনগণের বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়া নিন। আমাদের ঋণ শোধ করিতে সময় দিউন আর তপশিলে লিখিত ভ্রম প্রমাদ সংশোধিত হোক।

আমরা পূর্বেরই মতন হুজুরের মঙ্গল কামনা করি। হুজুর শতায়ু হৌন। পুরুষানুক্রমে আমাদের প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হৌক।

ইতি ভবদীয় প্রজামণ্ডলী পক্ষে

কেতু বাঘ, জহুরী বাঘ, মঙ্গল দাস, মোজাদ্দেক হুসেন মরহুম ইত্যাদি।

জলঙ্গী, মালঙ্গী, মিয়াপুরের প্রায় সমস্ত প্রজা স্বাক্ষর বা টিপসই দিল। সকলের নিচে যোগ হইল একটা পুনশ্চ। পুঃ—অধীনগণের আরজি এই যে আমাদের নিকট কখনও খাজনার সুদ লওয়া হইত না। কিন্তু এবার মামলা করা হইয়াছে প্রাপ্য ধান ও খাজনার সুদসমেত। এই সম্পর্কে কৃপাপূর্বক বিবেচনা করিবেন আশা করি।

কার্তিক কহিল, মঙ্গল দাকে নিতে পারলে ভাল হত। রাজাবাবু তার সঙ্গে পাঠশালে পড়ত। তাকে ছেদ্দা করে।

উপেন বলিল, সে যাবে না। বাবুর কাছে এর আগে কি কাজ নিয়ে গিছল। ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে আর ওমুখো হয় নি, হবেও না বলেছে।

পাঁচজনে যাইয়া সুরেনকে ধরিল, বাবুর বাবার সঙ্গে তুমি কংগ্রেস করেছিলে, তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

সুরেনের বয়স হইয়াছে, শরীরও খারাপ। সে যাইতে রাজী হয় না। বেঁটে বীরু বলে, আপনি বুড়ো বাবুর সঙ্গে কংগ্রেস করেছিলে। আপনি গেলে সুরাহা হবে।

সুরেন শেষটায় সম্মত হয়। পরের দিন কেতুর বাড়ি হইতে রীতিমত একটা মিছিল বাহির হইল। দলের পুরোভাগে কেতু, মোজাদ্দেক জহুরী প্রভৃতি কয়েকজন।

সাধ্যমতন সকলেই কিছু কিছু নজরানা লইয়া চলিয়াছে; তার উপর গাছের ফল পাকুড়টাত আছেই।

পথ চলিতে চলিতে কেহ নিজেদের দুঃখ দুর্দশার গল্প করে, কেহ সুর ভাঁজে, কেহ করে বৈদ্যনাথের অতীত উদারতার প্রশংসা।

উপেন বলিল, বাবু ত ভালই ছিল। যত নষ্টের গোড়া নীলুর বৌটা। আস্তাকুঁড়ের মেয়ে মালঙ্গীতে এসে ঠাঁই নিয়েছে। তখনই বুঝেছি ওকে নিয়ে বিপদ হবে। বৌটা নষ্ট।

কেতু ধমক দেয়, চুপ কর উপিন!

কিন্তু উপেন নাছোড়বান্দা। সে বলে, আমি তখনই বলেছিলুম ওদের একঘরে করতে। তা হলে নিশি বউকে নিয়ে ভাগত। আমাদের এ বিপদ হত না।

কার্তিক বলিল, তোমার রাগ ত নিশিদা সোঁদর বউ এনেছিল ব'লে।

য়্যাঁ, তুই, তুই এ কথা বললি,—ভুধের ছেলে হয়ে—উপেন রাগে যেন ফাটিয়া পড়ে।

অভিরাম বলে, কথাটা ত সত্যি উপিন খুড়ো।

গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া উপেন চুপ করিল।

এই সময় চৌকিদার শান্তি থানা হইতে ফিরিতেছিল। সেও মিছিলের সঙ্গে চলিল। কার্তিক তার বাল্যবন্ধু, তাকে বলিল, আমি গারমিণ্টের লোক, পুলিস। সঙ্গে গেলে বাবু হয়ত নরম হবে।

কার্তিক বলিল, তুই কি দারোগা না মাজেষ্টর যে বাবু তোর পরোয়া করবে?

তা নয়, তা নয়।

বৈদ্যনাথের উঠানে এক কান-কাটা লালচোখ একটা কুকুর ছুটাছুটি করিতেছিল। হরিচরণ তাকে দেখিয়াই বলিল, তুই বেটা এতবড় হয়েছিস, তুই আমাদের তিলির বাচ্চা না? তিলি আর করালীর। তোর মায়ের নাম রেখেছিল ভবু।

ঘেঁউ ঘেঁউ করিয়া কুকুরটা তাকে রুখিয়া যায়।

তুই এতটা হিংসুটে হলি কোত্থেকে? তোর মা হিংসে জানত না, গলায় মাছের কাঁটা আটকে গেলেও টুঁ শব্দ করত না।

অহিংস কুকুরীর বাচ্চাটি কিন্তু এসব কানে তোলে না। হরিচরণের

হাঁটুর উপর সামনের দুটা পা তুলিয়া আরও জোরে চেঁচাইতে থাকে। তার লকলকে জিভ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে।

হরিচরণ কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকে, ও বংশী, বংশী ভাই, অ কেতু খুড়ো।

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়া বংশী আশ্বাস দেয়, নাড়ুগোপালকে ডাকো হরিভাই। বিপদে তিনিই রক্ষা করবেন।

হরিচরণ ডাকে, ও মহিম জেঠা, তোমাদের কুকুর সামলাও; শালাকে ডাকো।

তার গলা দিয়া স্বর যেন বাহির হয় না।

এই সময় বৈদ্যনাথের ছোকরা চাকর ঝড়ু ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, সোমালি।

সোমালি হরিচরণকে ছাড়িয়া দিয়া লেজ নাড়িতে থাকে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে ছোট একটি বিড়ালছানা। সোমালি তাকে তাড়া করিয়া যায়। ছানাটাও রুখিয়া দাঁড়ায়, লেজ নাড়িয়া ফোঁস ফোঁস করে।

হরিচরণ সোল্লাসে চিৎকার করিতে থাকে, ধর্ মেনি ধর্, দে শালার টুঁটি কামড়ে।

অন্য কুকুর হয়ত পিছাইয়া যাইত কিন্তু সোমালি এক কামড়ে ছানাটাকে তুলিয়া দাঁত ও নখ দিয়া কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

মিনিট খানেক সবাই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; একমাত্র বংশী বলিল, সবই নাড়ুগোপালের খেল।

মেঘনাদ বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি মনে করে কেতু?

উত্তর দিল বংশী, এলাম শ্রীধাম নবদ্বীপে।

তার মানে?

বংশী বলিল, মহাপ্রভুর দর্শন মানস।

মেঘনাদ বলিল, করতা বাবুর দর্শন? তা সুবিধে হবে না।

খুদে বংশী, বংশীধরের চেলা। তার নাম মাখন। মহিমের মতন সেও গোত্রহীন, পরিচয়হীন বিদেশী।

কথাবার্তা, ফোঁটাকাটা এমন কি নাড়ুগোপালের দোহাই দেওয়া সকল বিষয়েই সে বংশীর অনুকরণ করে, তাই লোকে তাকে ডাকে খুদে বংশী। তবে তার চেহারা গুরুর সম্পূর্ণ বিপরীত। গুরু বিরাটকায়, চেলাটি বেঁটে খাটো। সে বলিল, আমাদের জগাই মাধাইদের তরাবার জন্যইত বাবু এসে মালঙ্গীতে ভূত হয়েছেন।

বংশী ধমক দেয়, তুই থাম্ শালা, আবির্ভাব বলতে বলছিস ভূত।

খুদে বংশী বলিল, ও একই কথা। যার নাম আবির্ভাব, তারই নাম ভূত।

মেঘনাদ মোজাদ্দেক ও কেতুর দিকে চাহিয়া বলিল, তোমাদের দরকার কি বল দেখি?

নিজ নিজ অভিযোগ জানাইবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। কেতু কিংবা মোজাদ্দেক কিছু বলার আগেই কার্তিক কহিল, আপনি এসেই যে আমাদের নামে মামলা হল, চক্কোত্তি মশাই।

মেঘনাদ বলিল, মামলা করেছি বাবুর হুকুমে।

উপেন বলিল, কিন্তু তিনি ত এতদিন কিছু করেন নি।

জমিদার চিরকাল তার পাওনা ফেলে রাখতে পারে না। তাঁকেও সদর খাজনা পথকর দিতে হয়। তার উপর আবার জুটেছে শিক্ষাকর।

শান্তি বলিল, টাকার ভাবনা নেই নায়েব মশয়। টাকা আমরা ফেলে রাখব না।

লম্বা লম্বা কথা ত তোমার আছেই। কিন্তু খাজনা দেওয়ার বেলায় এক পয়সা ছোঁয়াবে না, খালি দাদার দোহাই দেবে।

মোজাদ্দেক বলিল, আমাদের হাতে যে টাকা থাকে না হুজুর।

মেঘনাদ বলে, সচ্ছল মতন টাকা ক'জনের থাকে? ওরই মধ্যে কিছু কিছু করে দেনা দিতে হয়।

সুরেন বলিল, আমরা একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। তাতেই সব লেখা আছে। হুজুরের কাছে সেটা পেশ করতে হবে।

আমার কাছে দেও। আমিই পেশ করব। কর্তার হুকুম সেইরকম।

বেঁটে বীরু বলিল, হুজুরকে বলুন স্থরেন জেঠা এয়েছেন। হুজুরের বাবার সঙ্গে জেঠা কংগ্রেস করেছেন।

ক'গ্রেসের দোহাই অনেকেই দিয়েছে। তাতে কোন কাজ হবে না।

জনতার মধ্যে এবার গুঞ্জন ওঠে। কার্তিক বলে, আমার কাছে পাওনা সাত টাকা। নালিশ হল আঠার টাকার।

উপেন বলিল, আমার বেলায়ও ভুল হয়েছে। জনার্দন বলিল, পাওনার স্থদ ধরেছেন কেন? স্থদের স্থদ।

অভিরাম বলিল, আমার কাছে পাওনা নেই তবু নালিশ করা হয়েছে।

মেঘনাদ বলিল, কি রকম? আমি নালিশ করেছি চেকমুড়ি দেখে।

অভিরাম বলিল, আমরা ত সব সময় রসিদ পাইনা। কে আর একজন বলিল, নেইও না। বিশ্বাসের উপর টাকা দেই।

রসিদ থাকে মহিম জেঠার কাছে, গোলযোগ কোনদিন হয় না। তিনি শিবতুল্য মানুষ।

মানুষগুলা কথার পর কথা ছুড়িয়া মারে। কলরব হয় প্রচুর। অনেক কথাই শোনা যায় না।

মেঘনাদ বলে, থাম থাম, এক একজন করে কথা বল। সবাই একসঙ্গে চেঁচালে আমি কার কথার জবাব দেব?

কার্তিক বলিল, আমার কাছে পাওনা বেশী ধরা হয়েছে।

বিরিঞ্চি বাগ্গা বলিল, স্থদ আমরা জান গেলেও দেব না। জনার্দন বলিল, গেল বছর মোজাদ্দেক মিয়ার কাছে আমি যে জমি বেচেছি তার খাজনার জন্যও আমার নামে নালিশ হয়েছে।

মোজাদ্দেক বলিল, তুমি বিলকুল গোলমাল বাধিয়েছ নায়েব ঠাকুর।

বিরিঞ্চি কহিল, মহিম জ্যেঠা কই? আমরা তার সঙ্গে দেখা করবো।

দেখা করব রাজা বাবুর সঙ্গে।

মহিম জ্যেঠা শিবতুল্য মানুষ।

জমিদার আমাদের দয়ার সাগর।

বংশী দেখিল মেঘনাদ রীতিমত রাগিয়া গিয়াছে অথচ তার ক্ষমতা

যথেষ্ট। সে বলিল, দয়ায় নায়েব ঠাকুরও কম যান না। উনি হলেন জলঙ্গী মালঙ্গীর বলভদ্দর।

মোজাদ্দেক বলিল, আমাদের আরজি ওঁর হাতে দাও কেতুদা।

মেঘনাদের হাতে দরখাস্ত দিয়া কেতু বলিল, সুদটা বড় বেশী ধরা হয়েছে, নায়েব ঠাকুর।

মেঘনাদ বলিল, বেশী মোটেই নয়। সব এষ্টেটে যা ধরে আমরাও তাই ধরেছি। জমিদারকেও অনেক সময় সুদে টাকা ধার করে খাজনা-পত্তর দিতে হয়।

সুরেন বলিল, ওঁর ত দেনা নাই।

বংশী কহিল, সিন্দুক ভর্তি টাকা।

মেঘনাদ বলিল, সব জমিদারই প্রজাদের কাছে বাকী খাজনার সুদ নেয়।

বিরিঞ্চি বাঙ্গা বলিল, আমাদের বাবু ত আর পাঁচজন জমিদারের মতন নয়।

মোজাদ্দেক বলিল, সেই জন্যই ত তানার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মেঘনাদ বলিল, কর্তাবাবু কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

কার্তিক আবার বলিল, আপনি পাওনার চেয়ে বেশী দাবি করেছ কেন?

মেঘনাদ বলিল, মামলা করেছি খাতাপত্তর দেখে; সে সব মহিমবাবুর লেখা—বলিয়াই দরখাস্তখানার উপর চোখ বুলাইয়া নেয়।

অভিরাম বলিল, আমরা মহিম জ্যেঠার সঙ্গে দেখা করব।

মেঘনাদ বলিল, তাঁর অসুখ।

বংশী বলিল, তা হলে আমরা, আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করব, কাজ হবে। অদ্বৈত প্রভুকে দর্শন করাও হবে।

নিষেধ আছে। কর্তার হুকুম ছাড়া কেউ তার ঘরে যেতে পাবে না।

শান্তি চৌকিদার বলিল, কেন, তাকে নির্বাসন দিয়েছে কেন?

হরিচরণ মন্তব্য করিল, বুড়োর অবস্থা তাহলে অশোকবনে সীতা-ঠাকরুণের মত।

জনার্দন জিজ্ঞাসা করিল, দুইজনে মনান্তরি হয়েছে বুঝি ?

গুরুদাস বলিল, পাছে দয়া দেখায় সেইজন্য তাকে আটকেছে।

মোজাদ্দেক মেঘনাদের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার নাম করে গিয়ে কর্তাকে বলুন যে আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মেঘনাদ বলিল, কর্তা বড় রেগে গেছেন যে।

বংশী বলিল, আগে তিনি বাড়ি বাড়ি করুণা বিলিয়ে বেড়াতেন আর আজ দর্শন দিতেও নারাজ !

এর কারণ তোমরা যারা তার কাছ থেকে উপকার পেয়ে এসেছ, এই যেমন হরিচরণ।

হরিচরণ চিৎকার করিয়া উঠিল, আমি, আমি ?

মেঘনাদ বলে, হ্যাঁ তাঁকে তোমরা অনেক রকমে অপমান করেছ। পাঠশালায় কালো-হাঁড়ি টানাবার দলে তুমি ছিলে হরিচরণ। অভিরাম আর মোজাদ্দেক সাহেবের ছোট ছেলে নোকরাসিও ছিল।

হরিচরণ মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে তাকায়।

মোজাদ্দেক বলে, এ্যাঁ, নোকরাশিটা এমন বেয়াড়া হয়েছে।

মেঘনাদ বলিল, সেদিনও কে একজন কর্তাকে গাল দিয়ে গৈবী চিঠি দিয়েছে।

গৈবী চিঠি দিয়াছে উপেন। সে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, বাপ মার নামে কিরে ক'রে—

বংশী বলিল, ওসব কথা যাক পিনদা। এস, আমরা কীর্তন করি। কীর্তন করলেই দর্শনলাভ হবে।

মেঘনাদ বলিল, কর্তা তাহলে আরও চটে যাবেন।

বংশী বলিল, কীর্তনে সব হয় কর্তা। দিনকে রাত, রাতকে দিন করা চলে, নদীর গতি বদলে দেওয়া যায়। বুড়ো মানুষ যুবো মেয়ের ভালবাসা পায়।

তোমরা গোলমাল করলে কর্তা শেষটায় আমায় বকাবকি করবেন।

গোলমাল নয়, করব নাম কীর্তন—বলিল খুদে বংশী।

বংশী বলিল, কীর্তনে রাগ করবেন তিনি! সেও কি হয়? তিনি যে পরম গোঁসাই। তার বাবা ফণীবাবু নামরসে মশগুল হয়ে থাকতেন রসগোল্লার ভাঁড়ে মাছির মতন।

কর যা হয়, বলিয়া মেঘনাদ ভিতরে চলিয়া গেল।

বংশী ধরিল,—গুপিগণ চায় কানুর পিরিতি।

তার খুদে সংস্করণ ধরে—কানুর পিরিতি

বংশী গায়,—কানুর পিরিতি গোলাপের রীতি

ঘিরে আছে তায় কাঁটা।

এবার তাদের সঙ্গে হরিচরণ ধরিল—ঘিরে আছে তায় কাঁটা।

ক্রমে ক্রমে আরও দু'চারজন যোগ দেয়। সে এক বিকট চিৎকার, কানে যেন কাঁটাই বেঁধে।

বৈদ্যনাথ এবার বাহির হইয়া আসে, তার পিছনে সোমালি। কুকুরটা হিংস্র দৃষ্টিতে হরিচরণের দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গেই তার গান বন্ধ হয়। সে যাইয়া লুকায় স্থূলবপু মোজাদ্দেকের পিছনে।

বৈদ্যনাথ বলিল, কি চাও তোমরা? শুধু শুধু চেঁচামেচি করছ কেন?

বংশী বলিল, আমরা বিন্দাবনের গুপিরা—

পাদপূরণ করিয়া দিল তার চেলা—বিন্দাবনের গুপিরা এয়েছি আপনার দর্শন মানস।

বৈদ্যনাথ ধমক দিল, বাজে ব'ক না।

হরিচরণ বলিল, আমাদের ভাসিয়ে দেবে কর্তা? নীলুর দিকে চাইবে না? তার প্রাণ দিয়ে শেষটায়—

বৈদ্যনাথের মুখ কঠোর হইয়া ওঠে।

বিরিঞ্চি বাঙ্গা বলিল, এতদিন দড়ি আলগা দিয়ে এসেছেন। এখন জোরে ফাঁস টানলে আমরা যে দম আটকে মরব।

মোজাদ্দেক বলিল, আমরা আপনার ভিটেয় বাস্তব্য করি, জমি খাই।

বংশী বলিল, আপনার মাটি, আপনার জল—

হরিচরণ বলিল, আমাদের নীলু, ছোটবৌর—

গ্যেট আউট্, গ্যেট আউট্—বৈদ্যনাথ গর্জন করিয়া ওঠে।

প্রভুর রাগ দেখিয়া সোমালিও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তার জিভ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল। বংশী বলিল, ব্যাপার সুবিধে নয় মাখন। বেটা হয়ত কুকুর লেলিয়ে দেবে।

মাখন কহিল, আমারও সেইরকম ঠেকছে দাদা।

ভয়ে হরিচরণের মুখ সাদা হইয়া যায়।

কেতু বৈদ্যনাথের দিকে চাহিয়া বলে, আমাদের কি ব্যবস্থা করবেন হুজুর?

তোমাদের দরখাস্ত পেয়েছি, এখন তোমরা যাও। পরে যা হয় জানতে পারবে—বলিয়াই বৈদ্যনাথ ছোকরা চাকর ঝড়ুকে আদেশ করে, এরা বেরিয়ে গেলে সদর দরজা বন্ধ করে দিস।

কেতুরা অগত্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। সদর পর্যন্ত তাদের পিছু পিছু আসে সোমালি, মাটি শোঁকে, নাক দিয়া শব্দ করে।

জমিদার বাড়ির বাহিরে আসিয়া সর্বাগ্রে হরিচরণ বলিল, শালা কুকুরটার জন্য অমন পাঁচসেরি লাউটা ফেলে আসতে হ'ল।

বিরিঞ্চি বলিল, আমি রেখে এসেছি দইর ভাঁড়টা।

আরও কয়েকজন তাড়াতাড়িতে ফল পাকুড় ফেলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু উহা প্রকাশ করিল না।

উপেন বলিল, মনে করতুম বাবু লোকটা ভাল। ক্রমে ক্রমে নিজের রূপ বেরিয়ে পড়ছে।

কে একজন বলল, এ আর হ'ল কি? কালে কালে আরও কত দেখব।

সাধু সেজে আর থাকবে কতদিন? পৌত্তুর অন্তর ফল হবে ত।

কৃতজ্ঞতা জিনিসটাই বুঝি এমন, ঝাড়িয়া ফেলিতে মানুষের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। যারা সেদিনও বৈদ্যনাথের কাছে প্রচুর উপকার পাইয়াছে, একে একে তারা সবাই যোগ দেয়। নিন্দা তারাই করে বেশী। ননী-বাবুকে বলে হারামি, ফণীকে বকধার্মিক।

একমাত্র গুরুদাস প্রতিবাদ করে, এর ভিতর তোমরা বাবুর দান ভুলে গেলে ?

উপেন বলিল, উপকার করেছে ত মাথা কিনে নিয়েছে। করেছে বাপ ঠাকুর্দার পাপের পাচিত্তির। তাই কি আমাদের দেনা শোধ হয়েছে ?

ননী রায়ের :জমিদারির ইতিহাস অনেক জমিদারির ইতিহাসেরই মতন মসীলিপ্ত। কাটনিতে রেলের চাকরির সময় ঘুষ খাইয়া, কুলিদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমের অর্জিত পয়সায় ভাগ বসাইয়া ননী প্রচুর টাকা করেন। দেশে আসার পর কাবুলীওয়ালার মতন মোটা সুদে টাকা খাটান। কিছুটা তালুক ভুঁই কেনেন, বাকীটা দখল করেন লাঠির জোরে। মিথ্যা মামলা করিয়া, দাঙ্গাবাজী করিয়া গরিবদের ভিটাছাড়া করেন।

প্রবাদ যে আশে পাশে বিলে নদীতে, রাস্তা ঘাটে যে সব ডাকাতি হইত তিনি তার ভাগ পাইতেন। তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তিই গরিব দুঃখীর চোখের জলে গড়া।

রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলা যেন আক্রোশে ফাটিয়া পড়ে। সেই আগুন হইতে বৃদ্ধ মহিমও বাদ যায় না। উপেন বলিল, সব অনর্থের গোড়া ঐ নাগপুরী। টাকা নিয়ে জমা করেনি, রসিদ দেয়নি।

বংশী বলিল, ও ত শয়তান হবেই। জারজ আবার ভাল হয় কবে!

অভিরাম বলিল, কথাটা শুনেছি বটে। ব্যাপার কি বল দেখি।

উপেন বলিল, ও বেটা ননী রায়ের ঝিএর ছেলে। বেটা দেশে এসে রটাল, ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছি।

কার্তিক বলিল, তোমরা এই না বলছিলে মহিম জেঠা শিব তুল্য লোক ?

গাঁজার শিব হে, ভাঙ গাঁজার শিব—কে যেন মন্তব্য করিল।

হরিচরণ কহিল, জন্মের দোষকে আমি কিন্তু দোষ বলে ধরি না। নিজের জন্মের উপর ত কারও হাত নেই।

বাঃ রে হরিচরণ—বলে খুদে বংশী।

উপেন বলিল, ভাবি শিখিয়েছে বুঝি।

পথে যাইতে যাইতে সবাই মিলিয়া রায়েদের, মহিমের ও মেঘনাদের শ্রাদ্ধ করে।

এরই মধ্যে বংশী এক একবার বলিয়া ওঠে, সবই নাড়ুগোপালের খেল।

হরিচরণ বাড়ি ফিরিলে ভাবিনী বলিল, তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি বৈফল হয়ে ফিরছ। বিধেতা তোমায় যে কেন পুরুষ মানুষ করে গড়েছিল জানি না।

হরিচরণ বলিল, শুধু কি আমি? বৈফল হয়েছে সবাই। অমন যে বংশী, বোষ্টমে বোষ্টম, বক্তারে বক্তার সেও সুবিধা করতে পারে নি। বাবুটা আর একটু হলে কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছিল।

কুকুর?

হ্যাঁ তিলির বাচ্চা। কুকুর না যেন বাঘ।

নাগপুরী বুড়োকে ধরেছিলে?

তার যে অসুখ, নইলে ধরতাম। সে ভুল হ'ত না, তেমন সোয়ামীর হাতে তুমি পড়নি ভবু।

ভাবিনী ধমক দেয়, আবার ঐ কথা। বুড়ো বয়সেও ভবু!

এক আধবার ওরকম হয়ে যায়—বলিতে বলিতে হরিচরণ সরিয়া পড়িল।

তেন্নাথের মেলায় গাঁজা টানিয়া রাত্রে সে কার্তিককে বলিল, পুরুষ মানুষের চাইতে মেয়েরা অনেক আগে বুড়িয়ে যায়। কি বলিস, কাতু?

কার্তিক বলিল, সে আর বলতে, দাদা। বৌদির কথা মনে করে বলছ বুঝি।

হরিচরণ কহিল, ঠিক ধরেছিস। আমার তবু রস আছে কিন্তু ভাবি কেমন যেন—বলিয়াই সে গান ধরে,

ভবুর পিরিতি গোলাপের রীতি—

কার্তিক বলিল চুপ কর দাদা, বৌদি টের পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছয়

আবেদন নিবেদনে কোনও সুফল ফলিল না। বৈদ্যনাথ একমাত্র জনার্দনের বিরুদ্ধে মামলাটা তুলিয়া লইল। প্রজারা আশা করিয়াছিল ধান খাজনার সুদ হয়ত মাফ পাইবে। কিন্তু পাইল না। মেঘনাদ বৈদ্যনাথকে বুঝাইল দয়া-দাক্ষিণ্য আর বিষয় সম্পত্তি রক্ষা পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। দয়া করিলে জমিদারি নষ্ট হইবে।

বৈদ্যনাথ বলে, তা ঠিক, নরম মানুষের উপব লোকে সুবিধে নেয়।

আমি থাকতে আর সে সুবিধে নিতে দেব না, করতা। তা দিয়েছেন মহিমবাবু, তার ত আর নিজের জিনিস নয়।

বৈদ্যনাথ তার জেঠামণির বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্যে খুশি হয় না কিন্তু কোন প্রতিবাদও করে না। আর মেঘনাদ সুবিধা পাইলেই দু' একটা টিপ্পনী করে। বৈদ্যনাথকে বুঝায়, বৃদ্ধ যদিও লোকটা ভাল কিন্তু তার জন্য বিষয় সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে।

ঢেউয়ের পব ঢেউয়েব মতন দিনগুলি গড়াইয়া যায়। বৈদ্যনাথ যেন ঐ ঢেউয়ে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। কোন কিছুই দেখে না, খেয়াল করে না। মহিমের কোন খবর নেয না। বৃদ্ধও অভিমান করে। নিজের ব্যাধি, নিজের অসুবিধার কথা গোপন করিয়া যায়। কিন্তু বৈদ্যনাথের জন্য তার ভয় হয়।

অমন সাদাসিধা মানুষ তাব জেঠামণি, মেঘনাদ তার চারদিকে মাকড়সার জাল বুনিতেছে, এই জালে জড়াইয়া পড়িলে বেচারা আর বাহির হইতে পারিবে না।

নিজে কিছু সুবিধা করিতে পারিবে না মনে করিয়া একদিন বৈকালে সে গ্রামের শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিল। মানুষটি সাত্ত্বিক প্রকৃতির। সর্বদা হাসি খুশি মুখ, ক্ষমাপর। সবাই তাঁকে মানে। দূর সম্পর্কে তিনি বৈদ্যনাথের দাদা হন। তাঁকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া মহিম কহিল, দেখুন আপনি যদি জেঠামণিকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে কিছু করতে পারেন। আমি ত হাল ছেড়ে দিয়েছি।

শিবচন্দ্র বলিলেন, তুমি পারলে না, আমার কথা কি আর শুনবে ?

তবু দেখুন চেষ্টা করে। এতে শুধু জেঠামণির মঙ্গল নয়, মঙ্গল গাঁ শুদ্ধ সবার।

শিবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সম্মত হন। কিন্তু তাঁর কথায়ও কোন ফল হয় না। বৈদ্যনাথ বলে, মাফ করবেন শিবুদা, আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারব না। প্রজারা ভারি নিমকহারাম, আমায় কিনা অপমান করে ?

শিবচন্দ্র বলিলেন, অন্যায় করেছে তা জানি, কিন্তু ওরা জাত নিমকহারাম নয়। মানুষ কেউই মন্দ হয়ে জন্মে না, ওদের খারাপ করেছে পারিপার্শ্বিক।

বৈদ্যনাথ কোন উত্তর করিল না বটে কিন্তু তাঁর অনুরোধও রক্ষা করিল না। ব্যাপারটায় বরং কুফলই ফলিল। সে মহিমের উপর আরও রাগ করিল।

মামলার জবাব দিবার জন্য বিবাদীরা এক কমিটি করিল। তার সভাপতি হইল বৃদ্ধ কেতু। তারা প্রতিটি পরিবার হইতেই অর্থ সংগ্রহ করিল। যারা অসমর্থ, কমিটি নিজ খরচায় তাদের মামলা চালাইবার ভার নিল।

ভাবিনী হরিচরণকে কমিটিতে যোগ দিতে দিল না। বলিল, আমাদের ও দলে গিয়ে কাজ নেই।

হরিচরণ বলিল, যাব না কেন ? কথায় বলে, দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

ভাবিনী বলিল, গোল্লায় যাক্ তোমার দশজন, আমি যা মতলব ঠাউরেছি তাতে আমাদের জমি এমনিই রক্ষে হবে।

কি, কি মতলব ?

সে সময় মতন বলব।

কিন্তু পাঁচজনের দলে যোগ না দিলে তারা যে আমায় ঠাট্টা করবে।

কেউ ঠাট্টা করলে আমার কাছে এসে ব'ল।

হরিচরণ অগত্যা হাল ছাড়িয়া দেয়।

উভয় পক্ষেই মামলা জোর চলিতে থাকে, খরচা ও মেহনত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রতি আক্রোশও বাড়ে। একদিকে একা বৈদ্যনাথ আর একদিকে জলঙ্গী মালঙ্গী ও মিয়াপুর। একদিকে টাকা, উকিল মোক্তারের বুদ্ধি কৌশল আর একদিকে দারিদ্র, অজ্ঞতা। তবে তাদের আশা ভরসা সঙ্ঘশক্তির উপর।

বৈদ্যনাথ এমনিই বাড়ির বাহির হয় না, লোকে তাকে পায় না। মেঘনাদকে একা পায়, তার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ে, নানাভাবে তাকে অপমান করে। একদিন সে একা বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিল, পাঁচ সাতজন মুখোস পরা লোক তাকে বাগানে টানিয়া নিয়া তার মাথার ও গোঁফের একদিক কামাইয়া দিল, মুখে আলকাতরা মাখাইল। বলিল, তোর মুনিবকেও একদিন এই রকম নাজেহাল করব বলে দিস।

পরদিন মেঘনাদ রায় বাড়িতে আসিল সম্পূর্ণ মাথা কামাইয়া। বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, কি হে মেঘু, ব্যাপার কি ?

ওরা আমার গুরুদশার অবস্থা করে ছেড়েছে। রাজকার্যের বিপদই এই। পেলে আপনাকেও অপমানী করবে—মেঘনাদ অনেক কিছু বাড়াইয়া বলে।

বৈদ্যনাথ গম্ভীরভাবে বলিল, আচ্ছা।

সেই হইতে সে প্রায়ই বাহির হয়, সন্ধ্যার পরও হাটে বাজারে যায়। কিন্তু কেহ তাকে সামনাসামনি কিছু বলে না, বলিতে ভরসা করে না। বরং সেলাম আলেকুম, গড় করি হুজুর, শরীল গতিক ভাল ত, ইত্যাদি বলিয়া অভিনন্দন জানায়।

এর ব্যতিক্রমও আছে দু' একজন, যেমন পরশুরাম, মোজাদ্দেক, বিরিঞ্চি বাগ্গা। পরশুরাম বলে, ঐ মানুষটার সঙ্গে ওরা যে কি করে হেসে কথা কয় তা আমি বুঝি না বড়মিয়া।

মোজাদ্দেক বলে, ওদের দোষ নেই। আমাদের খুনের মধ্যে গোলামি ঢুকে গেছে।

মেঘনাদ লোকটা ভীরু স্বভাব। সে বৈদ্যনাথকে বলিল, একা একা বেরুতে হয়, আমার একটা হাতিয়ারের ব্যবস্থা করে দিন।

কি হাতিয়ার ?

একটা রিভলভার।

রিভলভারের পাশ কি দেবে ?

আপনাকে দেবে। আপনি জমিদার, তার উপর পরোপকারী।

বৈদ্যনাথ একটু হাসিল।

রিভলভারের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দেওয়া হইল, সেই দরখাস্ত আবার থানায় আসিল রিপোর্টের জন্য।

বৈদ্যনাথ মেঘনাদকে বলিল, থানায় বড়বাবুকে আমার নাম করে গিয়ে বল, তিনি যেন ভাল রিপোর্ট দেন।

থানার অফিসার ইন্ চার্জের নাম রাখাল দাশগুপ্ত। বছর খানেক আগে তাঁর ছেলের টাইফয়েড হয়। বৈদ্যনাথ চিকিৎসা করিয়া তাকে মৃত্যুমুখ হইতে ছিনাইয়া আনে। তার বিশ্বাস ছিল খবর পাইলেই দাশগুপ্ত ভাল রিপোর্ট দিবেন।

থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেঘনাদ বলিল, দারোগা ভাল রিপোর্টই দেবেন। তবে বললেন, আসছে হপ্তায় হেড কনষ্টেবল শ্যাম দত্তের মেয়ের অন্নপ্রাশন। তার খরচটা আপনি চালিয়ে দিলে ভাল হয়। ঘি ময়দা মিষ্টির খরচা। মাছ আলু আর মশলাপাতির ব্যবস্থা তাঁরাই করে নেবেন।

বৈদ্যনাথ বলিল, হেড কনষ্টেবলের মেয়ের অন্নপ্রাশন! এর চেয়ে সোজাসুজি টাকা চাইলেই পারতেন।

যাহা হোক অন্নারম্ভের ঘি ময়দার খরচা বৈদ্যনাথই যোগাইল। মেঘনাদ উহা হইতেও বেশ কিছু মোটা লাভ করিল।

কয়েকদিন পরে আসিল একটা মামলার খবর। প্রজা কমিটি ভাল উকিল দিয়া ঐ মামলায় পাকা জবাব দেয়। প্রশ্ন ওঠে জমির স্বত্বাধিকার সম্পর্কে, জমি কার, বৈদ্যনাথের না তার জ্ঞাতি লক্ষ্মণের।

বৈদ্যনাথের ভয় ছিল এই মামলায় তার হার হইবে এই সময় মেঘনাদ মহকুমা হইতে আসিল জয়ের খবর লইয়া। থানা হইতে পুলিস আনাইয়া

ঢাকী ঢুলী লইয়া সে বিবাদী উপেন ও লক্ষ্মণের বাড়ির সামনে বাজনা বাজাইল।

মহিম ইহাতে আপত্তি করিলে সে বলে, রাজ্য শাসনের নিয়মই এই।

দু'তিন দিন পরে বৈদ্যনাথের নিকট সে এই মামলার হিসাব দাখিল করে। শুধু মুহুরি পেশকার পেয়াদাকে নয়, এবার হাকিমকেও ঘুষ দিতে হইয়াছে—মোটা টাকা আর দু' দুটা খাসী।

বৈদ্যনাথ বলিল, এই হাকিমকে নাকি এক উপরওয়ালা ধমকে দিয়েছিলেন ?

মেঘনাদ বলিল, হাকিম গুরুর নামে মন্দির উৎসর্গ করবেন। শুনেছি সেই মন্দিরের খরচা উঠে গেলে আর ঘুষ খাবেন না।

বৈদ্যনাথ হাসিয়া কহিল, উঁচু দরের ভক্ত বটে। সে যাক্ এ মামলায় দেখছি জমির দামের দশগুণ খরচা পড়ল।

মেঘনাদ এবারও সেই একই যুক্তি দেখায়, রাজ্য রক্ষার নিয়মই এই। এবার ত আমরা জিতেছি, হারলেও মনে করতুম খরচাটা বিফল যায় নি।

বৈদ্যনাথ বলিল, কি রকম ?

জমিদারের লোকসান দেওয়ার ক্ষমতা আছে বুঝলে প্রজারা ঢিট থাকে। আশে পাশের জমিদাররাও কিছু করবার আগে পাঁচবার ভাবে।

যাক্ খাসী দুটোর দাম পড়ল কত ?

পঁচানব্বই টাকা।

এত !

মস্ত বড় খাসী, খাসী না যেন বাছুর। তা ছাড়া জাপানীরা মণিপুরে এসে পড়ায় খাসী পাঁটা সোনার দরে বিকুচ্ছে।

খবরটা মহিমের কানে যায়। সে দেখে মেঘনাদ রীতিমত শোষণ চালাইয়াছে। সে তার ইষ্ট দেবীকে ডাকে, মা আমার জেঠামণিকে তুমি দেখো।

সাত

ভাবিনী কেরোসিনের কুপির সামনে বসিয়া সলিতা পাকাইতেছিল। পাশে নীলু ঘুমাইয়া। পিছনের বারান্দায় কুন্তী মাছ ভাজিতেছে। মাছ ভাজার গন্ধে ভাবিনীর মুখ লালায় ভরিয়া যায়। সে সলিতা পাকায় ঐ লালা দিয়া।

বাহিরে অন্ধকারের বুকে তারই ঘরের ঠিকরাইয়া পড়া আলো মৃদু মৃদু কাঁপে। ভাবিনী এক একবার তন্ময় হইয়া ঐ আলোর কাঁপন দেখে, কখনও বা নীলুর দিকে তাকায়।

বেশ মুখ খানি নীলুর, দেখিতে ভদ্র ঘরের ছেলের মতন। কুন্তীর পেটের ছেলে এত সুন্দর ভাবিনী ইহা সহ্য করিতে পারেনা।

ভগবান্ কী এক চোখো! ভাবিনী পাশের গ্রামের মাতব্বর ফটিক দাসের শালার মেয়ে, তার ভাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের গরুর গাড়ী চালায়, জলঙ্গীর তারা বনেদী বংশ। তার কোলে একটা ছেলে আসিল না; আর কলিকাতার ঐ ভিখারিনীর অমন ফুটফুটে ছেলে হইল। কোথাকার আস্তাকুঁড়ের মেয়ে আসিয়া চাঁদ কোলে করিয়া জুড়িয়া বসিল।

বাহিরের আলোটাকে আড়াল করিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল একটা মানুষ। ভাবিনী উরুর উপরে সলিতায় জোরে পাক দিয়া বলিল, কে রে?

সে ভাবিয়াছিল হরিচরণ আসিয়াছে।

মূর্তিটি বলিল, আমি কার্তিক।

ওঃ, কেতো, তুই কি মনে ক'রে? তোর দাদা কোথায়?

কার্তিক কাহল, জানি না।

দু'জনে মিলে তেন্নাথ কচ্ছিলি ত। (তেন্নাথ অর্থাৎ ত্রিনাথ মহাদেবের নামে গাঁজা টানা)।

কার্তিক কহিল, আর তেন্নাথ! মামলায় আমরা হেরে গেছি।

ভাবিনী বলিল, কুমিটি করে ত এই হল। তখন মানা করিনি যে বড় লোকের সঙ্গে লড়াই করতে যাস নে?

কিন্তু এওতো অসহ্য বৌঠান যে টাকা আছে বলে সে আমাদের নামে মিথ্যে মামলা করবে, আমাদের পথে বসাবে।

ভাবিনী বলিল, কিন্তু সেই ত জিতল।

কার্তিক বলিল, আমাদের বরাত। শুধু ঘর বাড়িই নিলামে উঠবে না, ঘটি-বাটিও টেনে বার করবে। এদিকে কমিটির পয়সাও ফুরিয়ে গেছে। মালি-মকদ্দমা আর চলবে না। কেউ একটা পয়সা দিতে চাইছে না।

ওঃ—বলিয়া ভাবিনী গম্ভীর হইয়া যায়।

নিজের অনর্থ করার শক্তিতে এতদিন তার মনে আত্মপ্রসাদ ছিল। সারা গ্রাম তার দু'টা কথার ফলে তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছে। বৈদ্যনাথ খেপিয়াছে, কুন্তী জব্দ হইয়াছে। এ ত তারই জয়।

কিন্তু আজ কেমন যেন ভয় করে। আশঙ্কা অজানা বিপদের। এর কুফল শেষটায় তাদের উপরেও আসিয়া পড়িবে না ত ?

ভাবিনীর রাগ হইল কুন্তীর উপর। অন্য সব ব্যাপারে যাহা হয় এই ব্যাপারেও তাহাই ঘটিল। সমস্ত অনর্থের দায়িত্বই সে চাপাইয়া দিল কুন্তীর উপর।

ক্রমাগত ভাবিয়া ভাবিয়া নির্জলা মিথ্যাটাই তার নিজের কাছেও সত্য বলিয়া মনে হইল। সে খালি ভাবিত এই সব গোলমালের জন্য কুন্তী দায়ী। তাকে বলিল, ডুবুলি ত ? সংসারটা একেবারে গোল্লায় দিলি !

আমি কি করলুম, দিদি ?

ডুবে ডুবে জল খেয়েছিস্।

এ কী বলছ তুমি ? আমি ত কোন অন্যায় করিনি। আর বাবুও সে রকম লোক নয়।

ওঃ, খুব যে দরদ ! বাবুকে নিয়ে খেলিয়েছিলি, কিন্তু শেষ অবধি সামলাতে পারলি না।

আমি মোটেই খেলাই নি।

তবে কি খেলিয়েছি আমি ? হতভাগী মুখপুড়ী !

হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত কুন্তীর মনে হয় বদিবাবুর এই রাগের জন্য তার জা'ই দায়ী নয় ত ?

এই ধারণার কারণ সে খুঁজিয়া পায় না বটে কিন্তু মন হইতে উহা ঝাড়িয়াও ফেলিতে পারেনা। বিশ্বাসটা ক্রমেই বরং দৃঢ় হইতে থাকে।

দিনের পর দিন তার লাঞ্ছনা বাড়ে। ভাবিনীর দেখাদেখি আর পাঁচটা মেয়েও মুখর হইয়া উঠে। একদিন বিশ্বাসদের পুকুর ঘাটে উপেনের মেয়ে মাধবী ব'লিল, বদি বাবুর সঙ্গে তোমার এমন কি হ'ল যাতে ক'রে সারা দেশটার উপর সে খেপে গেছে ?

ঘাটে আর পাঁচটি মেয়ে ছিল। তাদের সামনে কুন্তী যেন লজ্জায় মরিয়া যায়, চাহিয়া দেখে মেয়েরা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সে ঘাট হইতে উঠিয়া পড়ে। তাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বিরিঞ্চির বোন কেশী বলে, রূপের ওর দেমাক কত, রূপ যেন আর কারো নেই।

বিশ্বাসদের পুকুর আর কুন্তীদের বাড়ির মাঝখানে চন্দ্রদাসের প'ড়ো ভিটা। বহুদিন এখানে কেহ বাস করে না, জায়গাটা জঙ্গলে জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে। বন বিড়াল, সাপ, শিয়াল, সজারু বাস করে। দিনের বেলায়ও এখানে আসিতে লোকে ভয় পায়।

ভিটায় আসিয়া কুন্তীর পা আর চলে না, সে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়ে। তার মাথার ভিতরে যেন পোকায় কুরিয়া খায়।

কী কষ্টের এই জীবন, শুধু লাঞ্ছনা আর অপমান, দুঃখ আর দুঃখ. এর যেন অবধি নাই।

ধীরে-ধীরে চোখের উপর সব অন্ধকার হইয়া আসে। তারই মধ্যে এক একবার যেন জোনাকি জ্বলে, কানে আসে ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ।

শরীর ক্লান্ত, বসিয়া থাকিতেও কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় এই আগাছা পর গাছার ভিতরেই একটু গড়াগড়ি করিতে। এপাশে মনসা গাছ, ওপাশে শিয়ালকাঁটার উপর শুঁয়াপোকা হাঁটে। লোকে বলে, এই জঙ্গলে দাঁতালো শুয়ার আছে। ভয়ে কুন্তী আর শোয় না।

কিছুক্ষণ পরেই চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে একটা বিলের ছবি, শুধু

জল আর জল। এই বিল তার জন্মভূমি কালিকাপুর। ফসলে ফসলে ভরা দিগন্ত প্রসারী মাঠ, আম কাঁঠাল গুপারির বাগান, জানাদের মস্ত বাড়ি, তার সামনে বিরাট দিঘি, দিঘির পুবে স্কুল, লাইব্রেরী। অদূরে কুন্তীদের মেটে ঘর, গোশাল, ঢেঁকিশাল, ধানের মড়াই। এ তার বাল্যের স্বপ্নভূমি।

জল নিকাশ বন্ধ হওয়ায় কালিকাপুর সেবার বর্ষায় ডুবিয়া গেল। ডুবিল পথঘাট গৃহস্থের উঠান। গরিবের ঘরের ভিতরেও জল উঠিল।

পাশের এক জেলে-জমিদারের নাকি ইহাতেই সুবিধা। জল যাতে না নামে তিনি তার ব্যবস্থা করিলেন। পরের বর্ষায় এই জলের উপরই জল জমিতে লাগিল। এই ভাবে চলিল কয় বৎসর।

প্রথমবার কুন্তী ছিল বেশ ছোট। জল বাড়ে, তারও মজা বাড়ে। সে বলিত, সব পুকুর হ'য়ে গেল, মা। কী মজা! আমরা খালি নাইব, ডুব্যো, ডুব্যো নাইব।

কুন্তীর বাবা কিরণের প্রথম হয় চাষ বন্ধ। ক্রমে ক্রমে হাল গরু বলদ বিক্রয় হইয়া যায়। বাস্তু বন্ধক পড়ে। শেষে শুরু হয় উপবাস আর মা বাপের নিত্য কলহ, চুলাচুলি, মারামারি।

কুন্তী একটু একটু করিয়া বড় হয়। সে বোঝে এই অনর্থের মূল ঐ জল। সে দরজায় দাঁড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া বলে, যা, যা পাজী জল, দূর হয়ে যা। কখনও বা কিল দেখায়।

আরও বছর দুই পরে। একদিন কিরণ কুন্তীর মা চিরুনীকে বলিল, শুনেছ, এবার আমাদের কেলেশ ঘুচবে।

চিরুনী কহিল, তাই করুন ধাতা পুরুষ। কি করে ঘুচবে বল দেখি।

ক'লকাতা থেকে জল নিকাশের জন্য ইঞ্জিন আসছে।

ওঃ—চিরুনী এমন ভাবে বলিল যাহাতে মনে হয় ইঞ্জিনের সাহায্যে জল নিকাশের সরল উপায়টা সে যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

কিরণ বলিল, এ কিন্তু গাড়ীর ইঞ্জিন নয়, মানুষ-ইঞ্জিন।

চিরুনী স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকে।

কুন্তী একবার কলিকাতা দেখিয়াছিল। সেখানে ট্রামে বাসে চড়িয়াছে, এক দোকানে হালুয়া কচুরী খাইয়াছে।

বড় বড় বাড়ি, হাওড়ার পুল চিড়িয়াখানা, গঙ্গাবক্ষে সাগরগামী জাহাজ তার শিশু-মনে রূপকথার রাজপুরীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই শহর হইতে মানুষ-ইঞ্জিন আসিবে জল নিকাশের জন্য—শুনিয়া সে অনেক কিছু কল্পনা করিল।

ইঞ্জিন অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়র আসিল, সঙ্গে ওভারসিয়ার ও সাবওভারসিয়ার ডজনখানেক। কিন্তু জল কমিল না, বরং বাড়িয়া গেল। কুন্তীর বাবা, তার জ্ঞাতি জেঠা তরণতারণ, পাড়ার ভূতেশ ইঞ্জিনিয়রদের উদ্দেশে গালি পাড়িল, যত সব শালা চোর, বড় লোকের পয়সা খেয়ে জল আরও বাড়িয়ে দিলে।

এর পরই তাদের জীবনে আসে ১৩৫০ এর মন্বন্তর, কলিকাতার পথে পথে ভিখারী-জীবন। সে আর এক ছবি। ডাষ্টবিনের পাশে কিরণের মৃতদেহ, তার মুখ আকাশের দিকে, মুখে মাছি ভন ভন করে, শব ঠোকরাইয়া খাওয়ার আশায় অদূরে কতগুলি কাক ক ক জুড়িয়া দিয়াছে। বিপরীত দিকের ফুটপাথে কালো এক ঘেয়ো কুকুর। তারও দৃষ্টি কিরণের শীর্ণ হাড় ক'খানির উপর।

পুলিসের ভয়ে মৃতদেহ ঐখানে ফেলিয়াই তারা পালাইল। এই ছবি আর হারানো মায়ের স্মৃতি কুন্তীর বুকে ঝড় তোলে।

পিছন হইতে কে যেন ডাকে, রাঙা বৌ না?

কুন্তী চমকিয়া ওঠে। রাঙা বৌ! এ যে তার স্বামীর আদরের ডাক, আর কারও ত জানার কথা নয়। সে ফিরিয়া দেখে পিছনে বংশী বোষ্টম।

বংশী বলিল, ভয় পেয়ে গেলে দেখছি। রাঙা বৌ নামও আমার দেওয়া। আমিই নিশিকে বলি, সোঁদর বৌ তোর, তুই ওকে রাঙা বৌ বলে ডাকবি।

তার স্বামীর সঙ্গে বংশীর এতটা অন্তরঙ্গতার কথা কুন্তী জানিত না। বংশী আবার বলিল, ভর সন্ধ্যেয় তুমি এখানে বসে যে?

বিশ্বেসদের পুকুরে গিছলুম গা ধুতে। এখানে এসে মাথা ঘুরে গেল তাই বসে আছি।

বাড়ি পৌঁছে দেব তোমায়?

না দরকার নেই—বলিয়া কুন্তী উঠিয়া পড়ে।

আট

নিম্ন আদালতে বৈদ্যনাথের প্রজারা হারিল। অর্থাভাবে আপিল আর হইল না। কেতুরা দু'একজন টাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু আর সবাই বলিল, ঘটি-বাটি বেচে মামলা করে লাভ নেই। জিতলেও শেষ অবধি আমাদেরই হার হবে।

নিলাম জারির তারিখ আসে। খবরটা শুনিয়া ভাবিনী কুন্তীকে বলে, তোর একবার রাজাবাবুর ওখানে যেতে হবে।

কুন্তী কহিল, আমায় কেন?

বাঁচতে হবে ত আমাদের। বাবুকে গিয়ে ধরবি যাতে ঘর বাড়ি নিলেম ক'রে না নেয়। কি, নিশ্চুপ রইলি যে?

একি বলছ, দিদি?

ঠিকই বলছি। কাজ হাসিল করার নিয়মই এই। ভদ্দর লোকেরা আরও বেশী ক'রে থাকে।

ভাসুর ঠাকুরই ত গিছলেন।

নেকী। সে আর তুই? সে হ'ল বুড়ো হাবড়া, আর তুই সোমত্ত মেয়ে। অমন ঢল ঢলে যৈবন তোর।

ভাবিনীর স্বভাবই হিংস্র, নিজ স্বার্থের জন্য না করিতে পারে এমন কাজ নাই। কুন্তী তাহা জানে। তবুও তার আজকের প্রস্তাবে সে অবাক হইয়া গেল।

ভাবিনী কহিল, পষ্ট বলছি শোন্। বাবুকে ব'লে কয়ে নিলেম যদি আটকাতে না পারিস তা হ'লে এ ঘরে আর ঠাঁই হবে না।

নীলুকেও তোমরা ভাসিয়ে দেবে—তুমি, ভাসুরঠাকুর?

তার জন্ম আমাদের কি দায় শুনি? যারা জন্ম দেয়, ছেলেমেয়ের দায় তাদের। জেঠা-খুড়োর নয়। আমরা ছোট লোক, মুখ্যু তাই দেওর পো, ভাসুর পোকে দেখি। নেকাপড়া জানা মেয়েরা ঐ জন্ম আমাদের বোকা ভাবে।

কুন্তী কহিল, কিন্তু—

ঘরখানা তার স্বামীর টাকায় তোলা, তা'তে তাদেরও অধিকার আছে—ভাবিনীর সঙ্গে সমান অধিকার। সে বোধ হয় ইহাই বলিতে চায় কিন্তু ভরসা করে না।

ভাবিনী গর্জন করিয়া উঠিল, আমার কথার উপর আবার কিন্তু—

কুন্তী কহিল, আমি পারব না।

পারব না! এত বড় আস্পর্ধা তোর—বলিয়াই ভাবিনী হাতের কাছের একটা কঞ্চি তুলিয়া সপাং করিয়া কুন্তীর মুখের উপর মারে। তার ঠোঁট কাটিয়া মাটির উপর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে।

নীলু এতক্ষণ চুপ করিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সে জেঠাইমার দিকে কচি হাতের মুঠা তুলিয়া বলিল, মালব, মালব।

ভাবিনী বলে, ওঃ বাবা, ডিম ফুটতে না ফুটতেই কুলোপানা চক্কর।

মুখে বলে বটে কিন্তু নীলুর উপর সে রাগে না।

ঐ অবস্থায়ই কুন্তী বৈদ্যনাথের বাড়ির দিকে রওনা হয়। নীলু ডাকে, মা, মা।

কিছুটা যাইয়া কুন্তী একবার ফিরিয়া ছেলের দিকে তাকায় আবার চলে। আর ফিরিয়া চায় না।

চাষের সময় নয়, মাঠ জনশূন্য। পথ আলের উপর দিয়া। মাথার উপর রৌদ্র খাঁ খাঁ করে। মাটিতে পা রাখা যায় না।

কুন্তী সকাল হইতে কিছু খায় নাই, স্নান করিয়া এত বেলা পর্যন্ত ঢেঁকিতে ধান কুটিয়াছে কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা কোনদিকেই তার খেয়াল নাই। সে চলিয়াছে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া।

মেঠো পথের পর লোকাল বোর্ডের রাস্তা। খাল পারের এই রাস্তা

দিয়া সে বড় সাঁকোর দিকে চলিয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, উস্কোখুস্কো চুল, বুকের বাঁ-পাশের কাপড় সরিয়া গিয়াছে, দেখিলে মনে হয় যেন এক পাগল।

সাঁকোর কাছটায় ডানদিকের মেঠো পথ ভাঙিয়া তার সামনে আসিয়া কার্তিক ডাকিল, বৌঠান।

তার আকস্মিক আবির্ভাবে কুন্তী চমকিয়া উঠিয়াছিল, সে তার দিকে চাহিয়া রহিল। কার্তিক বলিল, বদি বাবুকে আমার কথাও ব'ল।

কুন্তী অবাক্ হইয়া তার দিকে চাহিয়া থাকে—সে যে বদিবাবুর ওখানে যাইতেছে কার্তিক তাহা জানিল কি করিয়া ?

কুন্তীর একবার মনে হয় সাক্ষী রাখিবার জন্য তার জা'ই তাকে পাঠাইল নাকি ?

কার্তিক বলিল, তোমাদের আর আমার ঘর একদিনে নিলেমে উঠবে শুনলুম। তুমি আমার হয়ে ব'ল কিন্তু। তোমার কথা বাবু ফেলবে না।

ব্যাপারটা এই, আগের দিন রাত্রে কার্তিক ও হরিচরণ গাঁজার আড্ডা হইতে ফিরিতেছিল। চৈত্রের শেষ, খানিকটা আগে একপশলা জল হইয়া গিয়াছে। মেঘ তখনও কাটে নাই। অন্ধকারে আলের উপরের পিছল পথ চলিতে চলিতে কার্তিক বলিল, তোমাদের নতুন বৌটো ভালই গেছে। কি বল হরিদা ?

নতুন বৌ অর্থাৎ কার্তিকের স্ত্রী।

হরিচরণ নীরব।

কার্তিক বলিল, ভিটে নিলেমে চড়লে পাগলী ফুঁপিয়ে মরত। বড় লোকের মেয়ে ত। তার বাপের হাল বলদ ঢেঁকি, নেই কি ? পাকা রম্ভা বেচেই বছরে অমন বিশ কুড়ি পঞ্চাশ টাকা পায়। তাছাড়া কচু আছে, ইয়া ইয়া মানকচু।

গাঁজা ও ভাঙের প্রভাবে হরিচরণের তখন পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত। সে বলিল, তা যা বলেছিস্। বৌটো ভালই গেছে। সত্যিই ত বেঁচে থাকার দাম আর কি ?

কার্তিক এই উত্তর আশা করে নাই সে মনে করিয়াছিল হরিচরণ তার

স্ত্রীর জন্য দুঃখ করিবে। বলিবে, নতুন বৌর মতন বৌ এ তল্লাটে ছিল না। বউ না যেন আশমানতারা। সে হতাশার সুরে বলিল, যাই বল, পাগলী মেয়েটা ছিল খাসা।

হরিচরণ বলিল, তার জন্য মনটা মাঝে মধ্যে হু হু করে ওঠে বুঝি? ঝড় বয়? তা হবেইত। বউ ত আর ফেলনা জিনিস নয়। এই যে তোর বৌঠান চব্বিশ ঘণ্টা আমায় বোকা বেল্লিক বলে সেও যদি চলে যায় তা হলে আমার কি আর সুখ সাধ থাকবে?

কার্তিক রাগিয়া যায়, বুড়ার কী আস্পর্ধা, পাগলীর সঙ্গে করে ভবির তুলনা?

হরিচরণ কিছুই খেয়াল করে না। সে বলিয়াই চলে, তোর ভবি বৌঠান কিন্তু ভারি বুদ্ধিমন্ত, খাসা মতলব ঠাউরেছে।

কি মতলব?

সে অতি গুহ্যি কথা। তবে তোকে বলি, তুই জ্ঞাতি ভাই, তার উপর এক—থাক সে কথা, আমাদের ভিটে বোধ হয় রক্ষা হ'ল।

টাকার যোগাড় হয়েছে বুঝি? কোন্ শালা দিলে, মোহন সার ছেলে বুঝি? বেটাকে আমি এত করে ধরলুম।

হরিচরণ বলিল, না টাকার যোগাড় হয় নি।

তবে?

বড় বউ একটা মতলব ঠাউরেছে। বুদ্ধিতে হীরালাল মোক্তারও তার কাছে হার মানে। তোকে বলছি সব, তুই একটা দিব্যি কর্।

কার্তিক বলিল, কল্কের দিব্বি, বাবা তেন্নাথের—

না না, এতবড় দিব্বির দরকার নেই, কল্কেতেই চলবে।

ভব বৌঠান কি মতলব ফেঁদেছে?

নীলুর মাকে সে বদি বাবুর কাছে পাঠাবে।

তার মানে! তুমি রাজী হলে তাতে?

হয়েছি বৈকি; বড় বউর ক্ষ্যামতা কি যে আমার অমতে কিছু করে? বড় বৌ, ছোট বউ নীলু কারও কোন ক্ষ্যামতা নেই।

কিন্তু একী বলছ দাদা ? কুলবধূ যাবে জমিদার বাড়ি ভিক্ষে করতে ! তা আবার আমাদের কুলের কুলবৌ।

হরিচরণ একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলিল, না রে না। কুলের কথাই উঠছে না। বদিবাবু নীলুকে ভালবাসে তাই তোর বড় বৌঠান তার মাকে পাঠাচ্ছে।

কার্তিকের মনে পড়ে নিজের ডিক্রির কথা। স্বার্থবোধ এবার কুল-মর্যাদাকে ছাপাইয়া যায়। বিশেষতঃ কুন্তী তার ঘরের বৌ নয়, জ্ঞাতির ঘরের। সে মনে মনে ভাবিল তার ঘরের কথাটাও কুন্তীকে দিয়া বলাইলে কেমন হয়। কুন্তী তার একবয়সী, দু'জনে ভাবও আছে, সে হয়ত তার কথা ফেলিবে না।

কিন্তু, কিন্তু—বদিবাবুই বা কুন্তীর কথা শুনিবে কেন ? তবে কি নীলুর অসুখের সময়ই কিছু ঘটিয়াছে ?

কিন্তু বৌটাত এরকম ছিল না।

পরক্ষণেই মনে হয়, মানুষের মন শুকনা খড়ের গাদার মতন, সহজেই আগুন ধরে।

সে সাত পাঁচ কত কি ভাবে। এই সময় হরিচরণ বলিল, সেই গানটা একবার ধর ত কাতু—

তোমার গুণ কত বাখানি, বউ।

কাতিক বলিল, গান এখন জমবে না, দাদা।

হরিচরণ অগত্যা নিজেই ধরিল—

তোমার গুণ কত বাখানি বউ
গুণ কত বাখানি,
তুমি চাঁটি গাঁয়ের শুঁটকী মাছ
আর ঢাকার বাখরখানি।

কার্তিক সকাল হইতেই প্রতীক্ষায় ছিল, কথাটা কখন কুন্তীকে বলিবে। কিন্তু সুযোগ মিলে নাই। বেলা ১১টার পর চাউল কিনিতে সে হাটে আসিয়াছিল। সেখান হইতে দেখিল দক্ষিণ দিকের মাঠ ভাঙিয়া

কুন্তী যাইতেছে। সে পিছু পিছু আসিয়া অপেক্ষাকৃত এই নির্জন জায়গায় তাকে ধরিল।

বাবু তোমার কথা ফেলবে না,—বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল। কুন্তীর মনে হইল, কী আস্পর্ধা! এতটা সাহস তার আসিল কোথা হইতে?

পরক্ষণেই ভাবিল এর কারণ গ্রামের গুজব। সারা গ্রামেই যে রটিয়াছে। কার্তিকের একার আর দোষ কি?

কুন্তীর রাগ হয় জায়ের উপর, নিজের উপর। হয়ত বা বৈদ্যনাথের উপরও কিছুটা।

সে ভাবে, না, বাবুদের বাড়ি যাইয়া কাজ নাই। পরক্ষণেই মনে পড়ে নীলুর মুখ, জায়ের রুদ্রমূর্তি। সে আবার মারিবে, নীলুকে উপবাসী রাখিবে।

মা, মা—বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কুন্তী আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

বৈদ্যনাথ নিজের ঘরের ইজি চেয়ারে শুইয়া বাঁ হাতের তর্জনীতে একটা লাল ফিতা জড়াইতেছিল। জড়ায় আর খোলে, ধীরে ধীরে পা দুলায়।

ডাইনের দেয়ালে ননী রায়ের তৈলচিত্র, বাঁয়ে ফণী বাবুর। ফণী বাবুর চাহনি কেমন যেন ক্রূর, জীবিতকালীন তাঁর সহাস্য চাহনির বিপরীত।

এমনটি ত ছিল না, তার বাবা তাকে কত ভালবাসিতেন। তাঁর প্রতিকৃতির মধ্য দিয়াও সেই স্নেহ যেন ফুটিয়া বাহির হইত।

আজ সে এই পরিবর্তনের অর্থ খুঁজিয়া পায় না। কখনও ভয় করে, কখনও মনে হয় দেখার ভুল। তার মনের রংও বদলাইয়াছে—সবই দেখিতেছে সেই রঙে রঙিন করিয়া।

ছিল ছন্নছাড়া জীবন, ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। চলার পথে আসিল কুন্তী। সবই বদলাইয়া গেল, সে জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইল। তার অনুভূতি তীব্র হইল, তীক্ষ্ণ হইল। সাধ জাগিল জীবন উপভোগের। কুন্তী না আসিলে সে হয়ত নিজেকে খুঁজিয়া পাইত না।

কিন্তু আঘাতও তৈরি হইয়াছিল। সেই আঘাতও দিল কুন্তী। অতটা ব্যথা তাকে আর কেহ দিতে পারিত না।

কিন্তু দিল কেন ?

ভাবনার স্রোতের পর স্রোত বহিয়া যায়, বিচ্ছিন্ন মেঘের মতন টুকরা টুকরা ঘটনা। যোগেশ বাবুর বাড়ির অপমান, বজরার অভিজ্ঞতা, কুন্তী, নীলু, মামলা মকদ্দমা, পুকুর পারে ভাবিনীর সঙ্গে দেখা, কুকুর দু'টার ছুটাছুটি। আবার কুন্তী—

চোখ পড়ে পিতার ছবির উপর। তার অনলবর্ষী চোখ দেখিয়া বৈদ্যনাথ কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ভাবে, কিসের এই ইঙ্গিত ?

এমন সময় সদর দরজায় কড়া বাজিয়া উঠিল। কে যেন মৃদু হস্তে কড়া নাড়ে। এখন মেঘনাদের আসার সময় কিন্তু এ ত তার কড়া নাড়ার শব্দ নয়। তার ভঙ্গী অন্যরূপ। সে খুব জোড়ে কড়া নাড়ে, মনে হয় গভীর রাত্রে আসামীর সন্ধানে পুলিস হানা দিয়াছে।

বৈদ্যনাথ নিচে নামিয়া আসিল, দরজা খুলিয়াই দেখিল সামনে কুন্তী। তার সমস্ত দেহের ভিতর যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলিয়া গেল।

তুমি! তুমি এখানে ?

কুন্তী নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল। কোন উত্তর করিল না।

আবার প্রশ্ন, কি চাই তোমার ?

দিদি—আমার বড় জা পাঠিয়েছে—বলিয়া কুন্তী কাঁদিয়া ফেলিল।

সুন্দরী তরুণীর এই করুণ রূপের সঙ্গে বৈদ্যনাথের কোন পরিচয় ছিল না। সে মুগ্ধ নেত্রে তার দিকে চাহিয়া রহিল। সান্ত্বনা দিবার জন্যই বুঝি তার হাত ধরিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল রক্তের নাচন। বলিল, বল কি চাই তোমার ?

দিদি আমায় মেরেছে, তাই—

কুন্তীর ওষ্ঠের ক্ষত আগেই বৈদ্যনাথের চোখে পড়িয়াছিল। সে বলিল, মেরেছে কেন ?

আপনি নাকি আমাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নেবেন ?

বৈদ্যনাথ নীরব।

না, নেবেন না। নীলুকে ভাসিয়ে দেবেন না, আমরা বড় অনাথা।

বৈদ্যনাথ মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবিল। তারপরই—বেশ শুনব তুমি যদি আমার কথা শোন—বলিয়া কুন্তীকে বুকে টানিয়া নিল।

নাঃ নাঃ—কুন্তী জোরে মাথা নাড়ে আর অস্পষ্ট শব্দ করে, না না।

বৈদ্যনাথ কাঁপিতেছিল। সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—একেবারে ভালুকের হাসি। তার চেহারা তখন রূপকথার দৈত্যদানার মতন বীভৎস। ভয়ে কুন্তী চীৎকার করিয়া ওঠে, ওঃ মা।

* * * *

বাড়ি ফিরিয়া কিছুক্ষণ পরে কার্তিক দক্ষিণ দিকের হিজলতলায় কুন্তীর প্রতীক্ষা করিতেছে। এই পথ দিয়াই তাকে ফিরিতে হইবে। কার্তিকের বিশ্বাস সে বিফল হইয়া ফিরিবে না। পাড়াগেঁয়ে জমিদার বাড়ি হইতে সুন্দরী মেয়েরা বিফল হইয়া ফেরে না। তবে, শেষ পর্যন্ত তার কথা কুন্তীর মনে থাকিলে হয়।

হরিচরণ তাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, কি কাতু, দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি ?

কার্তিক কহিল, না দাদা পায়চারি করছি।

জানিস ত জনার্দনের সাদা গাইটা আর বিয়োবে না। আমি তখনি কিনতে মানা করেছিলাম।

কার্তিক কহিল, শুনেছি তোমার ওই গাইটার ওপর নজর ছিল।

আমার নজর হাড়মাস তোলা ওই গাইর ওপর! গাই কি আমি দেখিনি ? গাই বলদ নিয়ে ঘর করছি আজ চাল্লিশ বছর।

এই সময় লোক্যালবোর্ডের রাস্তায় বিনুকে দেখিয়া হরিচরণ চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল—ও মজুন্দার, দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমার ভাইর নাকি অসুখ ? রাজযক্ষে—

একটু পরে দেখা যায় উত্তরের পুকুর পাড় দিয়া কুন্তী আসিতেছে। তার পা যেন আর চলে না, পুকুরের পুবদক্ষিণ কোণে বেত বাঁশের বন আর

ঝোপের আড়ালে ঢালু জমিতে অদৃশ্য হইয়া সে হিজলতলায় আসিয়া উঠিল—একেবারে কার্তিকের সামনে।

কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি বৌঠান?

পরক্ষণেই তার চোখ পড়িল কুন্তীর মুখের উপর।

তার মাথায় ঘোমটা নাই, বাতাসে কিছু কিছু চুল উড়িতেছে, চোখ দুটা দিয়া যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়ে। চিরশান্ত বধূটির এ এক নূতন রূপ, দেখিলে মনে হয় কালনাগিনী। মাথার কেশ যেন এক একটি ফণা।

কার্তিক বুঝিল সবই। নিজের উপর তার ধিক্কার জন্মিল। ছিঃ ছিঃ, এমন মানুষ তার কুন্ত বৌদি, তার উপর কী অবিচারই না সে করিয়াছে!

পাশে শব্দ হইল, পায়ের চাপে শুকনা পাতার মৃদু মর্মর। কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখে তার ডাইনে ভাবিনী দাঁড়াইয়া। তার মুখখানা সদ্য নিভানো গরম আঙারে ভরা উনুনের মত। ভিতর হইতে যেন আঁচ আসে।

সে বলিল, বুঝেছি কাজ কিছু হয়নি। তা তুই এখানে কেন, কেতো? ছোট বৌর জন্যে অপিক্ষে করছিস বুঝি?

না না, এমনিই যাচ্ছিলুম এখান দিয়ে। কাল মঙ্গলবার, চণ্ডীপূজো। তার ফুল—

ভাবিনী বলিল, হিজল ফুল দিয়ে পূজো করবি বুঝি? বেশ বেশ।

সে তারপরই জায়ের দিকে চাহিয়া বলে, সুবিধে কিছুই করতে পারলি নে? অথচ মান খুইয়ে এলি ত।

কুন্তী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মান আমি খোয়াই নি।

তবে? তবে এত দেরি হ'ল যে? ছেলের নামে বেনামায় বন্দোবস্ত হয়েছে বুঝি? নেমকহারাম।

কার্তিক জানিত এবার রাগ যাইয়া পড়িবে তার উপর। সে ভয়ে ভয়ে সরিয়া পড়িল।

নয়

মহিমের কানে যায়, ওঃ বাবা—নারী কণ্ঠের আর্তনাদ। সে বলিয়া উঠিল, কে, কে ?

কেহ জবাব দিল না।

সদর দরজায় কড়া বাজিয়া উঠিল, বৈদ্যনাথ তার ঘরের পাশ দিয়া নিচে নামিয়া গেল। তারপরই এই কাতর শব্দ। ব্যাপার যে কি মহিম বুঝিয়া উঠিতে পারে না। একটু পরে মৃদু গোঙানির শব্দ আসে।

কে, কে—বসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই বৃদ্ধ বিছানায় পড়িয়া যায়, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা বোধ করে। ডান হাত আর নাড়িতে পারে না, ক্রমে ক্রমে ডান পাও অবশ হইয়া আসে।

দুপুরে খাবার দিতে যাইয়া রাঁধুনী নটবর দেখিল, মহিমের বাঁ চোখ বাঁকিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়িতেছে। সে বলিল, কি হয়েছে, বুড়ো বাবু ?

সেই কথার কোন জবাব না দিয়া বৃদ্ধ জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি, কি হয়েছিল ? মেয়ে লোক কাঁদছিল যে ?

নিশির বৌ এসেছিল, হরিচরণের ভাজ—বলিয়াই রাঁধুনী বাহির হইয়া গেল। মহিমের মনে হইল কথাটা সে চাপিয়া যাইতেছে।

রুগ্ন অসমর্থ বৃদ্ধকে কেহ খাওয়াইতে আসে না। খাবারের থালা পড়িয়া থাকে, তার উপর আসিয়া বসে রাজ্যের যত মাছি। নেংটি ইঁদুর কিছুটা খাবার ছড়ায়, ঝোলে থাবা ডুবাইয়া কালো একটা বিড়াল মাছ লইয়া যায়।

মহিমের কিন্তু এসব দিকে খেয়াল নাই। শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও তার কাছে বড় হইয়া ওঠে বৈদ্যনাথের জন্য দুশ্চিন্তা। তার মনে প্রশ্ন জাগে, নিশির বৌ আসিয়াছিল কেন, কেনই বা আর্তনাদ করিল ?

তার ছেলের চিকিৎসার সময় হইতেই বৈদ্যনাথ কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে। মহিম কুন্তীর প্রতি তার দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু

আজকের এই ব্যাপারটা শুধু দুর্বলতা নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু। সেই 'কিছু' বৃদ্ধের মনকে তোলপাড় করিয়া তোলে।

তবে—তবে দিনের বেলায়ও কি মেয়েদের বৈদ্যনাথের কাছে আসা নিরাপদ নয়? তার জেঠামণি এতটা নামিয়া গেল!

সে তার, নিজের হাতে গড়া ছেলে। তার এই অবনতি! বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারে না। জেঠামণির ভবিষ্যৎ তাকে চিন্তাকুল করিয়া তোলে। একবার রাগ হয়, পরক্ষণেই রাগের চেয়ে বেশী হয় দুর্ভাবনা।

মামলা-মকদ্দমার জটিল পথে মেঘনাদ তাকে বহুদূর লইয়া গিয়াছে। ফিরিবার এখন আর উপায় নাই।

সারা জলঙ্গী মালঙ্গী মিয়াপুরের কৃষাণ মজুর তার উপর অসন্তুষ্ট। তারা যেন খেপিয়া গিয়াছে।

সংসার-অনভিজ্ঞ যুবা, চলার পথের সঙ্গে এমনিই পরিচয় নাই। তার উপর চরিত্রও যদি এমনিতর হয় তাহা হইলে তার অবর্তমানে বৈদ্যনাথকে রক্ষা করিবে কে?

মহিমকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া রাঁধুনী একবার বৈদ্যনাথের ঘরের দিকে গিয়াছিল; খুব সম্ভব তাকে বৃদ্ধের খবর দিতে। কিন্তু ঘর পর্যন্ত যাইতে হইল না। দেখিল বৈদ্যনাথ দাওয়ায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

কুন্তী চলিয়া যাওয়ার পর সে কিছুক্ষণ বৃশ্চিকদষ্টের মতন ছটফট করিল। সারা শরীরে সে কী জ্বালা! তার রাগ হয় কুন্তীর উপর, নিজের চেহারার উপর।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে; সমস্ত শরীরে নামে একটা শ্রান্তি, অদ্ভূত অবসাদ। সেই শ্রান্তির বশে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

পরদিন সকালে ঝড়ু আসিয়া খবর দিল বুড়া বাবুর অসুখ।

ওঃ—বলিয়া বৈদ্যনাথ তখনকার মতন তার কথায় ছেদ টানিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরে নিজেই মেঘনাদকে ডাকিয়া বলে, দেখ ত জেঠার কি হয়েছে। একবার পদু ডাক্তারকে খবর দাও।

মহিম নিষেধ করিল।

বৈদ্যনাথ তার সঙ্গে দেখা না করায় সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, যাক্ জেঠামণির এখনও তা হইলে লজ্জা সরম আছে, সঙ্কোচ আছে। ইহা আশার কথা। অন্যায় কিছু করিয়া থাকিলেও সে আবার ফিরিবে। ফিরিবেই ত। সে যে তার হাতে গড়া মানুষ।

বৈকালে সে তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রথমটায় একবার ইচ্ছা হইল বৈদ্যনাথ আসিলে সেই ঘটনা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। গলায় যেন আটকাইয়া গেল। শুধু কহিল, আমি আর কারও ওষুধ খাব না। তুমি ওষুধ দাও, সেরে উঠি ত তাতেই উঠব।

বৈদ্যনাথ হোমিওপ্যাথি শেখার পর হইতে মহিম আর কারও ওষুধ খায় নাই। তার ধারণা রোগের বার আনা উপশম হয় চিকিৎসকের দরদে। অন্য ডাক্তার কবিরাজ বৈদ্যনাথের দরদ পাইবে কোথায়?

বৈদ্যনাথ তার কথার কোন উত্তর দিল না, ঔষধও দিল না।

মহিম ক্ষুণ্ণ হইল। ভাবিল, মানুষের এ কী পরিবর্তন! এই বৈদ্যনাথই একদিন তাকে কত ভালবাসিত। তার মনে পড়িল দীর্ঘকাল পূর্বের এক ঘটনা।

বৈদ্যনাথ তখন স্কুলে পড়ে, জানে নাগপুর কোথায়। মহিম একদিন রাগের ভান করিয়া বলে, তুমি এ রকম করলে আমি নাগপুর চলে যাব, নিজের দেশে।

সেদিন বৈদ্যনাথের কী রাগ। জেঠামণি যে তাদের কেহ নয়, সুদূর নাগপুরের লোক ইহা সে সহ্য করিতে পারে না। অভিমান করে, রাগ করে। তাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া নেয় যে ও-কথা আর কখনও মুখে আনিবে না। আর আজ সে তাকে এক ফোঁটা ঔষধ দিতেও নারাজ!

ক্ষোভে অভিমানে বৃদ্ধ নিজেকে আরও গুটাইয়া নেয়। শুধু বৈদ্যনাথের নিকট হইতে নয়, সরিয়া যায় দুনিয়ার নিকট হইতে।

কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, মন এক একবার হুহু করিয়া ওঠে।

বর্তমানের কোন অবলম্বন নাই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অতীতের স্মৃতির বেশীর ভাগই রায় পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া, বিশেষতঃ বৈদ্যনাথকে। তার শৈশব, কৈশোর, ছাত্র জীবনের প্রতিটি আলেখ্য বৃদ্ধের চোখের উপর জ্বল জ্বল করে।

তাকে সে কী ভালই না বাসে! স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই, ভাই বোন নাই, সন্তান স্নেহ, ভ্রাতৃ স্নেহ কেমন সে জানে না। সেই সব স্নেহের সঙ্গে তুলনাও করে না। শুধু এইটুকু উপলব্ধি করে যে তার সমস্ত সত্তা জুড়িয়া আছে বৈদ্যনাথ।

তার উপেক্ষা মহিমকে খুবই পীড়া দেয়। মনে হয় এতদিন সে শুধু ভুলের পিছনে ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে মরীচিকার পিছু পিছু।

তার শরীর দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়ে। মাথা ঘোরা, ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা, অরুচি, অক্ষুধা জটিল অনেকগুলি লক্ষণই প্রকাশ পায়। কখনও মনে হয় ঝড় আসিতেছে—বৃষ্টি মাথায় করা ঝড় নয়, অগ্নিবর্ষী মহাকালের রুদ্রনৃত্য। মাথায় মেঘের জটা, গলায় বিদ্যুতের ফণা, নটরাজ যেন তার শয্যার চারিধারে নৃত্য করে। এক একবার শিঙা ফোঁকে।

একদিন দেখে পাহাড়ের নিচে ছোট একখানি গ্রাম, ঝরণার জলে স্নিগ্ধশ্রী; নরম ভেলভেটের মতন সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ। পাহাড় না যেন রাজরাণীর মাথার মুকুট, প্রভাতী আলো তার চূড়ায় সোনার টিপ পরাইয়া দেয়, বৈকালী সূর্য তার উপর হোলী খেলে, লাল, বেগুনি নানা রঙ ছড়ায়।

একদল কিশোর সেখানে গরু, ছাগল, ভেড়া চরাইতেছে, ছেলেগুলো মহিমের চেনা চেনা।

এ্যাঁ! তাদের মধ্যে সেও যে একজন। পাশে নাথু না? ওধারে ঝাপসি দাঁড়াইয়া। আর ও কে? খেতু। সব তারই বাল্যসঙ্গী।

সব যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। অসুখের পর হইতে স্মৃতির মুকুরে কয়েকখানি মুখ এক একবার উঁকি মারে—আবার আবছা হইয়া আসে। ঢাকা পড়ে বিস্মৃতির পর্দায়।

আজ মহিম তাদের সঙ্গে নিজ ভাষায় আলাপ শুরু করিয়া দেয়, মধ্য ভারতের পাহাড়ীয়াদের ভাষায়। খিল খিল করিয়া হাসে।

রাঁধুনী নটবর আর চাকর ঝড়ু বহুদিন বৃদ্ধের হাসি শোনে নাই। হাসি শুনিয়া তারা ছুটিয়া আসিল। দেখিল বুড়া বাবু কার সঙ্গে যেন কথা কয়, হাসে; এক একবার উঠিয়া বসিতে চায়।

ঝড়ু ছুটিয়া আসিয়া বৈদ্যনাথকে খবর দিল, বুড়া বাবু পাগল হয়ে গেছে। একলা একলা হাসছে, কথা কইছে।

বৈদ্যনাথ সেই দিনই অক্ষয় কবিরাজকে আনাইল। পদ্ ডাক্তারও আসিলেন। তিনি কবিরাজকে কহিলেন, কেসটা আপনিই করুন।

অক্ষয় এ্যালোপাথদের এই কৌশল ভালই জানে। হালে পানি না পাইলে তারা হোমিওপ্যাথ বা কবিরাজকে কেস ছাড়িয়া দেয়।

অক্ষয় পুরান ঘি একশ বার ধুইয়া তার সঙ্গে শতমূলীর রস মিশাইয়া রোগীর মাথায় প্রলেপ দেন, চেলুনি জল দিয়া দেন মকরধ্বজ। দিন দুইর মধ্যে বিকারের ঘোর কাটে। কিন্তু তিনি বলেন, সামনের অমাবস্যা কাটবে না।

অমাবস্যার আগের দিনই মহিমের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল। অক্ষয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, সন্ধ্যে অবধি টেকে কি না সন্দেহ।

বৈদ্যনাথ সামনেই ছিল। কবিরাজ চলিয়া গেলে মহিম তাকে দক্ষিণ দিকের জানালা খুলিতে ইশারা করিল।

সে জানালা খুলিলে ঘরখানা রোদে রোদে ভরিয়া যায়, রোগীর শয্যাপ্রান্তে রোদ লুটাইয়া পড়ে। তার ঝরণা ধারায় চিক চিক করে সোনার লাখো লাখো পরমাণু। মহিম শিশুর মতন সেই দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়; বোধ হয় চায় ঐ স্বর্ণমুষ্টি লইয়া খেলা করিতে। শিশুর মতনই হাসে।

বাহিরে বিশাল একখানা আয়না, তার এককোণে ছোট্ট একটি রক্তবিন্দু। চারধারের নিবিড় নীল পরিবেশের মধ্যে লাল ঐ ফোঁটাটুকু জ্বল জ্বল করে। বৃদ্ধ এক দৃষ্টে ঐ দিকে তাকাইয়াছিল।

বৈদ্যনাথ বলিল, অনাথের বাড়ির তালগাছের ডগায়ও একটা লাল পাখী বসে আছে।

মহিম কথাটা শুনিতে পাইল কিনা বোঝা গেল না।

বৈদ্যনাথ মধু দিয়া মকরধ্বজ মাড়িয়া আনিল। সাদা পাথরের খলে লাল টকটকে ঔষধ। বৃদ্ধের মুখখানা খুশিতে ভরিয়া উঠিল, যাক্, অন্তিম সময়ে সে জেঠামণির হাতের ঔষধ পাইল।

উভয়েই নীরব। মহিম বাহিরের ঐ রক্তবিন্দুর দিকে তাকাইয়া—ঐ বিন্দুই যেন তার প্রাণশক্তি। তার বুকের খাঁচা ছাড়িয়া ঐখানে যাইয়া উড়িয়া বসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ কি যেন ভাবিতেছিল। তার মুখখানা ধীরে ধীরে কঠোর হইয়া উঠিল, কপালের একটা শিরা ফুলিল, বুকের ভিতর বহিতেছিল প্রচণ্ড ঝড়।

খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, সেই কথাটা, জেঠামণি।

কি কথা?

আমার চেহারা এ রকম হয়েছে কেন?

এঁ্যা—বৃদ্ধ যেন আঁৎকাইয়া ওঠে। জোরে জোবে নিঃশ্বাস নেয়।

বৈদ্যনাথ কহিল, তুমি বলেছিলে মরার আগে কথাটা বলে যাবে।

মহিম নিজের কপালে হাত ছোঁয়ায়। বোধ হয় করাঘাত করিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কাব দেয়।

বৈদ্যনাথ জিদ ধরে। জেঠা মরার আগে রহস্যটা সে জানিয়া নিতে চায়।

লা—লা—লাভ নেই—শুধু দুখ্‌খু—এইটুকু বলিতেই মহিমের বেশ কষ্ট হয়।

বৈদ্যনাথ বলে, দুখ্‌খু পাই পাব। কিন্তু তোমার কথা তুমি খেলাপ ক'র না। জান কথা খেলাপ করলে কি হয়?

মহিম ভয় পাইয়া যায়; ভয় রৌরব নরকের। তার বিশ্বাস মানুষ কথা খেলাপ করিলে ওই শাস্তি অনিবার্য।

প্রায় বিশ বছর আগে। যোগেশের বাড়িতে লাঞ্ছনার পর বৈদ্যনাথ মহিমকে ধরে, বল জেঠামণি, আমার চেহারা এরকম হয়েছে কেন, এত কুচ্ছিত। কি অসুখ করেছিল ?

মহিম প্রথমটা জবাব দেয় নাই। বৈদ্যনাথ অনেক পীড়াপীড়ি করায় শেষটায় বিরক্ত হইয়া বলে, সে শুনো আমার মরার দিন, তার আগে নয়।

জেঠামণি বাঁচিবে না শুনিয়া সেদিন চুপ করিয়া গিয়াছিল। তার পর প্রায় দুই যুগ অতীত হইয়া গেল। মহিম মনে করিত, ব্যাপারটা সে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু মরণ-মুহূর্তে আজ সে আসিয়া যেন গলা টিপিয়া ধরিল, জানা তার চাই-ই।

বৃদ্ধ অসহায়ের মতন এদিক ওদিক তাকায়। তার চোখ পড়ে বাহিরে পাখীটার উপর।

প্রকৃতি কী সুন্দর; কত ভাল, কী অসীম তার করুণা। কোন আবদার নাই, অন্যায় দাবিদাওয়া নাই। আর মানুষের চাহিদা অন্তহীন, ক্ষুধা তার দানবীয়।

বৈদ্যনাথের আর বিলম্ব সহ্য হয় না। মনে হয় বুড়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে। সে তার ডান হাত ধরিয়া ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে বলে, বল, বল।

মহিমের হাতে লাগে, বেদনায় মুখ বিকৃত হয়। কিন্তু বৈদ্যনাথ ভ্রূক্ষেপ করে না। যন্ত্রচালিতের মত খালি আওয়াজ করে, বল, বল।

মহিম তাকে ইশারায় কাছে ডাকে। তার মুখের কাছে কান রাখিতে ইঙ্গিত করে, সে কাছে আসিলে কি যেন বলে। জিভ জড়াইয়া যায়। কথাগুলি সব শোনা যায় না। যেটুকু শোনা যায় তাহাতেই বৈদ্যনাথ শিহরিয়া ওঠে।

নিজের অজ্ঞাতে বৃদ্ধের হাতে সে আরও জোরে চাপ দেয়। মহিমের লাগে খুবই কিন্তু সে এবার আর মুখ বিকৃত করে না। তার মনে হয় বৈদ্যনাথ তার ঋণ পরিশোধ করিতেছে। মানুষের দেনা শোধের হয়ত ইহাই ধরন।

সে আকাশের দিকে তাকায়। লাল পাখীটাকে আর দেখিতে পায় না। চোখ ঝাপসা হইয়া আসে, দ্রুত নিঃশ্বাস বয়।

বৈদ্যনাথ আবার বলে, বল।

মহিম এক নিঃশ্বাসে বলিল, তোমার বাবার জন্য।

অসুখের পর এতটা সুস্পষ্টভাবে সে কোন কিছু উচ্চারণ করে নাই।

শুনিয়াই বৈদ্যনাথ ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। বারান্দায় যাইয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিড় বিড় করে, বাবার জন্যে, বাবার—হ্যাঁ, আজ মনে পড়ে আম্মাও এই ধরনের ইঙ্গিত করিত। সে তখন বুঝিত না।

বৈদ্যনাথ ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে হইতেই তার মায়ের অসুখ ছিল, সর্বাঙ্গে ক্ষত। ভুগিয়া ভুগিয়া কিছুদিন বাতের মতনও হয়। বৈদ্যনাথকে স্তন্য দেয় তাদের প্রতিবেশী লখাইর মা। তাকে সে ডাকিত 'আম্মা' বলিয়া। এই 'আম্মা' বলিত, আমার ডান মাইটা বাবুর ছেলের। বাঁ মাইটা লখাইর।

এইজন্য ননীভূষণ তাকে টাকা দিতে চান। সে বলে, আমি ত ভাড়াটে দাই নই, যে মাই বেচার টাকা নেব?

বৈদ্যনাথ বড় হইয়া উঠিলে সে প্রায়ই বলিত, জন্ম হয়ে অবধি তুমি মায়ের দুধ পেলে না। বড় হয়ে উঠলে আমার মতন ছোট লোকের মাই খেয়ে।

এই কথার মধ্যে কিন্তু গর্ব ফুটিয়া উঠিত। সে আরও বলিত, তুমি জন্মেছিলে যেন রাজপুত্তুর, কী ফরসা রং, সোঁদর চোখ, টানা ভুরু।

ফরসা! সোঁদর চোখ—বৈদ্যনাথ বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁ, কালীবাড়ির ঠাকুরের বড় নাতনিকে দেখেছ? তার মতন দুধে আলতায় গোলা রং, মুখ চোখও সেই রকম।

স্নেহের অতিশয়োক্তিটুকু বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, বৈদ্যনাথের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল পার্থক্য। সে তাই আম্মার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত।

আম্মা বলিত, তোমার মায়ের তখন সব্ব দেহে ঘা, পাঁচড়া।

সে এর বেশী কিছু বলে নাই কিন্তু আজ জেঠামণির কথায় সব পরিষ্কার হইয়া গেল।

হোমিওপ্যাথি চর্চা আরম্ভ করিয়া অবধি তার মনে প্রশ্নটা জাগিয়াছে, তার চেহারা এমন কেন, কার অপরাধে? বাপ মা এইজন্য দায়ী নয় ত?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মন হইতে উহা ঝাড়িয়া ফেলিত।

অতি শৈশবে সে মাতৃহীন হয়, মায়ের কোন স্মৃতিই মনে নাই। লোকমুখে শুনিয়াছে তিনি ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির মানুষ।

মাতৃস্নেহে বঞ্চিত এই বালক পাইয়াছিল প্রচুর পিতৃস্নেহ। পিতার ও জেঠামণির স্নেহেই সে বাড়িয়া ওঠে। পুত্রের প্রতি ফণীভূষণের ভালবাসা ছিল অতি আবেগ প্রবণ।

বৈদ্যনাথের বাল্যে তিনি থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন, নিষ্ঠার সহিত সুতা কাটিতেন, অহিংসা ও হিন্দু-মুসলমান প্রীতি প্রচার করিতেন।

কয়েক বৎসর পরে তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বৈদ্যনাথের বয়স তখন ছয় কি সাত। সেই বছর পুলিস ফণীভূষণকে গ্রেপ্তার করে। মালঙ্গী জলঙ্গী মিয়াপুরের ছেলেরা তাঁর গলায় মালা পরায়। জয়ধ্বনি দেয়।

অদ্ভুত আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পিতার সম্পর্কে বৈদ্যনাথের একটা গর্ববোধও ছিল। আজ তার জেঠামণি উহা ধূলিসাৎ করিয়া দিল। মরণ মুহূর্তে বৃদ্ধ যেন অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করিয়া গেল।

কিন্তু দোষ ত তার নয়, সে যে নিজেই এই অভিশাপ ডাকিয়া আনিয়াছে। বৃদ্ধের টুঁটি টিপিয়া আদায় করিয়াছে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে এই সব ভাবে, মাথার মধ্যে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করে। আরও একদিন এইরূপ হইয়াছিল— কুন্তী যে দিন তার বুকের মধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়ে।

সময় কাটিয়া যায়, বেলা পড়িয়া আসে। পশ্চিম দিকের গাছের ছায়া

উঠানটাকে ছাইয়া দেয়। বৈদ্যনাথের দেহে, মনে অবসাদ নামে—হিমশীতল নূতন এক অনুভূতি। মনে হয় বুকের ভিতরটায় বরফ জমাট বাঁধিয়াছে।

সন্ধ্যা হইল। রাত সাতটা, আটটা, নয়টা বাজিল। সে পড়ার ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলের উপর ডিজের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। পলিতাটা কমানো। জ্যোৎস্নার যে ফালিটুকু ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, এই আলো তার চেয়েও ম্লান।

তার বাবার ছবির নিচে দেয়ালের উপর কতগুলি ছায়া কাঁপে, সঙ্গে শর্ শর্ শব্দ হয়। ছায়াটা মহিমের রোঁয়া পেঁপে গাছের, শব্দ তারই ডালপালার। তার জন্য গাছটা যেন বিলাপ করিতেছে।

বৈদ্যনাথ লণ্ঠনের পলিতা উঁচাইয়া দেয। পলিতার একদিক ছিল উঁচু, সেই দিক হইতে জোরে ধোঁয়া ওঠে। সে দেয়ালের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া নেয়। ছেলেরা গাছ হইতে যে ভাবে ফল ছেঁড়ে, চেয়ারে উঠিয়া সেইরূপ নির্মমভাবে ছবিখানা টানিয়া নামায। দড়ি ছেঁড়ার চড়চড় শব্দ হয়, দড়িতে বাঁধা একটা পেরেক ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে।

আগে ছবিতে ছিল হাসি-হাসি ভাব, জীবিতকালীন ফণীবাবুর মুখের সত্যকার প্রতিচ্ছবি। এই হাসিটুকু তাঁর ঠোঁটে লাগিয়া থাকিত।

শেষের দিকটায় ক্যানভাসের উপরে চাহনি কেমন যেন ক্রূর হইয়া আসিতেছিল। মনে হইত যেন রাগিয়া আছেন। কিন্তু আজ সে চোখে শুধু জমাট-বাঁধা বেদনা।

ছবি নামাইবার আগেই বৈদ্যনাথ টেবিলের ড্রয়ার হইতে একখানা ছুরি বাহির করিয়াছিল। খোলা ছুরির ফলা হাতের তালুতে চাপিয়া ধরিয়া সে এক দৃষ্টে বাপের ছবির দিকে চাহিয়া রহিল।

অসমান পলিতা হইতে উত্থিত ধোঁয়া চিমনিটাকে কালো করিয়া ফেলে। ধীরে ধীরে ফণীভূষণের মুখ অস্পষ্ট হইয়া আসে।

বাহিরটাও অন্ধকার, ক্ষীণ চাঁদ মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। তারার জগতের নিচে, বাগানের গাছগুলির উপর অন্ধকারের এক বিরাট কুণ্ড। যত কিছু মালিন্য, যত নৈরাশ্যের জন্ম বুঝি ঐখানে।

মৃত পিতা ও জীবিত পুত্র মুখামুখি বসিয়া। পুত্র চায় জন্মদাতার সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করিতে। পিতার চাহনি করে ক্ষমা ভিক্ষা। মূক ছবি বলে, ভুলে যা বদি।

ছেলের হাত নিশ পিশ করে, জ্বালা করে। তার হিংস্র চাহনি দেখিলে মনে হয় এখনই ক্যানভাসটাকে বুঝি চিরিয়া টুকরা টুকরা করিবে; চোখে বুকে মুখে—ছুরি বসাইবে ফণীভূষণের সকল দেহে।

এই দুঃখের সাক্ষী মাত্র একজন। মৌন মূক ননীভূষণ। দেয়ালে ক্যানভাসের মধ্য হইতে তিনি জীবনের ভাঙাগড়ার বৈচিত্র্য দেখিতেছেন। হয়ত বা ভাবিতেছেন নিজের দায়িত্বের কথা।

হঠাৎ বৈদ্যনাথের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল আর এক মূর্তি। দেশ-সেবক সৌম্য শান্ত ফণীভূষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সুতা কাটিতেছেন। গলায় শ্বেতশুভ্র উপবীত, পাশে ইসাক, সুরেন, রেবতী, ললিত প্রভৃতি সহকর্মীগণ।

পুলিস একদিন ঐ অবস্থায় ফণীবাবুকে গ্রেপ্তার করিল। ছেলেরা তাঁর গলায় মালা পরাইল, জয়ধ্বনি দিল। তিনি ডান হাত তুলিয়া তাদের উদ্দেশে কহিলেন, বলীয়ান্‌ হও, দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেল। মনে রেখ ঋষির বাণী—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

বৈদ্যনাথ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—একেবারে শিশুর মতন। ছুরিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিল। তার ডান হাত তখন রক্তে ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে উহা টের পায় নাই।

পরদিন ঝড়ু ও কার্তিক দেখে ফণীভূষণের ছবি মেঝেয় পড়িয়া আছে, তা'র নাক মুখ লেপা পোঁছা, নাকে রক্তের দাগ। মনে হয় রক্ত ও জলে ঐরকম হইয়াছে। একটু দূরে রক্তমাখা ছুরি।

নটবর পেল্লাদিঝিকে খবরটা জানাইয়া কহিল, এও বাবুরই কাণ্ড। বাবু শেষটায় পাগল হয়ে গেল।

পেল্লাদি কহিল, হবেইত, নিশির বৌটা যে তুক তাক করেছে।

ছবিখানা তারা কেহই সরাইয়া রাখিল না। এ বাড়ির আজকাল ইহাই নিয়ম। কেহ নিজ গণ্ডীর বাহিরে এক ইঞ্চি নড়িয়া বসিতে চায় না, নড়ার তাগিদও নাই। গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হয়ত ভয় পায়। ফণীভূষণের তৈলচিত্র মেজেয় পড়িয়া থাকে।

* * * *

সকলের অজ্ঞাতে মহিম কখন যে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে কেহ তাহা জানিতে পারিল না। অবশ্য জানার কোনও তাগিদও ছিল না।

পরের দিন সকলের আগে মেঘনাদ দেখিল বৃদ্ধ চোখ বুজিয়া শয্যায় পড়িয়া আছে। মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি। মনে হয় হাসিতেছে।

বৃদ্ধ হয়ত ভাবিতেছিল কৈশোরের লীলাভূমি, ঝরণার জল বিধৌত সেই গ্রামের কথা। হয়ত বা একটু হাসিয়া বৈদ্যনাথকে আশীর্বাদ করিয়া গেল।

তার বিছানার নিচে পাওয়া গেল, নেকডাব তৈরি একটা থলে। তা'তে ছিল বৃদ্ধের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় একান্নটি টাকা। আর একখানা চিরকুট, তা'তে লেখা, এই দিয়ে আমার শ্রাদ্ধ ক'র। একটি পয়সাও যেন বেশী খরচা না হয়।

নিচে তারিখ নাই। কালি দেখিলে মনে হয় অসুখের গোড়ার দিকে লেখা। জেঠামণির উপর অভিমান করিয়া সে উহা লিখিয়া রাখিয়াছিল।

দশ

মহিমের মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথের জীবনের অপূর্ণতা আরও স্পষ্ট, আরও বড় হইয়া ওঠে। নিজেকে একান্তই অসহায় মনে হয়।

মহিম তাকে হামাগুড়ি দিতে শিখাইয়াছে, কাঁদিলে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে। তার হাতেখড়িও মহিমের নিকট। বাল্যকাল হইতে এই মানুষটি ছিল তার সঙ্গী, সুহৃদ। একে অপরকে ডাকিত জেঠামণি বলিয়া। দুই জেঠামণির মধ্যে বয়সের যেন কোন তফাৎ ছিল না।

মহিম নিজের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া শেখে, বৈদ্যনাথকে শিখাইবার জন্য কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস ও অন্নদা মঙ্গল পড়ে। প্রত্যহ তাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শুনায়, দেশবিদেশের খবর বলে।

নাতির শিক্ষার খাতিরে ননীভূষণ এই সম্পর্কে যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। না হইলে মহিমের পক্ষে পড়াশুনাই হয়ত সম্ভব হইত না। তা'ছাড়া তার মনে ছিল একখানা কষ্টিপাথর যাহা দিয়া সে সমস্ত জিনিসের দাম কষিয়া নিত।

সে মনে করিত জাতিভেদ মহাপাতক, ধর্মের নামে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রক্তারক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ অধর্ম। পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার অধিকার, সুশিক্ষার অধিকার ধনীর ছেলের যেমন গরিবের ছেলেরও তেমনি। বৈদ্যনাথের রুচি ও মতামত অনেকটা তার প্রভাবেই গড়িয়া ওঠে।

সেই মানুষটাকে মৃত্যুর পথে আগাইয়া দিল ভাবিলেই তার মন গ্লানি ও বেদনায় ভরিয়া যায়। রাগ হয় নিজের উপর।

জেঠামণি আগেই নিষেধ করিয়াছিল, 'জেনে লাভ কি? মিছিমিছি দুঃখ পাবে।' বৈদ্যনাথ সেই দুঃখই পাইল।

সংসারে একান্তই একা, তার পাথেয় ছিল পিতার প্রতি শ্রদ্ধা আর জেঠামণির স্নেহ। সেই শ্রদ্ধা হারাইল, স্নেহ হারাইল। কর্মজীবন হইতে, সেবা হইতে নিজেকে গুটাইয়া নিয়াছিল। আজ শ্রদ্ধাহীন স্নেহবঞ্চিত এই জীবন নিতান্তই দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল।

সে চায় সব ভুলিতে, নিরালায় থাকিতে; নিজের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া নিতে চায়। কিন্তু সে সুযোগও মিলিল না। মহিমের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই নিলাম জারির জন্য মহকুমা হইতে নাজির আসিল। মেঘনাদ আগে হইতেই দিন তারিখ ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। নাজির আসিল নৌকায়। বৈদ্যনাথের বাড়ির নিচে খালে সে থাকে, মাঝি মাল্লা পাইক-পেয়াদা সমেত লোক তারা পাঁচ ছয়জন। বৈদ্যনাথকে তাদের সমস্ত খরচা যোগাইতে হইবে, খবরদারি করিতে হইবে। নিলামজারির ইহাই প্রচলিত নিয়ম। মেঘনাদ আসিয়া খবরটা জানাইলে বৈদ্যনাথ

বলিল, যা হয় তুমিই কর। খরচপত্তরের ভার তোমার উপর। আমায় কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, আগেই ত বলেছি।

কিছুদিন যাবৎ এইরূপই চলিতেছে। বৈদ্যনাথ কিছু দেখে না। অনেক সময় প্রশ্ন করিলে বিরক্ত হয়। তবুও মধ্যে মধ্যে মেঘনাদ জিজ্ঞাসা করে, তার মতামত নেয়। আজ বলিল, নাজিরের জন্য খরচা কিছু বেশী হবে। লোকটা আবার মদ খায়।

বৈদ্যনাথ বলিল, দরকার হ'লে খরচ করবে।

তহবিলে আর ত টাকা নেই।

সেদিনও লোন আপিস থেকে টাকা তুলেছ।

তা খরচা হয়ে গেছে।

মেঘনাদ খরচা করে অত্যন্ত বেশী। বৈদ্যনাথের সে দিকে খেয়ালই নাই, তবু এতগুলি টাকা খরচা হইয়াছে শুনিয়া বলিল, ওঃ। এই ওর মধ্যে ছিল সংশয়, হয়ত তার সঙ্গে আত্মসমর্পণের ভাব, কর যা তোমার ইচ্ছে।

নাজির আসার সঙ্গে সঙ্গেই মদ চলিতেছে। মেঘনাদ তা'তে নিয়মিত ভাগ বসায়। মদের সঙ্গে চলে পেঁয়াজ, মাংস, ডিম। প্রথম দিন 'ওঁ কালী, হুঁ কালী' বলিয়া সে মদের গেলাসে দুইটা রক্তজবা ছড়াইয়া দিলে নাজির বলিল, ও কী চক্কোত্তি?

মেঘনাদ বলিল, শাস্ত্র মতে শোধন করে নিলুম।

আপনি শুনেছিলাম বৈষ্ণব।

শাক্ত বৈষ্ণব দুইই। ও সম্পর্কে আমার কোন সংকীর্ণতা নেই।

থানার ছোট দারোগোকে পান খাওয়াইয়া পুলিস আনাইতেই দুদিন দেরি হইয়া গেল। ডিক্রি জারি শুরু হইল নাজির আসার চার পাঁচ দিন পরে। প্রথমে নিতাইর বাড়ি। পেয়াদা গোয়াল হইতে তার সাদা গাইটা বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে সে গরুর-গলা জড়াইয়া কাঁদিতে থাকে। কাঁদে আর বলে, তুই চললি ধবলি? শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আর দু'দিন পরে বিওতিস যে।

সেই সময় গরুটার চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল।

ঝড়ুব মুখে খবর শুনিয়া বৈদ্যনাথ তার দিকে একটুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, এঁ্যা, গরুটোও কাঁদছিল ?

পরের দিনও ঝড়ু নাজিরের সঙ্গে গিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে সে বৈদ্যনাথের সামনে চিমনিভাঙা কিন্তু মাজা ঘষা এক হারিকেন রাখিয়া কহিল, কাত্তিক দিয়েছে। সে বললে, হারিকেনটা তোমার বাবুর জন্য। আমার পরিবারের তিকিচ্ছে করেছে, তার পাওনা।

তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বৈদ্যনাথ আকাশের দিকে তাকায়। পেঁজা তুলার মতন পাতলা সাদা মেঘে ঢাকা নীল আকাশ, সাদার পাশের নীলটুকু দিঘির জলের মতন স্বচ্ছ।

ঝড়ু আবার বলিল, আজ হরির ঘরও নিলেমে চড়েছে। তার বৌটো জাকে—

থাক্—বলিয়া বৈদ্যনাথ তার কথার উপর ছেদ টানিয়া দেয়।

ঝড়ু চলিয়া যাওয়ার পর সে ঈশান কোণের জানালায় দাঁড়াইয়া হরিচরণের বাড়ির দিকে চাহিয়া থাকে। তার চোখের সামনে যেন কুন্তীকে দেখিতে পায়। তার বুকের মধ্যে সংজ্ঞাহারা সুন্দরী কুন্তী। কিন্তু সে দিন তার চোখ মুখ দিয়া যেন ঘৃণা ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। জোঁক বা ছুঁচো দেখিলেও মানুষের চোখে অত ঘৃণা ফুটিয়া ওঠে কিনা সন্দেহ। এই চাহনিই বৈদ্যনাথকে আরও হিংস্র করিয়া তোলে।

কুন্তী সেদিন যদি ভয় না পাইত, মূর্ছিত না হইত; যদি বলিত, আমাদের ঘর বাড়ি কেড়ে নেবেন না, গরিবদের আপনি বাঁচান—তাহা হইলে কি যে হইত বলা যায় না। হয়ত স্বচ্ছন্দেই তাকে এড়াইতে পারিত। হয় ত নিলাম জারি হইত না; মালঙ্গী জলঙ্গীর চাষী মজুররা দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইত, বৈদ্যনাথের ভাগ্যলিপিও হইত অন্যরূপ। কিন্তু তাহা যে হইবার নয়।

ঘটনার স্রোত আপন গতিতে গড়াইয়া আসিয়াছে, সেই স্রোতকে

কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে মেঘনাদ; কিন্তু—কিন্তু এই অবস্থার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী সে নিজে।

বৈদ্যনাথ ভাবিয়াছিল কুন্তীকে দেখাইবে কত বড় শক্তিধর সে। প্রেমাস্পদকে শক্তি দেখাইয়া তৃপ্তি পাইবে। কিন্তু সেই তৃপ্তি মিলিল না।

পরদিনকে সে ঝড়ুকে প্রশ্ন করিল, হরিচরণের বাড়িতে কি হয়েছে বলছিলি ?

ঝড়ু পরম উৎসাহে বলে, হরির বৌ জাকে মারে আর বলে ভিটে তোর জন্য নিলেমে চড়ল ভাতার খাকী।

আর বৌটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিল ?

নাজিরবাবু ধমক দিলে তবে হরির বৌ থামল।

বৈদ্যনাথ আর কোন কথা বলিল না। তার মুখের উপর যেন কালো একখানা মেঘ নামিল।

এগার

হরিচরণদের বাড়িতে সাত আট ঘর গৃহস্থ। পেয়াদা প্রত্যেক ঘর হইতে মাল টানিয়া বাহির করে। গৃহস্থ চোখের জল ফেলে, অভিসম্পাত দেয়।

ঘরে ঘরে বিষাদের ছায়া। খুব ছোটরাও বোঝে কি যেন এক অমঙ্গল ঘটিতেছে। তারা গম্ভীর হইয়া থাকে। কিন্তু আশে পাশের বাড়ির ছেলেরা আসিয়াছে মজা দেখিতে। তাদের চোখ দিয়া কৌতুক যেন ঠিকরিয়া পড়ে। হতভাগ্যেরা জানে না যে কাল পরশু তাদের বাড়িতেও এই দৃশ্যেরই অভিনয় হইবে।

পেয়াদা হরিচরণের একটা হাঁসের গলা ধরিয়া তুলিলে সেটা প্যাঁক প্যাঁক করিয়া ওঠে। ঝড়ু ছিল নাজিরের সঙ্গে, সেও প্যাঁক প্যাঁক শুরু করিয়া দেয়।

দাঁড়া পাজি—বলিয়া হরিচরণ লাঠি লইয়া তাড়া করে। ঝড়ু বক দেখাইয়া ছুটিয়া পলায়।

দুপুরের কিছু পরে। নাজির সদলবলে চলিয়া গিয়াছে, দেখিলে মনে হয় বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল। সব তছনছ করিয়া গিয়াছে। বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোন গৃহস্থ এখনও উনান জ্বালে নাই। শিশুরা ক্ষুধায় কষ্ট পায় কিন্তু সাহস করিয়া কাঁদেনা, খাবার চায়না।

ভাবিনী কুন্তীকে সেই যে ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছিল সাহস করিয়া সেও আর ঘরে ঢোকে নাই। ছেলে কোলে করিয়া গাছ তলায় বসিয়া আছে। জেঠাই মায়ের হাতে মায়ের লাঞ্ছনা দেখিয়া নীলু কাঁদিয়াছিল, সেও নীরব।

সময় যায়, দিনের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসে, সন্ধ্যার ছায়া নামে। তারা ওঠে—একটা দুইটা তিনটা। কালো জমীনের উপর জরির বুটির মতন অন্ধকারের বুকে সেগুলি জ্বল জ্বল করে।

কুন্তীর মনে পড়ে এই রকমই এক রাত। কলিকাতায় তখন ব্ল্যাক আউট। তার বাবা ডাষ্টবিনের পাশে মরিয়া আছে। আশে পাশে তাদের গ্রামের আরও অনেকেই ছিল। তারা টেরও পাইলনা উপবাস খিন্ন প্রৌঢ়ের প্রাণ বায়ু কখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যুর পর একে একে সবাই চলিয়া গেল। রহিল শুধু তারা তিন জন। দুইটি জীবন্ত মানুষ, সে ও তার মা আর তাদের মাঝখানে একটা শব।

সেদিনও আকাশ ছিল তারায় ছাওয়া। কুন্তী উর্ধে চাহিয়া ভাবিত বাপের কথা। তাদের গ্রামের জটিল পিসির নিকট সে শুনিয়াছিল, মানুষ মরিলে তারায় চলিয়া যায়। সে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোন তারায় গেল, মা?

তার মা প্রথমে এই প্রশ্নের কোন জবাব করে নাই। শেষটায় বলিল, মায়া কাটিয়ে যেতে পারেনি, আমাদের কাছেই আছে। ঘুট ঘুট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুন্তী ভয় পায়। 'এঁ্যা কাছে আছে?'—বলিয়া মায়ের কোলে ঘেঁষিয়া বসে।

কুন্তীর মনে আজ আবার প্রশ্ন জাগিল, তার বাবা কোন্ তারায় আছে। নীলুর বাবাই বা কোন্‌টায়?

এতদিন কাটিয়া গেল। তারা ছাড়িয়া তারা এবার চন্দ্র সূর্যে চলিয়া গেল নাকি? তার স্বামী ও বাবা একই জায়গায় আছে জানিতে পারিলে সে উভয়ের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

আচ্ছা, তার মা-ই বা কোথায়? সে কি মরিয়া তার বাবার সঙ্গে যাইয়া মিশিয়াছে? বেশ হয় তাহা হইলে। মা মরিয়াছে জানিতে পারিলে কুন্তী কী খুশিই না হয়।

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া সে বুঝিয়াছে আশ্রয় হীনা নারীর পক্ষে অতবড় শহরের জীবন কী অভিশাপ!

হঠাৎ পিছনে একটা গর্জন শুনিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল। 'কি, রে সারা রাত এখানে বসে থাকবি না কি? ঘরে যে ছাইও নেই, খাবি কি?'—ভাবিনীর কণ্ঠস্বর।

কুন্তী কহিল, আমার শরীর ভাল না। আমি কিছু খাবনা।

ভাবিনী বলিল। তুই না খেলি, আমাদের ত খেতে হবে।

আজ কিছু করতে পারব না দিদি, আমায় মাফ কর।

বড় যে চোপা হয়েছে। বেরো বেরো—বলিয়া ভাবিনী কুন্তীকে তাড়া করিয়া যায়।

পাখী যেমন ডানা দিয়া ঢাকিয়া হিংস্র পশুর কবল হইতে শাবককে রক্ষা করে কুন্তী তেমনি করিয়া নীলুকে বুকে আগলাইয়া বলিল, মেরো না, মেরো না, ওর লাগবে।

ভাবিনী হঠাৎ স্বর নরম করিয়া বলিল, ছেলে নিয়ে যাচ্ছিস যে, ওকে খাওয়াবি কি?

কুন্তী কহিল, তুমিই ত বলেছিলে ওর জন্য তোমরা দায়ী নও।

সে আবার কবে বললুম? আমরা দায়ী নই তোর জন্য। ওর কথা ত বলিনি, ও হল কুলের পিদ্দিম—বলিয়া ভাবিনী নীলুর দিকে হাত বাড়ায়।

কুন্তী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নীলুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। জেঠাই মায়ের রুদ্র রূপ দেখিয়া সে মায়ের বুকে মুখ লুকাইল।

কুন্তী বাড়ির দক্ষিণের ঢালু পথ বাহিয়া নামিয়া যায়, একটু পরেই কাশীনাথের ভিটা, সেখানে দুধার হইতে পায়ে হাঁটা পথের উপর গাছ ও আগাছার সারি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পথ না যেন পর্বতের গুহা। ভিতরে কয়লা খাদের অন্ধকার, আকাশের তারা পর্যন্ত দেখা যায় না।

রাত্রে সে একলা কখনও ঘরের বাহির হয় নাই। আজ সে নদীতে ভাসা কলার খোলার মতন অন্ধকারের বুকে ভাসিয়া চলিয়াছে। ভাবিনীর ভীতি পিছন হইতে যেন ধাক্কা মারে, পায়ের তলায় কাঁটা বেঁধে, গা ও কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু শরীরের চেয়ে দুঃখ করে শেষ এই কাপড় খানার জন্যই বেশী।

পিচনে শব্দ হয়, শুকনা পাতার উপর মানুষের পায়ের খশ খশ শব্দ। মনে হয় কে যেন পিছু পিছু আসিতেছে।

কুঁ কুঁ—

এ আবার কোন্ মুখ পোড়া শিস দেয়? কী জ্বালাতন!

মানুষের শিস না পাখীর ডাক? কুন্তী ডাকে, মধুসূদন, মধুসূদন।

হাঃ হাঃ হাঃ!

এ শব্দ মানুষের হাসির নয়, পাখীর ডানার ঝটপটানি, পাখীটা ডানা দিয়া যেন আকাশের বুক চিরিয়া দিয়া গেল।

পাখীর অনুকরণে নীলুও হাসিয়া উঠিল, হাঃ হাঃ হাঃ!

কুন্তী নিশ্চিন্ত হয়। যে কোন মানুষের কণ্ঠস্বরেই হয়ত সে কিছুটা নিশ্চিন্ততা বোধ করিত কিন্তু তার চেয়ে বেশী নিশ্চিন্ত হইল নিজের সন্তানের কণ্ঠস্বরে।

এই সময় জঙ্গলে পথও ফুরাইয়া গেল। উপরে উন্মুক্ত আকাশে তারার ঝিলিমিলি। তারই পুঞ্জিত আলোয় চারপাশ কিছুটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে ডাইনে দে-পালের ডাক্তারখানা, ঘরটায় তালা লাগানো। কুন্তী ডাক্তারখানার দরজায় আসিয়া বসে।

নীলু মায়ের বুকের কাপড় সরাইয়া একসঙ্গে তার স্তন দুইটি মুখে পুরিবার চেষ্টা করে। কুন্তী স্তন তুলিয়া ধরিয়া বলে, বুড়ো ছেলে, এখনও মাই ছাড়বে না। খা, রাক্ষস খা। এ রসও ত শুকিয়ে যাবে।

একটু পরে তার চোখে পড়ে আলোর রেখা। দূরে মঙ্গলের ঘাটে ছইওয়ালা এক খানা নৌকার মধ্য হইতে রেখাটা আসিয়া পড়িয়াছে কুন্তীর পাশের বেঁটে বরুণ গাছের উপর। নৌকার ভিতরে বোধ হয় একটি মানুষ বসিয়া। লোকটি কে, তার পরিচিত কিনা সে সব লক্ষ্য করিয়া দেখিল না।

এতক্ষণ ছিল ভূত প্রেত দৈত্য দানার ভয়। সে তাই মানুষেব কণ্ঠস্বর শুনিতে চাহিয়াছিল। এবার সেই মানুষকেই ভয় করিতে লাগিল—পুরুষ মানুষের সম্পর্কে তরুণীর স্বাভাবিক ভীতি।

সে আবার চলিতে আরম্ভ করে। এই সময় কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে। দুধের মতন মিঠা জোছনায় চারদিক ছাইয়া যায়, জোছনা না যেন চাঁদ হইতে চোয়ান প্রাণশক্তি।

বাঁয়ে যোগেশেব ভিটা, অনেক গাছ সেখানে বট, অশ্বথ, মাদার, বরুণ, বাবলা, কয়েকটা ঝাউ, একটা দেওদার। মাটির উপর সেগুলির কালো কালো ছায়া পড়িয়াছে, একটা ছায়া কলিকাতার এক ভিখারিনীর মতন। মেয়েটা চার হাত পায়ে চলে, তার স্তন দুটা গাভীর ওলানের মতন নড়বড় করে। একটা কুকুরছানা একদিন তার বুকেব নিচে যাইয়া স্তনের বোঁটা চুষিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জিনিসটা কুন্তীর নিজের চোখে দেখা। সে কথা মনে পড়িলে আজও গা ঘিন ঘিন করে।

যোগেশের ভিটার শেষে পথটা দুইভাগে ভাগ হইয়া গেল। ডাইনে একটা, আব একটা সোজা, নাক বরাবর। সে নীলুকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিকে যাব বল্ দেখি ?

নীলু মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কুন্তী ছেলের ডান হাত তুলিয়া ধরিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিকে যাব, বাঁয়ে না সোজা ?

নীলু মুখ তুলিয়া বলিল, হোতা (সোজা)। কিন্তু হাত বাড়াইল ডান দিকে।

তুই ত ভারি বোকা একেবারে বাপের মতন। আচ্ছা চল্ সোজাই চল্—বলিয়া কুন্তী সামনের পথ ধরিয়া চলে। নিজের অজ্ঞাতেই আসিয়া উপস্থিত হয় কেতুর দরজায়। তার অবচেতন মন তাকে হয়ত এই জ্ঞাতি-বৃদ্ধের দরজায় টানিয়া আনিয়াছিল।

কেতু সম্পর্কে তার স্বামীর কাকা, নীলুর দাদু। মানুষটা ভাল, আপদে বিপদে লোকে তার কাছে সাহায্য পায়, আশ্রয় পায়। আর্থিক অবস্থাও অপরকে সহায়তা করার মতন সচ্ছল। তাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে ভাল।

*　　　*　　　*

দরজায় শব্দ শুনিয়া কেতু ডাকিল, কে ?

নারী কণ্ঠের জবাব আসিল। কেতুর কানে উহা গেল না। সে ছেলেকে ডাকিল, দেখ্ত তেজু এত রাত্তিরে কে এল।

বার দুই তিন ডাকার পর তেজুর ঘুম ভাঙ্গিল। সে দরজার খিল খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি ?

অভ্যাসবশতঃ মাথার ঘোমটা টানিয়া কুন্তী কহিল, আমি—আমি। তারপর কহিল, বল্না, নীলু, তুই বল্।

তেজচন্দ্র দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবাও উঠিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, লজ্জা কি মা ? আমি বুড়ো মানুষ। কে তুমি, কোত্থেকে আসছ ?

কুন্তী ঘরের ভিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, কার্তিক ঠাকুরপোদের বাড়ির দক্ষিণের ঘরের—

ও, তুমি নিশির বৌ, তা এত রাত্তিরে কেন, মা ?

কুন্তী নীরব।

শুনেছি হরির বৌ তোমার উপর অত্যাচার করে।

কেতু বিপত্নীক, সংসারের কর্ত্রী তেজচন্দ্রের স্ত্রী সুশীলা। সে মেয়ে

কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। কুন্তীকে দেখিয়া শিশুটি তার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

সুশীলা বলিল, আমার দীপু সোঁদর মানুষ দেখলেই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।—বলিয়াই সে কুন্তীর দিকে তাকায়, হয়ত দেখিয়া লয় কে বেশী সুন্দর, সে নিজে না কুন্তী।

সুন্দরী উভয়েই। দু'জনের চেহারা দু'রকমের। কুন্তীর গড়ন লম্বা ছিপছিপে, সুগঠিত দেহ। ধুলায় ঢাকা আয়নার মতন তার চিক্কণ শ্যাম দেহে কেমন যেন মালিন্যের ছাপ পড়িয়াছে।

সুশীলাও সুন্দরী। ছোটখাটো মেয়েটি, ফরসা রং, চোখ দুইটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল তবে ঠোঁট একটু পুরু। চাষীর ঘরে এরকম রূপ দুর্লভ। আশে পাশের পাঁচটা গ্রাম হইতে বাছিয়া কেতু তাকে ঘরে আনিয়াছে।

তাকে দেখিয়া কুন্তী মনে ভরসা পায়। তার লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত চেহারার ইহাই বিশেষত্ব। যে দেখে সেই মনে করে মেয়েটি যেন তার কত আপনার। মিষ্টি হাসি দিয়া, করুণ চাহনি দিয়া মুহূর্তে পরকে সে আপন করিয়া ফেলে।

কেতুর মনে পড়ে নিশির কথা। খাসা ছেলে নিশি, তাদের গাঁয়ের সেরা ছেলেদের একজন। বিদেশ হইতে সে অজ্ঞাতকুলশীল একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনায় কেতু প্রথমে তার উপর রাগ করিয়াছিল। কিন্তু ক্ষমাও করিল সে-ই প্রথম। উপেন তাদের একঘরে করিতে পারে নাই শুধু কেতুর জন্য।

নিশির সমবয়সী ছিল তার প্রথম ছেলে চারু, তেজচন্দ্রের চেয়ে দুই বছরের বড়। সে ও নিশি এক সঙ্গে খেলিত, ঝগড়া করিত, মারামারি করিত। আবার একজন ভাল একটু খাবার পাইলে অপরের কাছে যাইয়া বলিত, এই নে রসবড়াটা ভাল হয়েছে। আমার মায়ের তৈরি।

দু'জনে একসঙ্গে বাড়িয়া উঠিল, নিশি কলিকাতায় যাইয়া চায়ের দোকান করিল। চারু শিখিল তাঁতের কাজ। তাঁতী হিসাবে নাম কিনিল। গান্ধী আন্দোলনে যোগ দিয়া একবার জেলও খাটিল।

কোথায় আজ চারু ? নিশিই বা কোথায় ? দিঘির জলে বুদ্বুদের মতন মানুষ এইভাবেই কালের বুকে মিলাইয়া যায়। সেও একদিন যাইবে, ডাক আসিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ সেই ডাক শুনিতে পায়। বিশেষতঃ ঘাড়ে বেদনা হওয়ার পর হইতে এই কয়দিন যাবৎ কেমন যেন ভয় পাইয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া কুন্তী দেখে সুশীলা পিছনের বাগান ঝাঁট দিতেছে। উঠান আগেই ঝাঁট দিয়াছে। এখানে ওখানে জড় করিয়াছে শুকনা পাতার স্তূপ। তার দুটা চারটা আবার বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

দেরিতে ওঠার জন্য কুন্তীর লজ্জা করে। সেও একটা ঝাঁটা তুলিয়া লয়।

সুশীলা বলিল, তোমায় কাজ করতে হবে না। দু'দিনের জন্য এসেছ।

কুন্তী কহিল, দু'দিন নয়। এসেছি থাকতে।

তুমি কাজ করছ দেখলে বাবা রাগ করবে যে।

না, তা করবেন না। আর তা ছাড়া আমি চুপ করে থাকতে পারি না।

সুশীল হাসিয়া বলিল, এরই নাম জোয়াল, আমরা মেয়েরা কী জোয়ালেই না বাঁধা পড়ি।

দু'জনে ঝাঁট দিল অনেকক্ষণ। তারপর কতকগুলি শুকনা পাতা বড় একটু চুবড়িতে ভরিয়া রাখিল জ্বালানি করার জন্য। কতগুলি পাতা ফেলিল একটা গর্তের ভিতর। শুকনা পাতা, তরকারির খোসা, গোবর গোমূত্র পচাইয়া সেখানে জমির সার তৈরি করা হয়।

দু'দিনেই উভয়ের মধ্যে বেশ ভাব হইল -যেন দুটি বোন। ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে সুশীলা বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

কুন্তী নারিকেলের বাকলো দিয়া ধান নাড়িতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা ?

সুশীলা ইতস্ততঃ করে।

কুন্তী কহিল, গাঁয়ের এই গোলমালটা আমার জন্ত কি না এইত জানতে চাও?

হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি।

তোমার মত আরও কত লোক আমায় জিজ্ঞেস করেছে। আর কাউকে বলি নি। তবে তোমায় বলি শোন। রায় বাড়ির বদ্যিবাবু নীলুর তিকিচ্ছে করেছিল। বদনাম সেই থেকে। কেন যে হ'ল তা আমি জানি না।

সুশীলা কহিল, কারণ আবার কি? দুব্বোঘাস ব্যাঙেব ছাতা আর মেয়েদের বদনাম এসব হাওয়ায় গজায়।

সুশীলার কথায় একটু ভরসা পাইয়া কুন্তী কহিল, বাবুর চোখে আগুন দেখেছিলুম ভাই, কিন্তু আমার কোন দোষ নেই। তুমি বিশ্বেস কর।

সে আমি জানি।

কুন্তী কহিল, ছেলের অসুখের ভিতরই বাবুর আসা বন্ধ হল। তিনি যে কেন রাগ করল তা জানি না।

তার মনে পড়িল নীলুর অসুখের সময়েব দিনগুলি। তার দিকে চাহিয়া বৈদ্যনাথের চোখ দুটা যেন জলিতে থাকিত। সে উহাতে বিব্রত বোধ করিত বটে কিন্তু তার জন্য গ্রামের জমিদারের এই কাঙালপনা দেখিয়া নারী সুলভ তৃপ্তি যে পাইত না একপও নয়।

এই সময় দেখা গেল উত্তরের ঢালু জমি বাহিয়া একটি লোক আসিতেছে। তার মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি। তাকে প্রথমে দেখে কুন্তী। তার মনে হয় ভাসুর তাদের নিতে আসিয়াছে। ছোট ভাইয়ের বৌ ছেলে অপরের বাড়িতে থাকিলে নিন্দা ত তারই।

ভাসুর লোক ভাল, তাদের ভালবাসে। স্ত্রীকে বলিয়া কহিয়া তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিতে রাজী কবাইয়া আসিয়াছে। বড় জা তাকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না, কিন্তু সেও নীলুকে ভালবাসে। কুন্তী ছেলেকে বলিল, তোর জেঠু আসছে রে।

দেতু দেতু—বলিয়া নীলু এদিক ওদিক তাকায়। জেঠাকে খোঁজে।

সোজাসুজি না আসিয়া হরিচরণ কেতুর মৃত শরিক সদাশিবের বাগানে ঢোকে। বাগানটা কেতুর হিস্যার পুবে। সেখান হইতেও ঢেঁকি ঘর দেখা যায়।

হরিচরণ লজ্জায় মাথার গামছা বাঁ কান ও চোখের উপর নামাইয়া দিয়াছিল। ডান চোখ ছিল পথের উপর। কিন্তু তারই মধ্যে সে এক একবার চোখ বাঁকাইয়া নীলুদের দেখার চেষ্টা করে। তার হাব ভাব দেখিয়া সুশীলা হাসিয়া ফেলিল। কুন্তী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ঢেঁকির পাড় পড়িল তার হাতের উপর।

সুশীলা শশব্যস্তে ঢেঁকি হইতে নামিয়া নেকড়া ভিজাইয়া তার হাতে জড়াইয়া দেয়। বেশ ব্যথা পাইলেও কুন্তী কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ করে না। উঃ আঃ করে না! নীলু তার দিকে চাহিয়া মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বসিয়াছিল; তাকে বলিল, ও কিছু নয়রে।

সুশীলা কুন্তীকে ঘরে লইয়া যায়। সে সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুম ভাঙিলেই প্রথমে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করে, ভাসুর ঠাকুর চলে গেছে?

পাশে ছিল কেতুর বিধবা মেয়ে কামিনী, সে কহিল, হরিদা'র কথা শুধোচ্ছ? ও একটা আস্ত সং।

সুশীলা বলিল, কেন দিদি, ও কথা বলছ কেন?

কামিনী কহিল, বাবা হরিদাকে জিজ্ঞেস করল, নিশির বৌকে তাড়িয়ে দিয়েছ কেন?

তাড়িয়ে!—হরিদা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বাবা বললে, তুমি কি বলতে চাও ঐ একরত্তি বৌটা নিশুতি রাতে এমনি এমনি চলে এসেছে? হরিদা মাথা চুলকোতে চুলকোতে জবাব দিলে, নিশুতি রাতে চলা ওর অভ্যেস। ও স্বপ্নে হেঁটে বেড়ায়।

বাবা ধমক দিলে, বাজে কথা ব'ল না। হরিদা বললে, বাজে নয় কাকা। আমাদের বাড়ির দুই বউই ঘুমের মধ্যে ঘুট ঘুট করে ঘোরে, যেন দুটো পেঁচা।

শুনে বাবা হাসি চেপে রাখতে পারে না। বলে, বেশ ত দুজনে এক সঙ্গেই ঘুরুক না। বড় বৌকে বুঝিয়ে ব'ল।

হরিদা আমতা আমতা ক'রে বললে, সে বড় শক্ত ঠাঁই, ঐ উঁচু মোড়লের ঝাড়। ও বংশের মেয়েরা ভৈরবের ঘাটে ডুবে যমুনায় গিয়ে সাঁতরে ওঠে। শুনে বাবার মুখ কালো হয়ে গেল।

কেতু পাশ দিয়া যাইতেছিল, সে বলিল, কি রে কামিনী, বাপের নিন্দে করছিস বুঝি?

তার প্রশ্নের উত্তর করিল সুশীলা। সে কহিল, হ্যাঁ দিদি বলছিল মোড়ল বংশের নিন্দে তুমি সহ্য করতে পার না।

কেতু কৃত্রিম কোপের ভান করিয়া কহিল, পারিইত না।

তার স্ত্রীও ছিল উঁচু মোড়লের বংশের মেয়ে, দূর সম্পর্কে ভাবিনীর বোন। বৃদ্ধের মনে পড়ে তার কথা। সে ভুগিল মাত্র চার পাঁচ দিন। কিন্তু কী যন্ত্রণাই না পাইল। অমন যাতনা, অমন রোগ কেতু আর দেখে নাই। মাথায় আর ঘাড়ে অসহ্য বেদনা। 'জ্বলে গেল, ভিতরটা জ্বলে গেল' বলিয়া রোগিণী আর্তনাদ করিত।

ডাক্তার বৈদ্য রোগ ধরিতে পারিল না, কেহ বলে, মাথার জন্য ঘাড়ে ব্যথা। কেহ বলে, ঘাড়ের জন্য মাথার। তাদের বিতর্কের মধ্যে রোগিণী মারা গেল আর্তনাদ করিতে করিতে। শেষ মুহূর্তে স্বামীর পা বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এ বুক তুমি বড় ভালবাসতে। আশীর্বাদ কর আবার যেন—

কথা আর শেষ হইল না।

কেতুর ঘাড়ে কয়দিন যাবৎ ব্যথা চলিতেছে; স্ত্রীর কথা মনে পড়ায় বৃদ্ধের মন খারাপ হইয়া গেল, বোধ করি ঘাড়ের বেদনাও একটু বাড়িল। সে কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার হাতের ব্যথা কমেছে?

বেদনার উপশম না হইলেও পাছে বৃদ্ধ তার জন্য ভাবে তাই কুন্তী কহিল, হ্যাঁ একটু ভাল।

কেতু কহিল, হরিকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তাকে দিয়ে কোন

সুবিধা হবে না। আমার বেদনাটা সেরে গেলে আমি নিজে গিয়ে তোমায় রেখে আসব।

বৃদ্ধ তারপব আপনা আপনিই বলিতে লাগিল, জমি জমা ঘর বাড়ির অর্ধেক নিশির, অর্ধেক হরিচরণের। সে তোমায় তাড়াতে পারে না, কিছুতেই না।

বার

মেঘনাদ চায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে। ছোট লোকদের দেখাইয়া দিতে চায় যে বামুনের মাথা কামাইয়া তার মুখে চুন কালি মাখাইবার কি ফল।

তিন দিনেই অনেককে সে জব্দ করিয়াছে। আজ চলিল কেতুর বাড়ি। কেতু একজন মাতব্বর, প্রজাদের প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি। তাকে জব্দ কবিলে আর সকলের মাথা এমনিই হেঁট হইবে।

নাজির পাইক পেয়াদা, সঙ্গে তার লোকজন অনেক। কিন্তু বৈদ্যনাথের বরকন্দাজ লকাই না আসায় মেঘনাদ মনে মনে গজর গজর করিতেছিল, বেটারা তিন পুরুষ রায়েদের চাকর আর আজ কাজের সময় কিনা বিদ্রোহ করল। আচ্ছা।

কেতুব বাড়িতে আসিয়া সে দেখিল এক অভিনব দৃশ্য। চার পাঁচ জনের ছোট ছোট কতগুলি জনতা এখানে ওখানে জটলা করিতেছে। কোন দল গাছতলায়, কারাও বা ঢেঁকিশালে। গোয়ালঘর, পিছনের বাগান, বেগুন লঙ্কার খেত—ভিড় সর্বত্র।

সকলেই তার পরিচিত। সে নাম জানে প্রায় প্রত্যেকের, অনেকের বাপের নাম জানে, হাঁড়ির খবর রাখে। কিন্তু আজ তারা তাকে দেখিয়াও দেখে না, যেন চেনেই না। পরিচিত লোক দেখিলে মানুষের চোখে যে স্বীকৃতি ফুটিয়া ওঠে তাদের চাহনিতে সেটুকুও নাই।

মেঘনাদ নাজিরের কানে কানে বলিল, ব্যাপারটা ত সুবিধের মনে

চলেছ না। যাক্ এদের এই জোট ভাঙতে হবে। তারপরই ডাকিল, কেতু, অ কেতু।

কেতুর ছেলে তেজচন্দ্র উঠানেই ছিল। সে বলিল, বাবার শরীল খারাপ। কি বলবেন আমায় বলুন।

মেঘনাদ বলিল, সে দিন তাকে দেখলুম চৌধুরীর হাটে নতুন কপি কিনছে। এর মধ্যে শরীরের কি হল? তাকে বল মাল ক্রোক করতে এসেছে।

হরিচরণ পুবদিকের বাগানে কাত হইয়া পড়া পেয়ারা গাছের ডালের উপর হইতে বলিয়া উঠিল, লোহার কলকব্জা পলকে বিগড়ে যায়, আর এ ত রক্ত-মাংসের শরীল, দু'দিনে বিগড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মেঘনাদ বলিল, খুব ত কথা শিখেছিস্ হরিচরণ, কি করছিস ওখানে বসে?

হরিচরণ পেয়ারা গাছের ডালপালার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল, ডাঁশা পেয়ারা চিবুচ্ছি।

তেজচন্দ্র নাজিরকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কাছে পাওনা কত কোট বাবু?

নাজির কহিল, বাহান্ন টাকা চৌদ্দ আনা।

তেজচন্দ্র বলিল, বলেন কি বাবু মশায়? দেখুন আপনার ভুল হয়েছে।

নাজির বলিল, না ভুল হয় নি। মায় খরচা ঐ টাকারই ডিক্রি হয়েছে।

ছ'টাকা পাওনার জায়গায় বাহান্ন টাকার ডিকিরি, এ যে দিনে ডাকাতি।

মেঘনাদ বলিল, এ হ'ল কোর্টের ডিক্রি। তোরা বেটারা আপিল করলেই পারতিস।

তেজচন্দ্রের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তাদের জ্ঞাতি অভিরাম বলিল, বেটা বেটা ক'র না চক্কোত্তির পো।

চাষী মজুরদের সঙ্গে জমিদার ও মহাজনের, তাদের নায়েব গোমস্তার

কথার ধরনই এই। এ যেন তাদের ' স্বগত অধিকার। অভিরামের কথার উত্তরে মেঘনাদ গরম হইয়া বলিল, আপনাদের সঙ্গে কি তবে আজ্ঞে মশাই বলে কথা বলতে হবে?

পিছন হইতে কার্তিক বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, আমরাও মানুষ। বেভার চাই মানুষের মতন।

কার্তিকের মতন শান্ত প্রকৃতি মানুষের মুখে ইহা শুনিয়া মেঘনাদ ত অবাক্। সে বলিল, এ সব আবার শিখলি কার কাছে?

কার্তিক বলিল, আপনারাই শিখিয়েছ।

অত্যেচার করে করে তোমরা আমাদের চোখ ফুটিয়েছ,—বলিল অভিরাম।

বাদানুবাদ শুনিয়া কেতু বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তার গায়ে হাত কাটা পাঞ্জাবি। গলায় একটুকরা গরম কাপড় জড়ানো। ঘাড়ের বেদনা আরও বাড়িয়াছে, ১০১ এর উপর জ্বর, চোখ ঘোলাটে। সে মেঘনাদের উদ্দেশে যুক্ত কর তুলিয়া বলিল, গড় করি ঠাকুর মশায়। আমার কাছে বাহান্ন টাকা পাওনা হ'ল কি করে?

মেঘনাদ বলিল, খাতাপত্তরে ঐ রকমই ছিল। খতেন দৃষ্টে নালিশ হয়েছে।

কার্তিক বলিল, মিথ্যে খতেন, তুমিই তৈরি করেছ।

মেঘনাদ বলিল, মুখ সামলে কথা বলিস কার্তিক।

কার্তিক বলিল, ভয় দেখিও না ঠাকুর। আমি আর কাউকে ডরাই না। অমন পাগলী চলে গেল। আপনি ঘরের হাঁড়িকুড়ি কাঁথা নেতা টেনে বার করলে। আমি ত এখন নাঙ্গা ফকির।

মেঘনাদ বলিল, আমায় তোরা মিছিমিছি দোষ দিচ্ছিস,খাতাপত্র তৈরি করে রেখে গেছে নাগপুরী বুড়ো। নালিশ-ফরেদও হয়েছে তার সময়।

মহিম বাঁচিয়া থাকিতে মামলা হইয়াছিল বটে কিন্তু সে তখন শয্যাশায়ী। মামলা রুজু হয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মেঘনাদের প্ররোচনায়। সে-ই মিথ্যা হিসাব তৈরি করে। চাষীরা সব খবরই রাখিত।

গ্রামের মুসলমান চাষীদের মাতব্বর মোজাদ্দেক উপস্থিত ছিল। সে বলিল, অন্যায় করার মানুষ তিনি ছিলেন না, চক্কোত্তি মশাই।

অভিরাম কহিল, আমাদের সামনে মহিম জেঠাকে অচ্ছেদ্দা করা চলবে না।

নাজির বলিল, বাজে কথার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি টাকার ব্যবস্থা কর, কেতু।

কেতু ছিল একটা জলচৌকির উপর বসিয়া, জোরে কথা বলিবার মত শক্তি তার ছিল না। তেজু বলিল, বাবা বলছে বাহান্ন টাকা আমরা দেব না। দেব ছ'টাকা, যা ন্যায্য পাওনা।

শ্রীপুরের গোপাল মিয়া বলিল, ছ'টাকায় বাহান্ন, এ যে গলায় ছুরি মারার চেয়েও বেশী।

বংশী বোষ্টম নায়েবের হাত-ধরা লোক। সে বলিল—ছিরি বিষ্ণু, ছিরি বিষ্ণু। হিংসের কথা কইছ আপনারা? আমাদের চক্কোত্তি মশায় ত সে রকম মানুষ নন।

তাকে সমর্থন করে তার চেলা খুদে বংশী। সে বলে, তার উপর নির্ভেজাল বোষ্টমের বংশ।

বিরিঞ্চিবাঙ্গা বলিল, তিন টাকার পাওনার জায়গায় আমার নামে নিলেম করিয়েছে পঁচিশ টাকার।

আমার সাত টাকায় তেইশ।

এগার টাকার জায়গায় আমার নামে একচল্লিশ।

অনেকেই এই ধরনের অভিযোগ করে।

জনার্দন বলিল, আমার বেলায় আরও তাজ্জব। পাওনা নেই তবুও মামলা হয়েছিল, শেষটায় তুলে নিয়েছে।

মেঘনাদ বলিল, তুমি এখানে কেন বুড়ো?

এসেছি দশ জনের জন্য—দশ জনকে বাদ দিয়ে ত চলতে পারি না।

নাজির মোজাদ্দেককে বলিল, আপনারা ছানি বা আপিল করলেই পারতেন।

মোজাদ্দেক বলিল, একটা কাছারি করতেই অনেকের ঘটি বাটি বাঁধা পড়েছে। আপিল আবার করব কি ক'রে?

মেঘনাদ তাকে একান্তে ডাকিয়া কি যেন বলে। তার কথায় মোজাদ্দেকের সে কী রাগ! সে বলিল, দুষমনি কর না চক্কোত্তি। আমার নামে মামলা হয় নি বটে কিন্তু চাষীরা সবাই আমরা ভাই বেরাদার। সে হিঁদুই হোক আর মোছলমানই হোক।

অভিরাম বলিল, সাবাস চাচা সাহেব। এখানেও হিঁদু মোছলমান ফারাক করতে চায় বুঝি?

মোজাদ্দেক বলিল, হ্যাঁ আমায় বোঝাচ্ছিল যাদের নামে ডিক্রি হয়েছে তাদের বেশীর ভাগই হিঁদু। আমরা মোছলমানরা যেন এর মধ্যে না যাই। পরে আমাদের সুবিধে করে দেবে।

জনার্দন বলিল, এরই নাম ইঞ্জিরি কল।

মোজাদ্দেক বলিল, ওদের শেষ হাতিয়ার।

মেঘনাদ কেতুর দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি কি ঠিক করেছ বল দেখি।

তেজু বলিল, বাবার শরীর খারাপ, ওনার কথা ত আমিই বলেছি। ন্যায্য পাওনার বেশী আমরা দেব না।

উপেন বলিল, আমাদের সবারই ঐ এক কথা। অন্যায় দাবি আমরা মানব না।

মানব না, অন্যায় মানব না। চারিদিক হইতে ধ্বনি ওঠে।

কার্তিকের জেঠা রাধাবল্লভ বলিল, আপনি কমিয়ে শমিয়ে ঠিক ঠিক পাওনাটা নিয়ে যান নাজির বাবু—

নাজির বলিল, কোর্টের হুকুম বদলাবার ক্ষ্যামতা আমার নেই। সে পারে উপরের কোর্ট। তোমরা আপিল কর।

বিরিঞ্চিবাঙ্গা বলিল, টাকা কোথায়?

মোজাদ্দেক বলিল, কাছারিতে গরিবরা জিতলেও শেষ অবধি তাদের হার হয়।

নাজির বলিল, কাছারি ছাড়া আর ইচ্ছে করলে ছাড়তে পারেন পাওনাদার।

বিরিঞ্চিবাপ্পা বলিল, তিনি ছিলেন সোনার মানুষ। এখন যে মাথার ঠিক নেই। তিনি ভাল থাকলে আমাদের কি এ দশা হয়?

জনার্দন বলিল, যেমন ছিল মালিক তেমনি বুড়ো গোমস্তা।

অভিরাম বলিল, আমাদের জেঠা ছিল দেবতুল্য পুরুষ।

গোপাল মিয়া বলিল, মালঙ্গী গাঁয়ের সবার জেঠামণি।

বংশী বোষ্টম বলিল, মেয়ে মানষের পিরিতে পড়ে মালিকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

খুদে বংশী সুর ধরিল, নারীর পিরিতি······

সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে হাসির লহর।

মেঘনাদ বলে, আর দেরি করবেন না নাজির বাবু। আপনার ডিউটি আপনি করে যান।

নাজির কোন উত্তর করেন না।

অভিরাম বলিল, চক্কোত্তি, তুমিও ত আমাদের মতন রায় বাবুর একজন রায়ত। আমাদের দুখখু তুমি বুঝলে না?

কার্তিক বলিল, নায়েব হয়েছেন, এখন আর আগের কথা মনে নেই।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিল, উনি হ'ল বিভীষণ।

মেঘনাদ ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া এদিক ওদিক তাকায়, অপরাধীকে খোঁজে, নাজিরকে বলে, পেয়াদাকে হুকুম করুন, ঘরের মাল টেনে বার করুক।

নাজির পেয়াদা ইয়াসিনের দিকে তাকায়। ইয়াসিন তাকায় কনষ্টেবল দু'জনের দিকে। গোলমালের আশঙ্কায় মেঘনাদ তাদের থানা হইতে আনাইয়াছিল।

তাদের একজন খৈনি টেপে আর একজন মাথার পাগড়ি খুলিয়া আবার বাঁধে। ইয়াসিনের মনে কিন্তু তারা সাহস বা উৎসাহ কিছুরই সঞ্চার করে না।

মেঘনাদ ডাকে, পেয়াদা সাহেব।

ইয়াসিন দাড়ি চুমরায়।

তেজচন্দ্র চীৎকার করিয়া ওঠে, কোন মোছলমান আমাদের ঘরে ঢুকবে না।

মেঘনাদ বলিল, আপনি ভুল করেছেন নাজির বাবু। হিঁদু পেয়াদা আনলেই হত। মোছলমান ঘরে ঢুকলে আমাদের জল নষ্ট হয় যে।

মোজাদ্দেক বলিলেন, হিঁদু পেয়াদা আনলে আমরা ঘরে ঢুকতে দিতুম না।

উপেন বলিল, আপনাদের ত এসব ছিল না বড় মিয়া।

মোজাদ্দেক উত্তর করিল, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না করে আপনারাই ঢুকিয়েছ।

যাক্ নিজেকেই সব করতে হবে,—বলিয়া মেঘনাদ কেতুর ঘরের দিকে আগাইয়া যায়। অমনিই একসঙ্গে কতকগুলি যুবক আসিয়া ঘরের সামনে সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়। মানুষের সারি না যেন ইস্পাতের দেয়াল; ইস্পাতের কাঠিন্য তাদের চোখে মুখে।

আজ কিছু বাধা পাইবে এরূপ আশঙ্কা মেঘনাদও করিয়াছিল। কিন্তু এতটা ভাবে নাই। সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে দু'দিনে গরিব চাষীরা এতটা সঙ্ঘবদ্ধ হইল কেমন করিয়া।

পিছাইয়া যাওয়াও তখন অসম্ভব। ওরা টিটকারি দিবে, প্রজার ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। শাসন আর চলিবে না। তাই সে আগাইয়া যাইয়া কার্তিকের হাত ধরিল। পাশেই ছিল বিরিঞ্চি, তাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা সরে যা।

বিরিঞ্চি দুর্বল মানুষ, একটু ধাক্কাতেই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই অভিরাম গর্জন করিয়া উঠিল, খবরদার।

মেঘনাদ চোখ রাঙাইয়া বলিল, কে, কে শাসাচ্ছে?

আমি অভিরাম ঢাল।

মেঘনাদ বলিল, এত বড় আস্পর্ধা।

অভিরাম বলিল, তুমিই বা কোন্ সাহসে গেরস্তর ঘরে ঢুকছ?

আমায় বাধা দিবি তুই ?

তুই তুই ক'রনা ঠাকুর !

অভিরামকে সে ভালই জানিত। একদিন "বেটা শুদ্দুর" বলায় সে স্কুলের এক মাষ্টারের হাতে ছোরা মারিয়াছিল। মেঘনাদ তাই স্বর নরম করিয়া বলিল, তা তা তোমরাই বা লোকের পাওনা দেবে না কেন ?

একজন বলিল, ন্যায্য পাওনা আমরা নিশ্চয় দেব। কিন্তু অন্যায়—

অন্যায় মানব না, মানব না—সমস্বরে ধ্বনি ওঠে।

মেঘনাদ একটি কনষ্টেবলের দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল, চলুন সিপাইজি। হামার সঙ্গে—

জয় সীতারাম, বলিয়া সিপাহী হাতের তেলোর উপর গোটা দুই চাপড় দিয়া সামনে তাল গাছের ডগার দিকে তাকায় আর খইনি টেপে। মেঘনাদও আর সাহস করিয়া অগ্রসর হয় না।

চাষীদের মধ্যে একজন নিজের হাতের চেটোয় চাটি মারিয়া বলিল, বল রাধা কেষ্ট।

সিপাহী রাগত স্বরে বলে, উ নাম মত্ বোলো।

চাষীরা আরও জোরে বলে, জয় রাধা কেষ্ট, জয়।

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল, জয়, জয় নায়েবের।

জনতা কথাটা লুফিয়া নেয়। শুরু হয়, জয়—নায়েবের জয়।

কেতুর বাড়ির মেয়েরা তখনও জানালা দিয়া উঁকি মারিতেছিল। সুশীলার কোলে ছিল নীলু। সেও শুরু করিয়া দিল, 'দয়', 'দয়'। দয় দয় করে আর হাততালি দেয়।

মেঘনাদ চীৎকার করিয়া উঠিল, শালা ভিখারীর ব্যাটা—

অভিরাম গর্জন করিয়া উঠিল, খবরদার—

তেজচন্দ্র বলিল, খবরদার—

নাজির বলে, চলুন নায়েব মশায় আজ আর সুবিধে হবে না।

মেঘনাদ বলিল, কিন্তু এর পর যে আর এদিকে ঘেঁষাই যাবে না।

তখন বরং বেশী লোক নিয়ে আসবেন।

বেশী লোক আর পাব কোথায়? দেশের চাষা ভূষো সব এক কাট্টা হয়েছে।

নাজির বলিলেন, তা বটে, সব জায়গায়ই দেখি ঐ এক ছবি।

এ হচ্ছে বিলকুল শয়তানি। বিদেশ থেকে আমদানি করা।

কিন্তু দিন দিন দেশ ঐ দিকেই যাচ্ছে। এ আর আটকাবেন কি করে?

মেঘনাদ একটা কুৎসিত শব্দ করিয়া বলিল, বেটাদের একদিন এমন শিক্ষা দেব।

চাষীদের অনেকেই কথাটা শুনিয়াছিল। তারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মেঘনাদ দেখিল এখানে থাকা আর সুবিধাজনক নয়। সে এক পা দুই পা করিয়া পিছাইতে থাকে। তার পিছনে চলে নাজির। তারা ঢালু জমি বাহিয়া নামিতে আরম্ভ করিলে পেয়াদা এবং কনষ্টেবলরাও নামিয়া যায়। জনতা জয়ধ্বনি করিয়া ওঠে, বল হরি, হরি বোল।

কেতুর বাড়ির নিচে মাঠে নামিয়া মেঘনাদ বলিল, কী পাপ বলুন দেখি। বামুন গেল, ক্ষেত্রী গেল, এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যত বেটা শুদ্দুর।

নাজির বলিলেন, আপনার ওসব নষ্টামি রাখুন দেখি।

মেঘনাদ মনে মনে বলিল, এ শালাও তবে শুদ্দুরই হবে।

সে ও নাজির সদলবলে চলিয়া গেলে চাষীরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল জমিদারকে যাইয়া ধরিবে। হাতে পায়ে ধরিয়া তাকে ন্যায্য পাওনা নিতে রাজী করাইবে। ঐ দলের মুখপাত্র হইবে উপেন, মোজাম্মেক, জনার্দন প্রভৃতি বয়স্কগণ।

হরিচরণের ইচ্ছা সেও প্রতিনিধি হয়। তাই বলিল, উপেনদা'র চেয়ে দু'এক বছরের ছোটই হব কিন্তু নাম সই করতে পারি।

উপেন নাম সই করিতে পারে না। তার মুখ লাল হইয়া যায়। রাগ চাপিয়া সে বলে, তা তুমিই যাও হরিচরণ। তুমি হ'লে নেকাপড়া জানা মানুষ।

হরিচরণ একটু হাসিয়া কহিল, তুমি যে সম্পর্কে বড়। ইন্তিরির বড় ভাই। কেতুদারও উপরওয়ালা।

শেষ পর্যন্ত স্থির হয় হরিচরণও তাদের সঙ্গে যাইবে।

উপেনরা রওনা হইল। কৌতুহলী জনতাও তাদের পিছু পিছু চলিল।

পথ চলিতে চলিতে উপেন প্রস্তাব করিল, সুরেনকে সঙ্গে নিলে হ'ত না? বাবুর সঙ্গে সে পড়ত, বাবু তাকে ছেদ্দা করে।

হরিচরণ কহিল, সে রাজী হবে না। আগের বারও হয়নি।

তারা বৈদ্যনাথের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল বেলা প্রায় এগারটায়।

রোদে রোদে উঠান ভরিয়া গিয়াছে। উপরে নিবিড় নীল আকাশ। সবুজ গাছপাতার উপর ঝক্ ঝক্ করে সোনালী আলো।

বাড়িটা নিঝুম নিস্তব্ধ, একটা ছাড়া আর সব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। উঠানের উত্তর দিকের চালতা গাছের পাশে আম গাছের তলায় সোমালি ঘুমাইতেছে।

উপেন জোর গলায় ডাকিল, বড় মুনিব, আমরা মালঙ্গীর রায়তরা এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গেই সোমালি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল; বেশী চেঁচাইতে লাগিল হরিচরণের দিকে চাহিয়া।

উপেন বলিল, কুকুরটার সঙ্গে তোমার যে খুব ভাব দেখছি হরিভাই।

হরিচরণ বলিল, কুকুর ত নিমকহারাম হবেই। ব্যাটা হ'ল আমাদের তিলির বাচ্চা। ছ' মাসের সময় পেল্লাদের ছেলে ঝড়ু নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর ঝড়ু দোতলার একটা জানালা খুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলে, তোমরা বাবুকে ডাকছ?

মোজাদ্দেক বলিল, হ্যাঁ, তিনি কোথায়?

ঝাড়ু বলিল, দেশান্তরি হয়ে গেছে।

দেশান্তরি! কোথায় গেছেন?—উপেন জিজ্ঞাসা করিল।

ঝড়ু জানিত না কিছুই কিন্তু নিজের দাম চড়াইবার জন্য বলিল, জানি কিন্তু কাউকে বলতে মানা আছে।

বাড়িতে আর কেউ নেই ?

না।

নায়েব ঠাকুর আসে নি ?—প্রশ্ন করে উপেন। ঝড়ু মাথা নাড়াইয়া জানায়, না।

হরিচরণ বলিল, ওঃ তুই একলা আছিস বুঝি ?

তোমরা মিছিমিছি ঝামেলা ক'র না—বলিয়া ঝড়ু জোরে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিরামের ছোট ভাই কেনারামের নিক্ষিপ্ত বড় একটা ঢিল যাইয়া পড়ে বন্ধ জানালার উপর।

মুহূর্তের জন্য জানালাটা আবার খুলিয়া গেল। ছোট্ট একটা ঢিল আসিয়া পড়িল হরিচরণের পাগড়ির উপর। ঝড়ু কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া ছোঁড়ে নাই, ঢিল ছুঁড়িয়াই বসিয়া পড়িয়াছিল।

দেখাচ্ছি মজা হারামজাদাকে— বলিয়া কেনারাম ও হরিচরণ দরজার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। তাদের নিবৃত্ত করিল মোজাদ্দেক ও সোমালি।

জনতা ফিরিয়া চলে। তারা কিছুটা দূরে গেলে জানালার খড়খড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া ঝড়ু চেঁচাইতে থাকে, দুয়ো, দুয়ো।

তের

কেতুর বাড়ির ঘটনার পরদিন নাজির মহকুমায় চলিয়া গেলেন। মেঘনাদ তাকে বলিয়া দিল, আমিও দু চার দিনের মধ্যেই যাব দোয়ারি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। দেখি, বেটাদের কি করে জব্দ করা যায়।

নাজির বলিলেন সে খুব সোজা হবে না। দ্বারিকবাবু বড় উকিল হতে পারেন কিন্তু এই চীনা দেয়াল তিনি কি ভাঙ্গতে পারবেন ?

মেঘনাদ কহিল, ও দেয়ালে আমি ঠিক ফাটল ধরাবো।

কেতুর বাড়ির অভিজ্ঞতায় চাষীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে কারও সাধ্য নাই তাদের উপর অত্যাচার করে। অমন যে সাদাসিধে মেয়ে কুন্তী সহজ বুদ্ধিতে সেও এই সত্যটা উপলব্ধি করিয়াছিল। একদিন সে কার্তিককে বলিল, নায়েব পাইক পেয়াদা নিয়ে

যখন আমাদের বাড়ি গিছল তখন তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না, ঠাকুরপো ?

কার্তিক আসিয়াছিল কেতুর বাড়ির দরজার বেড়া বাঁধিতে। বেতের ফালি চিরিতে চিরিতে সে কহিল, আমরা যে তখন এক কাট্টা হতে পারি নি, বৌঠান।

কুন্তী কহিল, সে আমার বরাত।

শুধু তোমার নয়, অদেষ্ট আমাদের সবার। আমার কথাই ধর, আমার ঘরের ঘটি বাটি টেনে বার করেছে, এমন কি পাগলীর শেষ কাঁথা-খানা পর্যন্ত। তার নিজ হাতে সেলাই করা কাঁথা।

স্ত্রীর এই কাঁথাখানার জন্য কুন্তীর কাছে কার্তিক আগেও একবার আক্ষেপ করিয়াছে। সে আবার বলিল, তুমি তবু একটা আশ্রয় পেয়েছ—বটের ছায়া। কেতুকা' বট গাছেরই সামিল।

কুন্তী কহিল, তা ঠিক। শুধু তাঁর নয়, ভালবাসা পেয়েছি এ বাড়ির সবার।

এই বাড়িতে আসিয়া সে সকলেরই ভালবাসা পাইয়াছে। সব চেয়ে বেশী পাইয়াছে সুশীলার।

সেদিন কেতুর উঠানে খুদে বংশী যখন গান ধরে, 'নারীর পিরিতি' কুন্তী তখন সুশীলার পাশে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। একটি বউ তার দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া কহিল, কাতলা মাছ নিয়ে খেলাতে গিছলি, ভালই করেছিলি তবে বরাতে টিকল না।

কুন্তী শিহরিয়া ওঠে। এ যেন তার জায়ের কথারই প্রতিধ্বনি।

সুরেন পালুইর মেয়ে নিমি বলে, শুধু কি নিজের ? আগুন দিয়েছে ও সবার কপালে।

কুন্তী ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। সুশীলা তার পিছু পিছু আসে। পরম স্নেহে তার মুখের দিকে তাকায়। দরদে ভরা এই স্নেহটুকুতে কুন্তী যেন গলিয়া যায়। ভাবে, মানুষগুলা সব সুশীলার মতন হয় না ?

জায়ের প্রতি কেতুদের সদয় ব্যবহারের কথা ভাবিনীর কানেও গেল।

সে বলিল, সোঁদর মুখ দেখে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। পুরুষগুলোর ধরনই ওই—ওরা কাঙালের জাত।

এ দিকে কেতুর অসুখ দিনের পর দিনই বাড়িতে থাকে। মনে হয় মাথার পিছনের দিকটা যেন পচিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম খাবার গিলিতে কষ্ট হইত, তার পর শুরু হইল শ্বাসকষ্ট। দম আটকাইয়া আসে, সারাক্ষণ বাতাস চায়। শীতের মধ্যেও খালি হাওয়া আর হাওয়া।

রোগীর বেশী সেবা করে কুন্তী। বাতাস করে, সেঁক দেয়, মাথা টিপিয়া দেয়। প্রায়ই রাত জাগে। শ্বশুরের সেবা করার ইচ্ছা সুশীলারও খুব কিন্তু সে সময় পায় না। সংসারের সমস্ত ভার তার উপর।

বাপের অসুখ করার সঙ্গে সঙ্গে কামিনী ধুয়া তুলিল, নিশির বৌকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে বাবা মরতে বসেছে, অলক্ষুণে রাড়ি-ধুড়ির ছোঁয়া না যেন আগুনের আঁচ।

সে নিজে যে বিধবা কামিনী বোধ করি সে কথা তখন ভুলিয়া যায়। একদিন সে কেতুর সামনে কথাটা তুলিলে মেয়েকে সে ইশারায় নিষেধ করিল। সুশীলাও সামনে ছিল। সে বলিল, মায়ের অসুখের সময় কুন্ত দি ত ছিল না।

মা অর্থাৎ তার শাশুড়ী।

কামিনী বলিল, ও এই গাঁয়ে এল সেই বছর।

সুশীলা বলিল, এ কি বলছ দিদি? জ্ঞাত বাড়িতে বৌ আসার সঙ্গে এ বাড়ির ভাল-মন্দর সম্পর্ক কি?

কামিনী উত্তর করিল, আছে রে আছে। যারা শাস্তর করেছে তারা জানে।

বেলা দুইটা পর্যন্ত রোগীর সেবা করিয়া কুন্তী একটু আগে উঠিয়া গিয়াছে। খাইতেছে পাশের ঘরে বসিয়া। কথাগুলি পাছে তার কানে যায় এই ভয়ে সুশীলা ননদের কথার আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

সেইদিন বৈকালে কেতুর যন্ত্রণা আরও বাড়িল। সমস্ত মুখ যেন নীল হইয়া গেল, নিঃশ্বাস নেওয়ার কষ্টে কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল। সে

যাতনা আর দেখা যায় না। সুশীলার কান্না পায়। সে কুন্তীকে বলে, বাবা অমন পুণ্যিবান মানুষ, ওঁর অত কষ্ট কেন?

কুন্তী উত্তর করিল, কষ্ট পুণ্যিবানদেরই বেশী হয়। আমার বাপ খুব ভাল মানুষ ছিল, কখনও মিছে কথা বলে নি। সে ম'ল রাস্তার ধারে না খেতে পেয়ে।

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল, বাপের মরার কথা পাঁচজনের কাছে ও রকম করে ব'ল না। ওতে মানুষের অচ্ছেদ্দা হয়।

সন্ধ্যার কিছু আগে কেতু সংজ্ঞা হারাইল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিল পরের দিন ঠিক সেই সময়। সংজ্ঞা ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই সে এদিক ওদিক তাকায়। সুশীলার কোলে নীলুকে দেখিয়া তাকে কাছে আনিতে ইশারা করে। সুশীলা কাছে আসিলে নীলুর মাথায় হাত রাখিয়া কি যেন বলিতে চায়।

তেজচন্দ্রও সেখানে ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি, কি বাবা?

বৃদ্ধ তাদের সম্পর্কে কিছু বলিবে মনে করিয়া কুন্তীও উৎসুক হইয়া উঠিল। হয়ত সে তাদের আশ্রয়দানের নির্দেশ দিবে, হয়ত বা আরও কিছু।

কেতুর ঠোঁট নড়িল, দুটা শব্দও বাহির হইল কিন্তু বোঝা গেল না কি বলিতেছে। সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্বশুরকে বাতাস করিতে করিতে সুশীলা বলিল, যাক্ বাবা একটু ঘুমোচ্ছে।

কুন্তী বলিল, ঘুমোনো ভাল। ওরকম ওষুধ আর নেই—বদ্যিবাবু বলেছে।—বলিয়াই কেমন যেন লজ্জা বোধ করে।

তাদের এই বাতাস করার সময়ই কেতুর প্রাণবায়ু কখন যে বাহির হইয়া গিয়াছে কেহই টের পাইল না।

কেতুর মৃত্যুর খবর পাইয়া সমস্ত মালঙ্গী জলঙ্গীর লোক আসিয়া তার বাড়িতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। মনে হয় প্রত্যেকেই যেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হারাইয়াছে। সবাই গুণকীর্তন করে। উপেন বলে, অমন মানুষ এ তল্লাটে কেউ ছিল না।

হরিচরণ বলে, কেতু কা ছিল চুড়োমণির বংশের চড়কগাছ।

মোক্তাদ্দেক বলিল, তিনি মাথায় ছিলেন তাই আমরা সব এককাট্টা হতে পেরেছি। এ বাড়িতে মাল ক্রোক না এলে অত লোক এক সঙ্গে জড় হত না।

সত্যই সেদিনকার জয়টা কেতুর জয়। চাষীরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল তাহাকে কেন্দ্র করিয়া।

আকাশফাটা হরিধ্বনির মধ্যে শব উঠানে আনা হইল। শবের পিছু পিছু উলঙ্গ নীলুও আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। সে ধীরে ধীরে ডাকিতে লাগিল, দাদু, দাদু।

দীপু আরও ছোট। সে মনে করে এ এক অদ্ভুত মজা। সেও ডাকে, তাতু। ডাকে আর খিল খিল করিয়া হাসে। কচি কচি হাত দু'খানি দিয়া দাদুর খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি ধরিতে যায়।

উঠানে তিলধারণের জায়গা নাই। সবাইর মুখে এক কথা—কেতুর সুখ্যাতি।

উঠানের এক প্রান্তে ছিল কুন্তী দাঁড়াইয়া। তার মুখের উপর যেন কালো একটা পর্দা নামিয়াছে—গভীর চিন্তার ছায়া। সে হয়ত ভাবিতেছিল, ভাগ্যের কী পরিহাস! এই আশ্রয়ও তার টিকিল না, তার দুর্ভাগ্যের ফলেই কেতু খুড়ার মৃত্যু হইল।

হয়ত বা কোন কিছু ভাবারই তার শক্তি ছিল না। নিজের ঘর-বাড়ি সর্বস্ব পুড়িয়া গেলে মানুষ যেরূপ অসহায় কাতর দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া থাকে তার চাহনিতে সেই কাতরতা। আর ছিল একটা আত্মীয়তাবোধ। ঢিলা চামড়ার তলায় ঢাকা বুড়া ঐ হাড় ক'খানি তার কতই না প্রিয়। কতই না তার আপনার। অনেক দিন নীলু ছাড়া আর কাহাকেও এতটা আপনার বলিয়া মনে হয় নাই।

সে মনে মনে প্রার্থনা করিল, তারায় গিয়ে উনি সুখে থাকুক।

চৌদ্দ

কিছুদিন যাবৎ বৈদ্যনাথ মানুষের দুঃখ কষ্ট ও তার অভিশাপকে উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু তাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল মূক একটা প্রাণীর কাতরতা। নাজিরের পেয়াদা নিতাইয়ের গোয়াল হইতে তার গরুটিকে টানিয়া বাহির করিলে সেটি মনিবের দিকে চাহিয়া একবার কি দু'বার হাম্বা হাম্বা করে। তার পরই চোখের জল ছাড়িয়া দেয়।

খবরটা ঝড়ুর কাছে শোনা। বৈদ্যনাথ গরুটাকে দেখিয়াছে—ধবধবে সাদা গাই, সাদার উপর চকেলেট রংয়ের কয়েকটা ছাপ। দেখিতে খাসা।

সারাটা দিন বৈদ্যনাথের চোখের উপর ভাসে গরুটার কান্নার সেই ছবি। তারপরই আসে কুন্তীর খবর। তার জা তাকে মারিয়া বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। এই খবর বৈদ্যনাথের বুকখানাকে যেন ভাঙিয়া চুরিয়া দেয়। কিন্তু মুখে সে কোন কাতরতা প্রকাশ করে না।

কুন্তীর জন্যই এই মামলা ; এত সব আয়োজন তাকে জব্দ করার জন্য। তার কাছে সে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে চহিয়াছিল। সেই অস্ত্র তার নিজের বুকেই দশগুণ জোরে আঘাত করিল।

মালঙ্গীতে জীবন অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। এখানকার আলো বাতাস পর্যন্ত ভালো লাগে না, সবুজ গাছপালার দিকে চাহিলেও চোখ জ্বালা করে। সে ঠিক করে দেশ ছাড়িয়া যাইবে। মালঙ্গীর মায়া ভুলিবে, ভুলিবে কুন্তীকে।

একদিন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল শেষরাত্রে। কাহাকেও কিছু বলিল না। রাঁধুনী নটবর, ঝড়ু, তার মা পেল্লাদি কেহই কিছু টের পাইল না।

শীতের রাত। গায়ে শাল জড়ানো। হাতে ছোট একটা স্যুটকেশ আর সামান্য বিছানা। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা, খালের উপরের সাঁকো পার হইয়া সে খাল ধার দিয়া চলিতে থাকে। আসিয়া পড়ে নদীর পারে। চলে নদীতীরের হাঁটা পথ দিয়া।

চার পাশে কুয়াসা। নদীর বুক হইতে উত্থিত বিশাল বাষ্পরাশি

ধরিত্রীকে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে। বৈদ্যনাথকে এই পর্দা ঠেলিয়া চলিতে হয়। দু'হাত দূরের কিছুই দেখা যায় না। পথ হারাইয়া যায়, আবার পথ নির্ণয় করে নদী দেখিয়া।

কুয়াসা কাটিল বেশ একটু বেলায়। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে দেখা দিল আলোর নাচন, ধানের শিসে শিসে রবি রশ্মির হাসি।

জেলেরা নৌকায় করিয়া মাছ ধরে। কৃষক মাঠে দাঁড়াইয়া ধান কাটে, নদীর ঢেউয়ের মতন কল কল করিয়া হাসে।

এক জোড়া পাখী বৈদ্যনাথের মাথার উপর দিয়া মালঙ্গীর দিকে উড়িয়া গেল। সে পিছু ফিরিয়া তাকাইল। তার চোখ দুটা মালঙ্গীকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সে চোখে মালঙ্গীর কোন কিছুই ধরা পড়িল না, না কোন উঁচু বাড়ি, না গাছপালা।

এক জায়গায় ধান কাটিতে কাটিতে চার পাঁচটি যুবক মেঠো সুরে গান গাহিতেছিল। ভারি মিষ্টি গান—চার পাশের সবুজ ঘাসপাতারই মতন তরুণ প্রাণের সবুজ উচ্ছ্বাস। গান শুনিতে শুনিতে বৈদ্যনাথ তন্ময় হইয়া যায়। রাস্তা হইতে নামিয়া তাদের কাছে যাইয়া দাঁড়ায়।

একটি তরুণ প্রশ্ন করিল, কি বাবু?

তোমাদের জমিতে কি ধান হয়েছে?

একজন উত্তর করিল, লক্ষ্মীবিলাস। আর ঐ জমিতে পরশমণি।

বৈদ্যনাথ বলিল, খাসা নাম ত পরশমণি, লক্ষ্মীবিলাস।

এর মধ্যে আরও কয়েকটি যুবক তাদের পাশে আসিয়া জড়ো হইয়াছিল তাদের একজন বলিল, আপনি মালঙ্গীর ছোট বাবু না? রেল বাবুর নাতি?

বৈদ্যনাথ মাথা নাড়াইয়া জানাইল, হ্যাঁ।

এত সকালে যে? যাচ্ছ কোথায়?

এই—বৈদ্যনাথ ইতস্ততঃ করে।

আপনি শুনলাম নালিশ ফরেদ করে রায়তদের জমিছাড়া, ভিটেছাড়া করেছ।

সঙ্গে সঙ্গেই কলগুঞ্জন ওঠে, জমিছাড়া! ভিটেছাড়া!

বৈগুনাথ কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করে। সরল এই মানুষগুলোর কাছে নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়।

একজন চাষী বলিল, ছিঃ বাবু। যাদের খেয়ে বেঁচে আছ তাদের ভিটে ছাড়া জমিছাড়া করলে। ইস্তিরি-পুত্তুরের খোরাক কেড়ে নিলে।

বৈগুনাথ এক পা দু'পা করিয়া সরিয়া পড়িল। তার কানে গেল, একজন বলিতেছে—পাগলা না কি?

আর একজন কহিল, কী কুচ্ছিত রে বাপ।

আর একজন কহিল, বংশটাই শুনেছি ওই রকম। কত লোকের ভিটে ঘাটা কেড়ে নিয়েছে ওর ঠাকুরদা।

দ্রুত হাঁটিয়া বৈগুনাথ আবার নদীপারের উঁচু রাস্তায় আসিয়া উঠিল। সে দেখিল কৃষক সমাজের এক নূতন রূপ, নব-চেতনা যার পরিচয় গ্রামে থাকিলেও আজ পাইত, নিজের প্রজাদের নিকট।

* * * *

বৈকালের দিকে সে একটা গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রেল ষ্টেশনে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

পূর্ণিমা রাত, প্লাটফরম আলোয় আলোয় ছাইয়া গিয়াছে। গাছপালা লতাপাতা সবই দুধ রংয়ের ওড়নায় মোড়া। ওড়নার উপর মাঝে মাঝে গাছের কালো ছায়া—স্থির শান্ত পরিবেশ। মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত দ্বন্দ্ব কোলাহল এখানে আসিয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছে।

ছোট ষ্টেশন, নাম পরশমুনি, হয়ত স্পর্শমণিরই গ্রাম্য সংস্করণ। প্লাটফরম ষ্টেশন ঘরের দিকে, বিপরীত দিকটা ফাঁকা। বৈগুনাথ প্লাটফরমে পায়চারি করে, আর এক একবার দূরে সিগন্যালের দিকে তাকায়।

প্লাটফরমে আরও দুটি যাত্রী। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় আর ঘোমটা ঢাকা তরুণী এক বধূ। বোধহয় স্বামী-স্ত্রী। প্রৌঢ়টি শ্যামবর্ণ, মাথায় মস্ত টাক, উঁচু কপালের নিচে গর্তে বসানো ছোট এক জোড়া চোখ।

বধূটির মুখ দেখা যায় না। গায়ের রং কালো, ছিপছিপে কচি কচি

হাত দেখিলে মনে হয় বয়স পনর ষোলর বেশী হইবে না। জনবিরল এই জায়গায় হারাইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকিলেও স্বামী তাকে গাঁটছড়া দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়াছে।

কাছেই পাটকেল রংয়ের একটি কুকুর সামনের দিকে পা বাড়াইয়া নিজের থাবা চাটে। মধ্যে মধ্যে আবার জোছনার ভিতর ছায়া দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া চেঁচায়।

টিকিট ঘরে বসিয়া বৃদ্ধ স্টেশন মাষ্টার রোমাঞ্চকর একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছিলেন। তিনি বইর নায়ক ডিটেকটিভ মণ্টু মাষ্টারের বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই চীৎকার করিয়া ওঠেন, সাবধান সাবধান। আবার দুষ্কৃতিকারী বিনয় গুপ্তের শাস্তিতে উল্লসিত হন। বলেন, ঠিক হয়েছে, যেমন কর্ম, তেমনি ফল। বলেন, আর টিকিট পাঞ্চ করার যন্ত্রে জোরে একটা চাপ দেন। খটাং করিয়া শব্দ হয়।

আগের ষ্টেশন হইতে তার আসিল গাড়ী ছাড়িয়াছে। মাষ্টারবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, ভূতো ঘণ্টি, ফিফটি এইট্ ডাউন।

সিগন্যালের পাখা পড়িল। ভূতো ঘণ্টি দিল, ঠুন্ ঠুন ঠুন।

ট্রেন আসিল প্লাটফরম কাঁপাইয়া। ডাউন ট্রেন প্লাটফরমের বিপরীত দিকে থামে। ঘণ্টা পড়িলেই বৈদ্যনাথ ও তার সহযাত্রী দুইজন সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর আসিয়াছিল সেই কুকুরটা।

গাড়ীর শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে নৃত্য শুরু করিয়া দেয়, ট্রেন থামিলে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ঘেউ ঘেউ করে।

এই পথের নিয়মিত যাত্রীদের কেহ কেহ গাড়ীর ভিতর হইতে খাবার ছুঁড়িয়া দেয়। রুটির টুকরা, মুড়ি, চাল। কুকুরটা সবই সোল্লাসে গিলিয়া ফেলে। ফলের খোসা দেশলাইর কাঠি এমন কি পোড়া বিড়ির টুকরাও বাদ দেয় না। খায় আর লেজ নাড়িয়া কৃতজ্ঞতা জানায়।

বধূটি এর আগে কখনও রেলগাড়ী দেখে নাই। সে হাঁ করিয়া তাকাইয়াছিল। গাড়ীতে মাল তুলিয়া দিয়া প্রৌঢ় বলিল, এবার ওঠ, লক্ষ্মীটি।

লক্ষীটি পা'দানিতে একটা পা রাখিলে প্রৌঢ় পিছন হইতে তার কোমর ধরিয়া ঠেলিতে লাগল। তরুণী বলিল, ছাড়ো না ছাই।

রাগ করলে, তুমি রাগ করলে নাকি—বলিয়া প্রৌঢ় যতই সাম্নুনয়ে তাকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করে—উভয়ের কাপড় চোপড়ে জড়াইয়া ততই অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বৈদ্যনাথ তাদের সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িলে লক্ষ্য করিল, লোকটি তাকে ঐ কামরায় দেখিয়া অখুশি হইয়াছে। মানব মনের বৈচিত্র্যই বুঝি এমন। গাড়ীতে আরও পাঁচটা যাত্রী আছে—যত লজ্জা বৈদ্যনাথকে। অপরিচিত মানুষ, প্লাটফরমে মাত্র ঘণ্টাখানেকের দেখা। কিন্তু তাকে যে নিজেদের ষ্টেশনে দেখিয়াছে। বৈদ্যনাথ তার গ্রামের লোক নয়, কোথার লোক তাও জানে না, হয়ত কাছাকাছিরই হইবে। শুধু এই জন্যই তাকে লজ্জা এবং লজ্জার ফলে বিরক্তি।

ট্রেন ছাড়িলে একটি যুবা গান ধরিল, আমি বনফুল গো।

একজন গাড়ীর কাঠের উপর তাল ঠোকে, আর একজন দেয় শিস। রীতিমত কনসার্ট। প্রৌঢ়ের মনে হয় এই গান-বাজনা ও উল্লাস তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া। যুবক শিস্ দিতে দিতে বুঝি তার স্ত্রীর দিকে আড়চোখে তাকায়। গায়ক বঁধুয়া বলিয়া তাকেই যেন সম্বোধন করে।

লোকটি রাগে ফাটিয়া পড়ে। ক্ষমতা থাকিলে সে হয়ত তাদের জেলে পুরিত। ধরিয়া চাবকাইত। তার হাবভাব দেখিয়া বধূটি বেশ কৌতুক অনুভব করিতেছিল। তার ডাগর চোখের মধ্য দিয়া সেই কৌতুক যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

বৈদ্যনাথ দেখে সবই কিন্তু কিছুই যেন লক্ষ্য করে না। তার মন তাদের দেশের নদী পারে পড়িয়া, সেই চাষী-মজুরদের মাঝখানে। সে যেন তাদের কণ্ঠ শুনিতে পায়—যাদের খেয়ে বেঁচে আছ তাদের ভিটেছাড়া, জমিছাড়া করলে। খোরাক কেড়ে নিলে।

বাহিরে দুধে ধোয়া ধবধবে সাদা আকাশ। মাটির বুকে জোছনা

গড়াগড়ি যায়। মনে হয় গৌরী এক তরুণী আঁচল বিছাইয়া ধরণীর বুকে বরতনু এলাইয়া দিয়াছে।

বধূটি ঐ দিকে চাহিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে ঐ রূপের মধ্যে ডুবিয়া গেল—খাঁচার পাখী মুক্তি পাইয়া যেমন মিশিয়া যাইতে চায় নিঃসীম আকাশের বুকে। বৈদ্যনাথের মনে পড়িল, আর একখানা মুখ, আর একজোড়া সুন্দর চোখ। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস্ ছাড়িল।

কিছুদূরে রেললাইনের বরাবর ছোট্ট একটা নদী বহিয়া গিয়াছে—মাটির বুকে শুভ্র উপবীতের মতন। বৈদ্যনাথের মনে হয় এই জলধারা তার কত আপনার, কত দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ওর সঙ্গে। ওর সঙ্গে বুঝি মিশিয়া আছে যুগ-যুগান্তের স্মৃতি।

কয়েক মাইল পরে নদীটা ডাইনে বাঁকিয়া আকাশ ও জোছনার মধ্যে স্বপ্নেরই মতন মিলাইয়া গেল। এরূপ কত জিনিসই ত আসে যায়। মানুষ দেখিয়াও দেখে না। বৈদ্যনাথের কিন্তু অপরিচিত এই নদীর জন্য দুঃখ করিতে থাকে। কেন যে করে নিজেই জানে না। হয়ত উহা এতদিনের পরিচিত জীবনের, পরিচিত জগতের নিকট হইতে বিদায় লওয়ারই বেদনা।

পনের

শিয়ালদহে গাড়ি পৌঁছিল দেরি করিয়া। বৈদ্যনাথের মন ও শরীরের অবস্থা তখন হোটেল খুঁজিয়া নেওয়ার মত নয়। কুলির মাথায় মাল চাপাইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সে ষ্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে আসিয়া ওঠে। সেটা পছন্দ হয় শুধু নাম দেখিয়া—বেশ নাম, কর্ণফুলী।

সে চাহিয়াছিল একা থাকার মতন একখানা ঘর। কিন্তু ঐরূপ ঘর খালি ছিল না। মালিক একটা মোটা খাতায় তার নাম ঠিকানা ও পরিচয় লিখিয়া নিয়া একটি চাকরকে বলিলেন, জীবন এঁকে অমরবাবুর ঘরে নিয়ে যাও। ইনি সেখানে থাকবেন।

জীবন বৈদ্যনাথকে দোতলায় একখানা ঘরে লইয়া যায়। উত্তর দুয়ারি

ঘর, সামনে বারান্দা, দক্ষিণে দুটা জানালা। দরজার নিকট হইতেই জীবন বলে, অমরবাবু, ইনি আপনার ঘরে থাকবেন।

পুবদিকের তক্তাপোশে শুইয়া অমর একখানা বই পড়িতেছিল। উঠিয়া বইখানা কপালে ছোঁয়াইয়া বলিল, নমস্কার।

বৈদ্যনাথ প্রতিনমস্কার করে। প্রথমেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অমরের এক মুখ দাড়ি গোঁফ ও মাথার বড় বড় চুল। তার বয়স ত্রিশ একত্রিশ, গায়ের রং পরিষ্কার, গৌরবর্ণই বলা চলে। উজ্জ্বল মুখশ্রী।

যাক্, আলাপ পরিচয় পরে হবে। আপনি বিশ্রাম করুন—বলিয়া অমর আবার শুইয়া পড়ে। বইতে তার মুখ চাপা পড়িয়া যায়।

মালঙ্গী ছাড়ার পর বৈদ্যনাথের প্রথমে ভাল লাগে পরশমুনি ষ্টেশনের সেই বধূটিকে, তারপর লাগিল অমরকে। এই দুইজন ছাড়া প্রতিটি লোকের চোখে মুখে সে লক্ষ্য করিয়াছে কৌতুকমিশ্রিত তাচ্ছিল্য।

নদীপারে চাষীদের একজন তাকে শুনাইয়া বলিল, উঃ, কী কুচ্ছিত রে বাপ্। কর্ণফুলীর মালিকও মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। তার চোখে মুখে ফুটিয়া ওঠে অবিশ্বাস, ভাবটা এই রকম,—এই লোক থাকবে কর্ণফুলীতে? ছোঃ। তারপর আস্থা হয় বৈদ্যনাথের নিকট পনর টাকা আগাম পাওয়ার পর।

অমর আর সেই বধূটিই শুধু এর ব্যতিক্রম।

জীবন খালি তক্তাপোশখানার উপর তার বিছানা পাতিয়া দিয়া বলিল, কলঘরে আপনার চানের জল থাকবে। সাবান চাই?

বৈদ্যনাথ বলিল, না তুমি যাও। আমি একটু পরে স্নান করব।

পথশ্রমে সে ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। শুইয়া ঘরখানাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। মাঝারি সাইজের ঘর। ১৪×১২ ফুট। আলো বেশ, গুমোট না থাকিলে বাতাসও বেশ খেলে বলিয়া মনে হয়।

তক্তাপোশ দু'খানার পাশেই দেয়ালে তিনটি করিয়া তাক। কাপড় জামা রাখার দু'টা আলনা। অমরের পাশের তাকগুলি বইয়ে বইয়ে বোঝাই, দেয়ালে কাত করা বই ভরতি ছোট একটা সেলফ। বিছানার

উপর মাসিক সাপ্তাহিক ও পুস্তিকার স্তূপ। নিচে মেজেয় কতগুলি খবরের কাগজ ছড়ানো। অমরের পাশের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, বিপরীত দিকে কার্ল মার্ক্স্ ও মহাত্মা গান্ধীর।

খাওয়ার পর বৈদ্যনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, উঠিল ঘণ্টা তিনেক পরে। অমর এতক্ষণ পড়িতেছিল। বৈদ্যনাথের ঘুম ভাঙিলে ষ্টোভ ধরাইতে ধরাইতে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার জন্য চায়ের জল চড়িয়ে দি?

বৈদ্যনাথ বলিল, আমার জন্য এতক্ষণ চা খাননি বুঝি?

সে যাক। আপনি খান ত চা?

তা খাই।

ষ্টোভ আগুনের ফণা তুলিয়া সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করে, অমর পাম্প করে আর গুন গুন করিয়া গান গায়,

মুক্ত কর ভয়
আপন মাঝে শক্তি ধর
নিজেরে কর জয়।

পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের গুলি ফুলিয়া উঠে। মনে হয়, হ্যাঁ, শক্তিধরই বটে।

চা তৈরি করিয়া সে বৈদ্যনাথকে একটা ডিশে সিঙাড়া ও সন্দেশ দিলে সে বলিল, এ আবার কি?

অমর একটু হাসিয়া বলিল, খানই না।

চা খাওয়া শেষ হইলে প্লেট ও কাপ ধুইয়া বৈদ্যনাথকে কিছু না বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। বৈদ্যনাথ আর বাহির হইল না; দিনটা গড়াইয়া গড়াইয়াই কাটাইয়া দিল। একবার শুধু বইগুলির উপর চোখ বুলাইয়া নিল। ছাত্রজীবনে মাত্র দু' একখানার নাম শুনিয়াছে, তা ছাড়া অধিকাংশই তার অজানা।

পরদিন সকালে অমর তাকে আবার চা দেয়, সঙ্গে সিঙাড়া ও সন্দেশ। বৈদ্যনাথের কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। সে বলে, এ আবার কি? রোজ রোজ খাবার—

অমর কহিল, এ আপনাদের পাতি বুর্জোয়া ফিলিং। খালি ফর-ম্যালিটি।

বৈন্থনাথ এই ধরনের কথার সঙ্গে অভ্যস্ত নয়, তাই জবাব দেওয়ার ভাষাও খুঁজিয়া পায় না। অমর বলে, আমার নিজের হাতে তৈরি। খরচা সামান্যই পড়ে।

বৈন্থনাথ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

আমাকে ময়রাও বলতে পারেন। সন্দেশ, পান্তুয়া আমি নিজের হাতে তৈরি করি, একটা ক্যান্টিনে কাজ করি কি না। মাঝে মাঝে শখ হয় অতিরিক্ত খাবার তৈরি করার, ক'রে বাড়ির জন্য ও বন্ধু বান্ধবদের জন্য নিয়ে আসি।

বাড়ি বুঝি কলকাতার কাছে?

একেবারে এই পাড়ায়।

একটু পরে বৈন্থনাথ বলিল, আপনার বইগুলো নিয়ে পড়তে পারি?

অমর সাগ্রহে বলিল, নিশ্চয়। কবিতা গল্প রাজনীতি আপনার অনুরাগ কিসে?

লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নাই বহুদিন। তবে মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে হোমিওপ্যাথি পড়ি।

হোমিওপ্যাথিক বই ত আমার কাছে নেই।—অমর হাসিয়া বলে।

বৈন্থনাথ বলিল, উপন্যাসই দিন একখানা। মন ভাল নয়, ঐ নিয়ে তবু সময় কাটানো যাবে।

অমর হাসিয়া বলিল, তা হবে না। যা পড়বেন তাই নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমার সঙ্গে।

বৈন্থনাথ বিপদে পড়ে। বলে, সে কি সম্ভব?

সম্ভব নিশ্চয়। গল্প উপন্যাসের করতে হবে সাহিত্যিক মূল্য বিচার। ইতিহাসের বেলায় দেখতে হবে সিদ্ধান্তগুলি বিজ্ঞানসম্মত কি না।

বৈন্থনাথের একবার ইচ্ছা হইল বলে, না দরকার নেই পড়ার। কিন্তু অমর তখন বলিয়াই চলিয়াছে, মনে হয় আপনি ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু

ভাবনার কিছু নেই। মানুষের মন আয়নার মতন। তার উপর সত্য বস্তু প্রতিফলিত হয়। সেই মাপকাঠি দিয়েই সব জিনিসের বিচার, বিশেষ করে শিল্প ও সাহিত্যের।

বৈদ্যনাথ আর আপত্তি করে না। অমর হাসিয়া বলে, মনে রাখবেন আলোচনাও হবে একটা হালুইকরের সঙ্গে।

সে একখানা বই আগাইয়া দেয়। কাগজের মলাট, উপরে রঙিন ছবি। স্বাস্থ্যবান এক পুরুষ, সামনে বিস্তীর্ণ পথ। ছবিখানা মানুষের অন্তহীন সংগ্রামের প্রতীক, প্রতীক তার জয়যাত্রার।

উপন্যাসখানায় বৈদ্যনাথ এক বাস্তবচিত্রের সম্মুখীন হইল। ঘটনাগুলি যেন চোখের উপর ঘটিতেছে, শক্তিমান জাতি অশক্ত অপর এক জাতির প্রতি অত্যাচার করিতেছে। অশক্তের অপরাধ, তার ও শক্তিধরের গাত্রচর্মের বর্ণ বিভিন্ন। সে কালো, শক্তিধর সাদা।

এই বই তার মনে দোলা দেয়, হয়ত বেশী করিয়াই দেয় সে নিজেও ঐ কালোদের একজন বলিয়া।

বই লইয়া উভয়ে আলোচনা হইল। ঐকমত্যও হইল। অমর দিল আর একখানা উপন্যাস। এখানাও জাতি-বৈরের কাহিনী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এক রাষ্ট্র কোনও আদিম জাতির চার পাঁচশ স্ত্রী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ যুবার ক্ষুদ্রদলকে ধীরে ধীরে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল তারই গল্প।

সরকারি দলিল দস্তাবেজের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত কাহিনী কিন্তু রচনার প্রসাদগুণে উহা রসে বর্ণে অদ্ভুত রূপায়িত হইয়াছে। পড়িলে শ্রদ্ধা জন্মে আদিম ঐ মানব গোষ্ঠীর উপর আর মনে হয় দুনিয়াটা কী অসঙ্গতিতেই না ভরা। সভ্যতার আর এক নাম হওয়া উচিত অসঙ্গতি। সভ্য মানুষ বড়াই করে সাম্যের, ডিমোক্র্যাসির, বিশ্বমানবতার। কী মিথ্যা বড়াই, নিচ ভণ্ডামি।

পরক্ষণেই মনে পড়ে নিজের কথা। সেও ত ঐ ওদেরই একজন। তার তুচ্ছ শক্তি দিয়া শক্তিহীনের উপর নিপীড়ন কম করে নাই আর সেই

শক্তিহীনেরা তার স্বজাতি স্বগোত্র। তার মন নিজের উপর বিরক্তিতে ভরিয়া যায়।

প্রথম হইতেই অমর লক্ষ্য করিয়াছে যে বৈদ্যনাথের মনের কোথায় যেন বেদনা আছে। দ্বিতীয় এই বই সম্পর্কে আলোচনার ফলে জিনিসটা আর একটু স্পষ্ট হইল। মনে হইল তার ভিতরে কোথায় যেন গরমিলও আছে।

আরও কয়েকখানা গল্প উপন্যাসের পর বৈদ্যনাথ ইতিহাস পড়ে। ইতিহাস হইতে যায় রাজনীতিতে। সেখানেও দেখে ঐ একই হানাহানির ছবি। দ্বন্দ্ব স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের।

কয়েক মাসে তার চরিত্রে অমরের প্রভাব পড়ে অনেকখানি। সে যে কতখানি বৈদ্যনাথ তাহা নিজেও জানে না।

* * * *

কাটে কয়েকমাস। আসে কালো আখরে লেখা ১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট।

প্রভাতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আদিপর্ব। তরুণ লীগপন্থীরা লাঠি হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, আওয়াজ তোলে, লড়কে লেঙ্গে।

ট্রাম বাস আপিস আদালত বন্ধ। লোকে রাজপথে ভিড় করে, গুজবের জন্ম দেয়, গুজব রটায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর আসে দোকান লুঠের, রক্তারক্তির। দোকান বন্ধ না করায় কোথায় মুসলমান ব্যবসায়ী সমধর্মীর হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছে, কোথায় আগুন লাগিয়াছে এই সব সংবাদ। জনতা উত্তেজিত হয়, ধ্বনি করে, জয় হিন্দ্। রাস্তার ওপার হইতে আওয়াজ ওঠে, আল্লাহো।

কর্ণফুলী হিন্দু পল্লীর প্রান্তে—পিছনে বহুদূর পর্যন্ত হিন্দুর বসতি। আর সামনের রাস্তার ওপারে একসারি বাড়ির পরই মুসলমান পল্লী। দুপুরের পর রাস্তার ওপার হইতে দলে দলে লোক আসে এপারে চড়াও হইতে—এ পারেও লোক তৈরি হয়। চলে গাল মন্দ, ঢিল ছোঁড়াছুড়ি। সারাটাদিন সে কী খণ্ড প্রলয়।

সন্ধ্যার আগে হইতে গাঁটরি বোঁচকা লইয়া যুবা বৃদ্ধ শিশু ও নারীর দল ও পাড়া হইতে আসিতে আরম্ভ করে। আসে দলে দলে— কারও হাত ভাঙ্গা, কারও মাথায় পটি বাঁধা। আবার কেহ বা সম্পূর্ণ অক্ষত দেহ। সহৃদয় মুসলমানেরা তাদের রক্ষা করিয়াছেন। তাদের ঘিরিয়া লোকে নানা প্রশ্ন করে, সহানুভূতি দেখায়, কেহ বা খাবার দেয়।

অধিকাংশ বাস্তহারাই হিন্দু পল্লীর অভ্যন্তরে চলিয়া যায়। কেহ বা এই পাড়ায় থাকে। কর্ণফুলীতে থাকে সাত আটজন। তার মধ্যে একটি প্রৌঢ়া সারা রাত পুত্রের জন্য আক্ষেপ করে— ছেলেটার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছিল তাই নিয়ে ছুটে গেল বেনে বাড়ির ওদের বাঁচাতে। আর ফিরল না। কি হয়েছে বলতে পার?

সারাদিন সে উপবাসী ছিল, রাত্রেও কিছু খাইল না।

বৈদ্যনাথ, অমর ও বোর্ডাররা অনেকেই প্রবোধ দেয়। সে বলে, ঐ আমার এক ছেলে, ওকে তোমরা এনে দাও। ছেলের নাম অমি—খাসা ছেলে, কাজ করত টেরেম কোম্পানীতে। না দিলে কিন্তু যাব না। নালিশ করব।

রাত্রে কলরব আরও বাড়ে। অন্ধকারের বুক চিরিয়া ধ্বনি ওঠে, জয় হিন্দ, আল্লাহো।

ন'টা আন্দাজ প্রথমে পুবদিক লাল হইয়া উঠিল তারপর উত্তর। আগুন ছড়াইয়া পড়িল চার দিকে। আগুন নয় যেন সহস্রাক্ষ, সহস্রজিহ্ব হিংসাদানব।

কর্ণফুলীর ছাদে ইট জড়ো করা হইয়াছিল— সদর দরজায় গায়ে কাত করিয়া রাখা হইয়াছিল মস্ত বড় এক সিন্দুক। বোর্ডাররা ছাদে উঠিয়া জটলা করিতে লাগিল। চেঁচাইল, গালি পাড়িল। এর ব্যতিক্রম শুধু অমর আর বৈদ্যনাথ। এই হিংসার, এই মত্ততার তারা ছিল নীরব সাক্ষী।

অমর হঠাৎ একবার বলিয়া উঠিল—শয়তান, শয়তান ওই ওরা যারা এই আগুন জ্বালিয়েছে।

পর পর তিনটা দিন কাটিল নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে। রাস্তায়

একটা সার্জেন্ট দেখা গেল না, না একটা লাল পাগড়ি। মনে হইল শাসক শক্তি শয়তানের হাতে কলিকাতা সহরটাকে তুলিয়া দিয়াছে।

হিংসারও ক্লান্তি আছে। সেই ক্লান্তি আসিল তৃতীয় দিনে। রাজপথ তখন শবে শবে ছাওয়া। এই সময় নামিল গোরা সৈন্য ; হিন্দু মুসলমান উভয়েই আজ তাকে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিল। বৈদ্যনাথের মনে হইল, মানুষের এর চেয়ে অধোগতি বুঝি আর নাই।

গোরা সৈন্য দেখিয়া প্রৌঢ়া 'অমি' 'অমি' বলিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। সে তখন সম্পূর্ণ পাগল, তার হাতে একখানা ইঁট।

তাকে লক্ষ্য করিয়া চলমান লরি হইতে একটি সৈন্য গুলি ছুঁড়িল। প্রৌঢ়ার মৃতদেহ মাটিতে লুটাইল। গোরা হাসিয়া উঠিল—এ যেন দ্বিতীয় পলাশীর প্রান্তর।

ষোল

কেতুর সংসার বিরাট, লোকজন অনেক, কাজও অনেক। ফসল কাটার সময় দিনে তিন বার মজুরদের খোরাক যোগাইতে হয়। মাঠ হইতে গাড়ী গাড়ী ধান আসে। উহা শুকাইয়া ঝাড়িয়া মড়াইয়ে তুলিতে হয়। এর উপর আছে গাই বলদকে জাব দেওয়া। সবই তদারক করিতে হয় নিজেদের। না করিলে মজুররা ফাঁকি দেয়, চুরি করে।

কিছুদিন যাবৎ কেতুর শরীর ভাল ছিল না কিন্তু তার উপস্থিতিই ছিল যথেষ্ট। তার নজর ছিল সব দিকে তাই মজুররা ফাঁকি দিতে সাহস করিত না। সে একবার জোর গলায় ডাকিলেই ভয় পাইত।

তার অবর্তমানে সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তেজচন্দ্র ছেলেমানুষ, সংসার-অনভিজ্ঞ, সব দিক দেখিতে পারিত না। তার দিদি কামিনীও কোন দিনই কিছু দেখে না, না আছে প্রবৃত্তি, না অভ্যাস। সে খায় দায় আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া গল্প করিয়া বেড়ায়।

সুশীলার বয়স কম, কোলে একটি ছেলে। শ্বশুরের শোকে সে কিছুটা মুষড়িয়া পড়িয়াছিল। এই সব নানা কারণে সংসারের অনেক কিছুরই ভার

পড়িল কুন্তীর উপর। এই পরিবারের কেহ নয়, পরিচয়ও অল্প কয়েক-দিনের কিন্তু এর মধ্যেই সে তাদের আপনার বনিয়া গেল। লাঞ্ছিতা অসহায়া এই তরুণীকে জয় করিল কেতুর স্নেহ, সুশীলার ভালবাসা।

তাকে কিছু বলিতে হয় না। সে কাজ করে দরদ দিয়া, এ যেন নিজের সংসার; সুশীলা তার মায়ের পেটের বোন।

সে অবাক হইয়া যায়। বলে, এমন ভালো মেয়ে তুমি, এত গোছালো, অথচ ঘরে তোমার ঠাঁই হল না। এরই নাম অতি ঘরন্তী না পায় ঘর।

কেতুর মৃত্যুর তিন চার দিন পর হইতে তার বারান্দায় গ্রামের মাতব্বরদের বৈঠক শুরু হইল। বৈঠক রোজই বসে। শুধু মাতব্বররা নয়, সন্ধ্যার পর এক এক করিয়া গ্রামের অনেকেই জড়ো হয়। শ্রাদ্ধে কি কি হইবে, শ্রাদ্ধ হইবে কতদিনে এই সব লইয়া আলোচনা করে।

একদল ধরিল ক্ষত্রিয়াচারে তের দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আর একদল বলিল, না, যা চলে আসছে সেই রকমই হোক, এক মাসে কাজ।

বিপক্ষ দল বলিল, শুদ্দ্রের মতন এক মাসে কাজ, সে আমরা হতে দেব না।

কেতুদের মৃতাশৌচ থাকে এক মাস, বরাবরের এই নিয়ম। কিন্তু কেহই আর শূদ্র থাকিতে চায় না; চায় উপরে উঠিতে, ক্ষত্রিয় হইতে, ক্ষত্রিয়াচারে বার দিন অশৌচ পালন করিতে। ক্ষত্রিয় শব্দ উচ্চারণ করা শক্ত তাই মুখে মুখে ছেত্রির দল নামই চালু হইয়া গেল। এই দলের পাণ্ডা উপেন, অক্ষয় পালুই ও অভিরাম।

উপেন পাশের গ্রামের কোন কবিরাজের ঔষধ বাটিত; গোটা কয়েক সংস্কৃত শ্লোক তার মুখস্থ ছিল। উহা আওড়াইয়া সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত যে তারা ক্ষত্রিয়।

অভিরাম লাঠিখেলা ও ছোরা চালানোয় ওস্তাদ। সে বলে, আমরা যে ছেত্তিরি, এই তার বড় প্রমাণ। আর কেউ ছোরা চালাক দেখি আমার মতন—লাঠি ঘোরাক।

সমস্যা শুধু ক্ষত্রিয়াচার ও শূদ্রাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তেজচন্দ্রের আত্মীয়েরা অনেকেই চায় শ্রাদ্ধে ঘটা হোক, ষোড়শ বৃষোৎসর্গ হোক, সে গ্রামের সবাইকে লুচি মণ্ডা করিয়া খাওয়াউক।

তেজচন্দ্র বলিল, লুচি মণ্ডা করার অবস্থা ত আমার নয়।

বৃদ্ধ ধনঞ্জয় চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, এ কী বলছ তেজু? তুমি বাপের শ্রাদ্ধ করতে চাও না!

তেজ বলিল, শান্তির কাজ, ধর্মের কাজ সবই করব জয় কাকা। কিন্তু ঘটা করব কোত্থেকে? নগদ কিছুই নেই আমার।

অক্ষয় পালুই বলিল, কাঁচা টাকা লোকের হাতে থাকে না। টাকা থাকে কাগজ পত্তরে, জলে মাটিতে, ফল পাকুড়ে।

তেজ বলিল, কাগজ মানে ত নোট আর খত। বাবার সে সব কিছুই ছিল না। তানার যা কিছু আছে ঐ দুটো পুকুর আর ক বিঘে খেত খামারে। আর কিছু সুপুরি হত। এ দু' বছর তাও হয়নি।

উপেন বলিল, তুই ত রাজমিস্ত্রী। একটা বড় কাজ পেলে ছ' মাসে দেনা শোধ হয়ে যাবে।

তেজ কহিল, রাজের কাজ আর পাচ্ছি কোথায়?

কেতু টাকা রাখিয়া যায় নাই, তেজ বড় মানুষ নয়—ব্যাপারটা সত্য হইলে খুশি হয় প্রায় সবাই কিন্তু বরাবর তারা শুনিয়া আসিয়াছে অন্যরূপ তাই তার কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। উপেন বলিল, মড়া বাপকে এর মধ্যেই খাটো করার চেষ্টা করিস নে তেজু। ধম্মে সইবে না।

তেজ কি যেন একটা কড়া উত্তর করিতে যাইতেছিল কিন্তু তার আগেই তার খুড় শ্বশুর শারদা বলিল, দাদার কাছে ত শুনেছি অন্যরকম। তোমার বাবা না কি তালিমপুর মৌজো কেনার জন্য টাকা ট্যাঁকে করে ঘুরত।

দরিদ্র গ্রামে ধনী বলিয়া কেতুর নাম ছিল। যারা তার টাকার গল্প করিয়া বেড়াইত তাদের মধ্যে শারদার দাদা প্যারী একজন। সে লোক সমাজে কেতুর সামনেই অনেক সময় বলিত, বেয়াই আমাদের হাজার

হাজার টাকার মালিক। কেতু প্রতিবাদ করিত না, মুচকি মুচকি হাসিত। লোকে ভাবিত কথাটা সত্য।

পুকুরের পাঁচ সাত সেরি কাতলা, ব্রজরাজ নামে বড় একটা ষাঁড়, কাঁঠাল কাঠের তৈরি পদ্ম বসানো দরজা, এ সব ছিল কেতুর ধন সম্পত্তির মৌন সাক্ষী। ছেলে তার শ্রাদ্ধে ঘটা করিতে রাজী না হইলে কি হয় গ্রামের পাঁচজনে নাছোড় বান্দা। হোক্ না তার দেনা কিন্তু তারা ত দু' তিন দিন হৈ হুল্লোড় করিবে, লুচি মণ্ডা ফলার খাইবে। তার ফলে তেজ যদি তাদের পর্যায়ে নামিয়া আসে সে ত বরং ভালই। গাছের মধ্যে তুচ্ছ বটে তবুও বেগুন লঙ্কাখেতের পাশে এরণ্ড যেমন, তার নিঃস্ব স্বজাতীয়দের মধ্যে তেজচন্দ্রও তেমনি। অনেকেই মনে মনে চায় তার মাথাও নিচু হোক—ছোট হোক—সব মাথা একেবারে সমান।

তার বাড়ির সামাজিক এই বৈঠক ভাঙে রাত ১১টা, ১২টায়, কলিকার পর কলিকা তামাক পোড়ে, বাটা ভরতি পান উধাও হইয়া যায়। গ্রাম-প্রবীণরা উঠিলে সে হাত মুখ ধোয়। সুশীলা তার আগেই ঘুমাইয়া পড়ে। তেজের খাবার লইয়া বসিয়া থাকে কুন্তী। সে আসনে বসিলে ফলের খোসা ছড়ায়, দুধ গরম করিয়া দেয়।

প্রথম কয়েকদিন পরস্পর কোন কথা বলে নাই। তেজ মাথা নিচু করিয়া খায়; তার শশা ও বাতাসা চিবানোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না।

নিস্তব্ধ পরিবেশ। সারা দিনের শ্রান্তি ও গ্রাম-প্রবীণদের কল-কোলাহলের পর সে এই সময় একটু সোয়াস্তি বোধ করে। চোখ তুলিয়া কুন্তীর দিকে তাকায়। সুন্দর মেয়েটি, ভাসা ভাসা চোখ, মুখখানি স্নিগ্ধতায় ভরা। তেজকে পীড়া দেয় তার সিন্দুরহীন সীমন্ত ও রিক্ত হাত দু'খানি। বিধবা ভগ্নীর রিক্ততায় মানুষ যেরূপ বেদনা বোধ করে তার ব্যথা সেইরূপ। এত রাত পর্যন্ত সে তার খাবার আগলাইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া কেমন যেন সঙ্কোচও বোধ করে।

একদিন সে বলিল, তুমি বসে থেকো না দিদি। শুয়ে প'ড়। আমি বরং ডেকে তুলব।

কুন্তী বলিল, এতে আমার কোন কষ্ট হয় না। অভ্যেস আছে।

রাত জাগার অভ্যেস?

কুন্তী বলিল, আমার জা রাত্তিরে এক ঘুমের পর খায়। তখন তাকে গরম ভাত দিতে হয়।

এক ঘুমের পর খায় কেন?

ভাসুর না খেলে খায় না। বলে, সোয়ামীর আগে খেলে ঘরে আলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।

তাহ'লে তোমার দেরি হয় ভাসুরের জন্য?

না তিনি গরম ভাত চায় না। আমায় জেগে থাকতেও নিষেধ করে। কিন্তু দিদির গরম ভাত চাইই। ঠাণ্ডা খেলে নাকি শূলের বেমো হয়।

তেজ কহিল, ভাবী মাসীর শূল বেদনা আছে বুঝি?

না। ঠাণ্ডা খায় না শূল বেদনা হওয়ার ভয়ে।

ভাবিনী ঠাণ্ডা খায় না শূল রোগের ভয়ে আর কুন্তী তার ভয়ে রাত দুপুর পর্যন্ত খাবার লইয়া বসিয়া থাকে। তার ভয় জায়ের রুদ্র মূর্তিকে। বিবাহের আগে সে সব চেয়ে বেশী ভয় করিত পুলিসকে—যারা তার মাকে কলিকাতার রাস্তা হইতে লঙরখানায় লইয়া গিয়াছে। আজ জাকে ভয় করে পুলিসের চেয়েও বেশী।

আর একদিন তেজ কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে কিছু খেয়েছ?

কুন্তী মাথা নাড়াইয়া জানাইল, না।

কেন খাও নি?

খাওয়ার অভ্যেস নেই, খিদেও পায় না।

এখন থেকে কিছু খেও।

দিন দুই পরে তেজ কথাটা আবার তুলিলে কুন্তী কহিল, ও অভ্যেস আর করতে চাই না। আমার মতন অনেকেই ত একবেলা খেয়ে থাকে।

কথাটা সত্য। তেজ তাহা জানে। শুধু বিধবা নয়, এয়োতিরা, শিশুরা বৃদ্ধেরা আশে পাশের অনেকেই একবেলার বেশী খাইতে পায় না, খাবার জোটে না।

পাছে তারও একদিন ঐরূপ দুরবস্থা হয়, এই ভয়ে তেজ দেনা করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ করিতে নারাজ। এদিকে আত্মীয় কুটুম্বরাও তার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া সে কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, শ্রাদ্ধে কি করব বল দেখি? সবাই বলছে ষোড়শ ব্রেষ করতে। কিন্তু দেনা করে কি ঘটা করা ভাল?

কুন্তী মাথা নাড়াইয়া জানায়, না। একটু পরে বলে, বড়দি কি বলে? —বড়দি, সুশীলাদি?

বউ কিছু বলে না। দিদির ইচ্ছা ঘটা করি। সে বলে বাবার কি ছিল, নিজের ক্ষমতায় এত রেখে গেছে। তার কাজে ঐ থেকেই নয় দু বিঘা জমি বন্ধক দে।

শেষ পর্যন্ত কামিনীর ইচ্ছাই বলবতী হয়। ঠিক হয় ষোড়শ বৃষোৎসর্গ হইবে, তার ইচ্ছা মতন শ্রাদ্ধও হইবে এক মাসে। সে বলে, চৌদ্দ পুরুষ পিণ্ডি খেয়েছে এক মাসে, তের দিনের পিণ্ডি বাবার সইবে না, বদ হজম হবে।

শ্রাদ্ধ তিথি যত আগাইয়া আসে কুন্তী ও সুশীলার কাজ তত বাড়ে। সারা দিনের খাটুনির পর দেহে শ্রান্তি নামিয়া আসে। কুন্তী এক একদিন রাত্রে তেজের খাবারের সামনেই ঝিমাইতে থাকে। একদিন ঐ অবস্থায়ই স্বপ্ন দেখিল কেতু সামনে দাঁড়াইয়া, শান্ত মূর্তি, ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ একটু হাসি—বৃদ্ধ যেন মঙ্গল বিলাইতেছেন।

মুখখানি ধীরে ধীরে বদলায়, প্রথমে কপাল, তারপর চোখ নাক ঠোঁট। বদলাইয়া একেবারে কুন্তীর বাপের মত হইয়া যায়। দুজনের চোখে মুখে হাসিতে চাহনিতে অদ্ভুত সাদৃশ্য। কেতু বাঁচিয়া থাকিতে কুন্তী নিজে উহা একদিনও লক্ষ্য করে নাই। অনেকদিন পরে নিজের

বাবাকে আজ দেখিতে পাইল। একটু হাসিয়া তার দিকে হাত দুখানি বাড়াইয়া দিল, যেমন দিত শৈশবে তার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ার সময়।

ঠিক এই সময় তেজ আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। কুন্তীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মেয়েটি সত্যই বড় ভাল, তার ঘুমন্ত চোখের পাতায়ও যেন ভাল মানষির ছাপ লাগিয়া আছে।

তার বহু নিন্দাবাদ সে শুনিয়াছে। পাড়াগেঁয়ে বিধবা মাত্রেরই নামে এইরূপ নিন্দা রটে ; বিশেষতঃ সে যদি গরিব হয়, সুন্দরী হয়। বৈদ্যনাথ প্রজাদের নামে মামলা করার পর কুন্তীর কুৎসায় মালঙ্গী মুখর হইয়া ওঠে। তেজ সে সব কানে তোলে নাই। এই সম্পর্কে সেও ছিল তার বাপের মতন।

সে গলা খাঁকারি দিলে কুন্তীর তন্দ্রা ভাঙিল। সে শশব্যস্তে উঠিয়া বলিল, তুমি—আপনি—

তেজ বলিল, দেখছিলুম তুমি ঘুমের মধ্যে কেমন হাসছিলে।

লজ্জায় কুন্তীর মুখ লাল হইয়া যায়। সে বলে, তোমার বাবাকে দেখছিলুম। একটু একটু করে বদলে শেষটায় তার মুখখানা হয়ে গেল আমার বাবার মতন।

তেজ বলিল, দুজনকেই ভালবাস কি না তাই ঐ রকম দেখেছ।

কুন্তী এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। আর তারা আমায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল!

কেতুর শ্রাদ্ধ বাসর। শ্রাদ্ধ একমাসে—গ্রাম-প্রবীণদের সঙ্গে রফা হইয়াছে পুরোহিত মন্ত্র পড়িবার সময় তাদের ক্ষত্রিয় বলিবে।

উঠানের মাঝখানে শাড়ী ও ধুতির তৈরি চাঁদোয়া, তার নিচে শ্রাদ্ধের বৈঠক। একদিকে দানের জিনিস আর একদিকে পিতলের পরাতে কলার পাতায় পাতায় ছোট বড় অনেকগুলি ভুজ্য, চাল, ডাল, ফল ফলারি। তামার টাটে তিল, ফুল, দূর্বা ; পাথরের বাটিতে তুলসী ও ঘষা চন্দন।

দক্ষিণ পুব কোণে বৃষোৎসর্গের বেদী, এক পাশে ছোট ছোট চারটি বাছুর বাঁধা।

দুপুরের আগে নাকি প্রেতের ক্ষুধা পায় না তেজ তাই একোদ্দিষ্টে বসে নাই, বসিবে দুপুরের পর। সে সব তদারক করিয়া বেড়ায়। সমবেত মাতব্বরদের আপ্যায়িত করে। প্রশ্ন করে, তাদের কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে কি না। কাহাকেও বলে, তোমায় একটু তামাক দিক। কারও বা বাড়ির খবর জানিতে চায়।

তার পরনে সাদা থান, গায়ে সুতির চাদর। প্রথম দিকটায় সে শীতে কষ্ট বোধ করিতেছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সদ্য কামানো মাথা চিড় বিড় করিতে লাগিল।

পল্লীগ্রামের দুপুরের নিমন্ত্রণ, খাওয়া হইবে তৃতীয় প্রহর হেলিয়া যাওয়ার পর। তাই নিমন্ত্রিতদের অনেকেই আসে নাই। উপস্থিত শুধু মাতব্বররা। তারা হুঁকা হস্তে সভার শোভা বর্ধন করে। আলোচনা চলে নানা বিষয়ে, বেশীর ভাগই জমি জমার কথা। অক্ষয় পালুই বলিল, মেঘু ঠাকুর শুনছি সদরে জমি-জমার ব্যাপার নিয়ে কি সব করছে।

অভিরাম কহিল, সে নাকি বলেছে বেটাদের জব্দ না করি ত আমার নাম মেঘনাদ নয়।

উপেন বলিল, তোমার জেঠতুতু ভাইও ত ও দলে গেছে।

ধনঞ্জয় কহিল, যাবেই ত। ও যে দলে থাকবে পরশুরা থাকবে তার পাল্টা দলে। বংশী বোষ্টমও শুনলুম মেঘুর সঙ্গে সদরে গেছে।

অক্ষয় কহিল, যেখানে পয়সার গন্ধ সেইখানেই বংশী।

বীরু বলিল, কেতু না থাকায় আমরা দুর্বল হয়ে গেছি।

তাকে সমর্থন করিল বেঁটে বাদল। বলিল, কেতুকা ছিল খুঁটোর মতন। সকলেই আজ কেতুর জন্য আক্ষেপ করে। তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে।

*   *   *   *

সুশীলা দানে বসিল। ষোড়শ দান, থালা ঘটি বাটি ঘড়া গাড়ু প্রভৃতি

ষোলটি জিনিস। সবগুলিই কিছুটা মলিন, নতুন কেনা হয় নাই, পুরোহিতের বাড়ি হইতে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। সেই আবার লইয়া যাইবে।

পুরোহিত কুশাসনে বসিয়া। ডান হাতের অনামিকায় কুশের আংটি। তিনটি আঙুল কোশার জলে ডুবাইয়া দানের জিনিসে ও সুশীলার গায়ে জল ছিটাইয়া সে মন্ত্র আওড়াইতে শুরু করিল, আলেম্মান গোত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য কেতুস্য—অক্ষয় স্বর্গকামং ইদং ঘড়াং ব্রাহ্মণায় দদানি, তস্য পুত্রবধু সুশীলা স্বাহা।

পুরোহিত বার দুই স্বাহা বলিলে ধনঞ্জয় কহিল, ও আবার কি ঠাকুর, তেজুর বৌর নামের সঙ্গে সাহা কেন? আমরা জাত ছেত্রি, সাহা নই।

পুরোহিত বলিল, এ জাত সাহা নয়, বেদের সোয়াহা।

উপেন কহিল, ব্যাদের দোহাই দিয়ে আমাদের ফাঁকি দেওয়া চলবে না। মন্তর বদলে দাও ঠাকুর।

অনেকেই বলে, ঠিক ঠিক।

পুরোহিত গেলাস দানের সময় নূতন করিয়া মন্ত্র পড়াইল, কেতুস্য অক্ষয় স্বর্গকামং ইদং গেলাসং তস্য পুত্রবধূ সুশীলা সোয়াধা।

মাতব্বররা খুশি হয়। উপেন বলে, ঠিক, ঠিক। আমরা হনু সোয়াধা।

সমস্ত উপকরণের পর খড়ম দানের সময় দীপ নিভিয়া গেল। পুরোহিত জোর গলায় হাঁক ডাক করিতে লাগিল, দীপের ব্যবস্থা কর, তেজু। দীপ-হীনং শ্রাদ্ধং একেবারে পণ্ডং।

তেজু কাছে ছিল না। কিন্তু দীপহীন শাস্ত্রীয় কাজে অমঙ্গল শুধু তার নয়, অমঙ্গল দেশ সুদ্ধ সবার, বিশেষতঃ নূতন ক্ষত্রিয়দের। জাতীয় মর্যাদাবোধ তাদের অত্যন্ত সজাগ। তাদের মুখপাত্র উপেন বলিল, ছেত্রীর বাড়িতে অশাস্তরি কাজ চলবে না, তেজু। তাড়াতাড়ি পিদ্দিম দিতে বল্।

পিদ্দিম, পিদ্দিম—তিন চার জন মাতব্বর সমস্বরে চেঁচায়।

আসনে বসিয়া সুশীলা বিব্রত বোধ করে। পাপের আশঙ্কায় ততটা

নয়, যতটা মাতব্বরদের অতিরিক্ত উৎসাহের জন্য। সে এদিক ওদিক তাকায়। কুন্তীকে খোঁজে।

সে ভিতরের কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রথমে তার কানে গেল হরিচরণের গঞ্জিকা-কর্কশ কণ্ঠস্বর। সে তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়া মাটির প্রদীপটা লইয়া গেল।

মিনিট খানেক পরে দেখা গেল ঘরের ভিতরটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার ওঠে—আগুন আগুন।

কুন্তীর শরীর আগে হইতেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তার উপর এই এক মাসের হাড়ভাঙা খাটুনি রাত জাগা। তেজ বলা সত্ত্বেও সে রাত্রে কিছু খাইত না। দিনে খাইত বেলা তৃতীয় প্রহর শেষ হইলে।

বিধবার হাতের কাজ শুচিশুদ্ধ মতন হয় তাই আজ সকাল হইতেই শ্রাদ্ধের সমস্ত কাজ সে নিজ হাতে করিয়াছে। শ্রাদ্ধের জায়গা ও বৃষোৎসর্গের বেদী গোবর দিয়া লেপিয়াছে, ফুল তুলিয়াছে, ভুজ্য সাজাইয়াছে। এ সব শেষ করিয়া গিয়াছিল নিমন্ত্রণের রান্নার ব্যবস্থা করিতে।

দীপ জ্বালার সময় তার মাথা ঘুরিয়া যায়, কাপড়ে আগুন লাগে। সে সংজ্ঞা হারায়। আগুন দেখিয়া প্রথম ছুটিয়া যায় তেজ। ভিতরে যাইয়া দেখে কুন্তীর কাপড় জ্বলিতেছে। উপুড় করা তেলের দীপটা পাশে পড়িয়া।

এক হাতে কুন্তীকে তুলিয়া আর এক হাত দিয়া সে তার কাপড় খানা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

ঠিক এই সময় কুন্তীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে, নিজের দেহের উপর চোখ পড়ায় সে লজ্জায় চোখ বোজে। পা দুখানি আপনা আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

বৈঠক হইতে কয়েকজন মাতব্বর ছুটিয়া আসিল। তেজের বাহু বেষ্টনীর মধ্যে নগ্ন কুন্তীকে দেখিয়া তাদের চোখে চোখে বিজলী খেলিয়া গেল। জ্বলন্ত কাপড় নিভাইবার তারা সময় পাইল না। যেমনটি গিয়াছিল, মহাপাতক দর্শনের ভয়ে তেমনই ক্ষিপ্রতার সহিত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুশীলাও আগুন দেখিয়াছিল। কিন্তু আসন ছাড়িয়া উঠিল না। শ্বশুরের শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়া হইতেছে, তিনি আসিয়াছেন পিণ্ড গ্রহণ করিতে, এই সময় তাদের কোন অমঙ্গল হইবে না এই তার বিশ্বাস। চোখ বুজিয়া সে ডাকে, বাবা বাবা।

একটু পরে চাহিয়া দেখে আগুন নিবিয়াছে। ও-ধারে তক্তাপোশের উপর জটলা চলিয়াছে—আগুনটা কিছু নয়, তেজুকে গ্রাস করার জন্য কুম্ভীর ছলা মাত্র। তার কামনা যেন জলন্ত জিহ্বা বাহির করিয়া দিয়াছিল। ঘর পোড়ে নাই খালি কেতুর পুণ্যফলে।

কেহ কেহ বলে, পোড়েনি তেজুর বৌ-এর জন্য। সতীলক্ষ্মী মেয়ে।

বৃষোৎসর্গ সারিয়া তেজ উঠিল বেলা তৃতীয় প্রহর হেলিয়া যাওয়ার পর। ও পাশের আটচালা ঘরে তখন নিমন্ত্রিতদের বৈঠক বসিয়াছে। পরিবেশন ঠিক মতন হয় না, নিনন্ত্রিতরা কলরব করে, তরকারি নিয়ে এসো, ডাল আর ভাজার পর আর কিছু পড়ে নি ।

ময়দা কোথায়? শুনেছিলুম ময়দা হবে। (এই অঞ্চলের লোকে লুচিকে বলে ময়দা) কথাগুলি তেজের কানে যাওয়ায় সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে কি অবধি দেওয়া হয়েছে?

সুশীলা বলিল, ভাজা, ডাল আর পালং চচ্চড়ি।

এবার বুঝি কপির তরকারি পড়বে?—বলিয়াই দু'হাতে তরকারির দুটা মেটে ভাঁড় তুলিয়া সে আবার প্রশ্ন করিল, নিশিদার বৌ আছে কেমন?

সুশীলা কোন উত্তর করে না।

তেজ বলিল, চুপ করে রইলে যে?

সুশীলা ধীরে ধীরে বলিল, সে চলে গেছে।

চলে গেছে! পোড়া হাত পা নিয়ে গেল কোথায়?

মাতব্বররা নাকি বলছিল, ও বাড়িতে থাকলে তারা খাবে না। সে কথা শুনে নিজে নিজেই চলে গেল।

তেজ গর্জন করিয়া উঠিল, যত সব বদমাস। যেত বেটারা, না খেয়েই

বেরিয়ে যেত—রাগে সে থর থর করিয়া কাঁপে। তার হাত হইতে পড়িয়া তরকারির একটা ভাঁড় ভাঙিয়া যায়। ঘরময় আলু কপি ছিটকাইয়া পড়ে, কিছুটা তরকারি পড়ে সুশীলার কাপড়ের উপর।

সে স্তব্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকে। তেজ বলে, তুমি—তুমি ত ছিলে। যেতে দিলে কেন বেচারীকে ?

ওদিকে নিমন্ত্রিতদের বৈঠক হইতে শব্দ আসে, তরকারি তরকারি।

তরকারি কি নেই ?

তা হ'লে ডালই নিয়ে এস।

তেজ—তেজু কোথায় ?

সন্ধ্যে হয়ে এল যে।

তেজ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আর একটা তরকারির ভাঁড় তুলিয়া হাঁকিয়া কহিল, যাচ্ছি ধনঞ্জয় কাকা।

সত্তর

কুন্তীর আগুনে পোড়া পা ও পিঠ যেন জ্বলিয়া যায়। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। তেজের ঘরের বারান্দায় শুইয়া সে ধীরে ধীরে কাতরায়, উঃ উঃ—

মায়ের দেখাদেখি নীলুও সহানুভূতিবশে উঃ উঃ করিতেছিল। একটু আগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শ্রাদ্ধ বাসরের একপাশে মাতব্বররা বসিয়া, মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। সমাজ রসাতলে গেল। কলিকাতার রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া এই মেয়েটা যেন মালঙ্গী জলঙ্গীর জীবন্ত অভিশাপ। নিশি কী মূর্তিমতী সর্বনাশকেই না আনিয়াছে।

তারা মামলা মোকদ্দমা ভোলে, ভোলে ডিক্রি মালক্রোক। বৈদ্যনাথ ও মেঘনাদকে আজ ক্ষমা করে। তাদের সমস্ত আক্রোশ যাইয়া পড়ে এই হতভাগিনীর উপর।

মেয়েরা আরও হিংস্র, আরও নিষ্ঠুর। কুন্তীকে শুনাইয়া শুনাইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া তারা জটলা করে। পান সাজিতে সাজিতে একজন

বলিল, নিজের পাপে সোয়ামী হারিয়েছে, এ বাড়ির বুড়োও গেল ওর জন্য।

উপেনের স্ত্রী কঙ্কা হাসিয়া বলিল, ওদের আবার সোয়ামী। মা মেয়ে দুটোই ত পেশাগর।

সব কথাই কুন্তীর কানে যায়। সব চেয়ে দুঃসহ ঠেকে তার মায়ের সম্পর্কে এই ইঙ্গিত। ভাবে, এর আগে সে মরিল না কেন?

কঙ্কা আবার বলিল, বাড়িটাই পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত, রক্ষে পেয়েছে সুশীলার পুণ্যের জোরে।

ঘর ত রক্ষে হল। কিন্তু সোয়ামী নিয়ে সংসার করতে পারবে কি? ঘরে যে রসবতীকে ঠাঁই দিয়েছে—বলিল জনার্দনের স্ত্রী।

আর একজন কহিল, ওদের কথা ওরা বুঝবে। আমরা কিন্তু আর এখানে জলস্পর্শ করব না।

রেবতীর মেয়ে বাসী বলিল, কিন্তু পোড়া হাত পা নিয়ে বেচারীই বা যায় কোথায়?

জনার্দনের স্ত্রী বলিল, তোর ত দেখছি ভারি দরদ।

কঙ্কা কহিল, ওর দরদ হবে না ত হবে কার?

বাসী বালবিধবা, মাতৃপিতৃহীনা। থাকে গরিব ভাইয়ের সংসারে। গ্রামে তার সম্পর্কেও দুর্নাম আছে। সে তাই চুপ করিয়া যায়।

এবার জনার্দনের স্ত্রী বলিল, আয় বউটোকে বলে দি যে ও থাকলে আমরা এখানে জলস্পর্শ করব না।

তাকে সমর্থন করে দু' তিনজন।

তারা আসিয়া পড়ার আগেই কুন্তী চলিয়া যাইতে চায়। ছেলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলে, চ, এ বাড়ি থেকে যাই। পারবি যেতে?

নীলু বলিল, পালব।

কুন্তী তার হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়ে। সে আসিয়াছিল একবস্ত্রে, কেতু তাকে একখানা কাপড় দেয়, নীলুকে একটা জামা। সেগুলি ছিল ঘরের মধ্যে, তাহা আর নেওয়া হইল না। একবস্ত্রে নগ্ন নীলুকে লইয়া খোঁড়াইতে

খোঁড়াইতে সে উঠানে নামিল। দেখিল অনেকে কিন্তু ভান করিল না দেখার।

উঠানের একপাশে পথ আর একধারে ভিয়েন। সেখান হইতে লুচি ভাজার গন্ধ আসে, পাশেই দেখা যায় বারকোশ ভরতি জিলিপি। নীলু ঐ দিকে হাত বাড়াইয়া বলে, আমি খাব।

কুন্তী পোড়া হাতের পিঠ দিয়া তার চোখ ঢাকিয়া আরও জোরে চলে। নীলু কাঁদে,—মিত্তু, মিত্তু খাব তিলিপি।

কেতুর বাড়ির নিচে বাঁশঝাড়। তারপর একটু যাইয়াই শীতলার ভিটা। এখানে বছরে একবার শীতলা পূজা হয়। বসন্তের প্রকোপ হইলে কোন কোন বৎসরে দুইবার।

একটা বটগাছের নিচে কতগুলি শীতলা প্রতিমা। অন্য দেবদেবীর মূর্তিও আছে। পূজান্তে যে সকল বিগ্রহের বিসর্জন হয় না লোকে সেগুলি এখানে রাখিয়া যায়। কোনও মূর্তির মাটি ও খড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কোনখানার হাত পা ভাঙা। দু' একখানা আছে সম্পূর্ণ অবিকৃত।

পুব মালঙ্গীতে যাওয়ার পথ এই ভিটার উপর দিয়া। পাছে কারও চোখে পড়ে এই ভয়ে কুন্তী আশশেওড়া ও মনসা সিজের একটা ঝোপের আড়ালে যাইয়া আঁচল পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

ডানধারে পিয়ালি ফুলের ঝাড়। পড়ন্ত রোদের মিঠা আলো পড়িয়াছে হলদে ফুলের উপর। কয়েকটা প্রজাপতি বসিয়াছে, কুন্তী অন্যমনস্কভাবে ঐদিকে চাহিয়াছিল। নীলু বলিল, দে মা, ধলে দে।

সে কথা কুন্তীর কানে যায় না।

সন্ধ্যার কিছু আগে নিমন্ত্রিতের দল তেজের বাড়ি হইতে ফিরিতে লাগিল। কারও কোলে ছেলে, কারও হাতে ছাঁদা। তারা চলিয়াছে নিমন্ত্রণ বাড়ির গল্প করিতে করিতে। কার পাতে চারখানার বদলে তিনখানা লুচি পড়িয়াছে, কে চাহিয়াও দ্বিতীয়বার জিলিপি পায় নাই এই সব অভিযোগ। একজন কহিল, লুচি আর কপির ডালনা খাওয়ালেই কী ভদ্দর হওয়া যায়। ছোটলোকের রক্তের ধারা যাবে কোথায়?

লোকটি তেজের স্বজাতীয় এবং ক্ষেত্রিদলের একজন পাণ্ডা।

একটু পরে কুন্তীর কানে গেল, জানিস ও-ঘরে আগুন লাগিয়েছে কে?

কে রে?—অপর একজন প্রশ্ন করে।

আর কে? নিশির বৌ। যাতে তাড়াতাড়ি তেজুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেইজন্য—কথাটা প্রথমে যে তুলিয়াছিল তার কণ্ঠস্বর।

অপর একজন কহিল, তবু সইল না মাগীর! তেজ ত একদিন ওরই হত। অমন যার চেহারা তাকে দেখে একটা যুবো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে কদিন?

কেতুর বাড়ি ছাড়িয়াও উদ্ধার নাই। লোকে কিছুতেই তাকে রেহাই দিবে না। আচ্ছা, সুশীলাও কি এই কথাই ভাবে? সে কি আসার সময় দেখে নাই? দেখিয়া থাকিলে তাকে ডাকিল না কেন? ছেলের হাতে একটু খাবার দিল না। হয়ত দেখে নাই, হয়ত বা দোষী মনে করিয়াছে। যে বরাত তার।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে একটু দূরে একটা শিয়াল আসিয়া দাঁড়ায়। হাঁ করিয়া তার দিকে চাহিয়া থাকে। কুন্তীর ভয় করে। সে নীলুকে আড়াল করিয়া বসে। অদূরে শোনা যায় কুকুরের চীৎকার। তারা খুব সম্ভব নিমন্ত্রণ বাড়ির এঁটো লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।

চীৎকার শুনিয়া শিয়ালটা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। কুন্তীর মনে পড়িল কলিকাতায় মন্বন্তরের দৃশ্য। ডাষ্টবিনের কাছে কুকুরগুলা খাবারের জন্য কামড়াকামড়ি করিত মানুষের সঙ্গে। তাদের কালিকাপুরের ফকির ঘোষ ত একটা কুকুরকেই কামড়াইয়া দিল।

কে যেন জুতা মাটিতে ঘষিয়া আসিতেছে। নমঃদের পুরোহিত গোকুল ঠাকুর না? মাথায় তারই মতন টাক। কুন্তীর একবার ইচ্ছা হইল তাকে ডাকিয়া বলে, নীলুর জন্য তোমার এ ছাঁদা থেকে দু'খানা লুচি দিয়ে যাও। কিন্তু ভয়ে ডাকে না। আজ সমস্ত মানুষ জাতিটাকেই তার ভয়।

রাত বাড়ে, নিস্তব্ধতাও বাড়ে। এতক্ষণ একটা বউ কথা কও ডাকিতেছিল, সেটাও আর ডাকে না। তার কানে আসে করুণ শব্দ—অভিশপ্ত ধরণীর চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

সে ভাবে, কি করিবে, যাইবে কোথায়? কূলকিনারা কিছুই পায় না। এই দুঃখ সাগরের যেন অন্ত নাই। কী নিষ্ঠুর এই দুনিয়া। কারও একটু দয়ামায়া নাই, না মানুষের, না প্রকৃতির!

বেশী রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিল নীলুর কান্নায়, সে তারস্বরে চেঁচায় আর পা চুলকায়। পা যেন ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। কুন্তীর ভয় করে হয়ত সাপে কামড়াইয়াছে, হয়ত বা বিছায়। ছেলের আর্তিতে তার বুক ফাটিয়া কান্না আসে। সে জিজ্ঞাসা করে, কিরে হ'ল কি?

নীলু জবাব দেয় না। মায়ের কোলে উঠিয়া তার কাপড় দিয়া পা ঘষে। কুন্তী কি যেন ভাবিয়া খানিকটা বালু তুলিয়া তার পায়ে ঘষিতে আরম্ভ করে। একটু পরে নীলু শান্ত হয়, কুন্তীও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। যাক্ আর কিছু নয়, ছেলেটাকে খুব সম্ভব শুঁয়াপোকায় কামড়াইয়াছিল।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া তার ভাগ্যে লেখা নাই। নীলু এবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল 'খিদে, খিদে' বলিয়া। কাঁদে, ভাত চায়, মিষ্টি চায়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্তির বশে শেষটায় ঘুমাইয়া পড়ে।

কুন্তীর আর ঘুম আসে না। সময় কাটে—দণ্ড, পল, প্রহর। মনে হয় এ রাত্রি আর শেষ হইবে না। শেষ হইলেই বা তার কি? কোথায় যাইবে? সুশীলাকে এ মুখ আর দেখাইতে পারিবে না। আর পাঁচজনের কাছে গেলে তারা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশী ভয় ভাবিনীকে। যেদিন মালঙ্গীতে আসে সেইদিন হইতেই এই ভীতির সূত্রপাত।

নববধূরূপে সে স্বামীর পাশে উঠানে দাঁড়াইয়া। পল্লীর মেয়েরা বধূরা আসিয়াছে বরবধূকে দেখিতে। তারা ডাকে, এসো ভাবি দি, বউ পরিচয় কর এসে।

কেহ বা ডাকে, খুড়ীমা, মাসীমা—যার সঙ্গে যা সম্পর্ক।

ভাবিনী ঘরের মধ্য হইতেই বলিল, হ্যাঁ, গয়না নিয়ে আসছি।

একটু পরে সে আসিল জলন্ত নুড়ো হাতে করিয়া। আর একটু হইলে হয়ত কুন্তীর মুখে ছেঁকা দিত, এই সময় নিশি ধমক দিয়া উঠিল, ছিঃ বৌদি।

সে দিন কুন্তী ভাবিয়াছিল তার জা পাগল। পাগল হইলে ভালই ছিল, সে সেবা করিত, শুশ্রূষা করিত। কিন্তু এ যেন সৃষ্টিছাড়া এক জীব, রাগিলে মানুষের মতন দেখায় না।

ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু কুন্তীর চোখে আলোর কোন রেখাই ধরা দেয় না। আশা আর আলো তার জীবন হইতে যেন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

আঠার

নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য কিছুদিন হইতেই গ্রামের লোকে কুন্তীকে দায়ী মনে করে। মামলা মকদ্দমা ডিক্রি মাল ক্রোক সবই ত তার জন্য। কেতুর শ্রাদ্ধের দিনের ঘটনার পর তারা আরও রাগিল। তার পক্ষে গ্রামে বাস করাই প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কাজের বিনিময়ে খাবার যদি বা জোটে কেহই তাকে বাড়িতে স্থান দিতে চায় না। বলে, ও পাপকে ঠাঁই দেওয়া সাপ পোষারই সামিল। এর এক কারণ তার রূপ। এত দুঃখের কষ্টের মধ্যেও পোড়া চেহারা এমন মলিন হয় না যাতে করিয়া লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া নেয়।

শিব বাঁড়ুয্যে নিজে ডাকিয়া আশ্রয় দিলেন কিন্তু তার কনিষ্ঠের ব্যবহার কুন্তীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সে তিন দিনও শিবচন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিতে পারিল না। সে চলিয়া আসার সময় তিনি একখানি কাপড় দিয়া কহিলেন, সাবধানে থেক'। আমি সবই বুঝতে পারছি মা।

কেতুর মৃত্যুর পর কেহ আর এমন করিয়া মা ডাকে নাই।

কুন্তী কি যেন মনে করিয়া একদিন আশ্রয়ের জন্য মেঘনাদের কাছে

যায়। সে এদিক ওদিক চাহিয়া তার গাল টিপিয়া দিয়া বলে, তুমি থাকবে, খুব ভাল কথা। আমি ত আর ভাবি নই যে তোমার দাম বুঝব না?

সেই হইতে কুন্তী আর তার কাছে যায় নাই।

দিন না-চলার মতই চলে। যে সব নোংরা কাজ, ভারী কাজ অপরকে দিয়া করান যায় না, করাইতে পারিলেও মোটা পয়সা দিতে হয় সেই সব কাজের জন্য ডাক পড়ে কুন্তীর। বিনিময়ে মা ও ছেলে দু'মুঠা ভাত পায়। কাজ না জুটিলে চলে উপবাস।

তারা থাকে লোকের গোশালে, ঢেঁকিশালে, কখনও বা পরিত্যক্ত জীর্ণ কোন দেবালয়ে। ভয় করে, সামান্য একটু শব্দেই বুক কাঁপিয়া ওঠে। কিন্তু উপায় কি?

সেদিন ছিল সদ্গোপবাড়ির সংক্রান্তির কাজ। আস্তাকুঁড় ঘাঁটিয়া বিরাট সংসারের বাসন মাজিতে মাজিতে দুপুর হইয়া গেল। সকলের খাওয়ার পর কুন্তী যখন খাইয়া ওঠে তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে মনে হইল—সূর্যাস্তের রক্তিমাভা—কিন্তু আকাশ জুড়িয়া লাল গোলার উপর দিয়া গোলা গড়াইয়া যায়।

সদ্গোপ গিন্নী বলিল, গোলাগুলোও ওদিক থেকেই আসছে। তোদের বাড়ি নয়ত ঢাল বাড়িতে আগুন লেগেছে।

ঢাল বাড়ি অর্থাৎ অভিরামদের বাড়ি।

কুন্তীর ভাবনা হয় তার স্বামীর ভিটা কি শেষটায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে? তার অবচেতন মনে তখনও হয়ত বিশ্বাস ছিল একদিন ঐ ভিটা নীলুরই হইবে।

লালে লালে আকাশ ছাওয়া অথচ ধোঁয়ার গন্ধ নাই, কোন কলরব নাই। শুধু সিঁদুরে মেঘ আর মেঘ, গাছপালা লতাপাতায়, টিনের চালে, ফুলে ফুলে তারই বর্ণচ্ছটা।

নীলু বলে, দেখ্ মা, দেখ্। কেমন লাল।

এত কষ্টের মধ্যেও কুন্তীর আনন্দ এই যে মাস তিনের মধ্যে ছেলের জিহ্বার জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। সে সুস্পষ্ট কথা বলিতে পারে এবং হয়ত উহা নিজেও বোঝে তাই অনর্গল বক বক করে। শুনিয়া কুন্তী অবাক হইয়া যায়।

শোঁ শোঁ শব্দে বৃষ্টির ধারা ছুটিয়া আসে, মনে হয় এক দল ঘোড়সওয়ার গাছপালা লতাপাতার উপর দিয়া উড়িয়া আসিতেছে। সদ্গোপ বাড়ি ছাড়াইয়া ঝাঁকটা পুবে ছুটিয়া গেল, বৃষ্টিতে ছাইয়া গেল সারা আকাশ। জলধারার কী ঘন বুনোট, মানুষের চাহনি উহা ভেদ করিতে পারে না। বর্ষণের সঙ্গে চলে বজ্র নির্ঘোষ, কুন্তীর বুক কাঁপে। নীলু কিন্তু খিল খিল করিয়া হাসে, এ যেন এক মস্ত মজা।

বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য কুন্তী ঘরের দাওয়ায় পা তুলিয়া দেওয়া মাত্রই গৃহকর্ত্রী বলিল, এ্যাঁ, কি করছিস তুই? নাম্ নাম্। তোর জন্য আমি আবার গোবর জল ছিটোতে পারব না।

কুন্তী কহিল, সে আমিই ছিটোব মা।

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তোর গোবর জলে এ বাড়ি শুদ্ধ্ হবে না। আমরা হনু সদ্গোপ।

কিন্তু আমার—আমার ধোয়া বাসন—

তোর ত ভারি আস্পদ্দা বেড়েছে। মুখে মুখে কথা। তোর ধোয়া বাসনে তুলসী চন্দন ছিটিয়ে তবে ঘরে তুলেছি।

কুন্তী ঘর হইতে নামিয়া আসে। ঐ বাড়িতেও আর অপেক্ষা করে না। আসিয়া দাঁড়ায় পথের ধারে একটা অশ্বথ গাছের নিচে। বৃষ্টির ছাট মাথায় মুখে গায়ে তীরের ফলার মতন বেঁধে। পায়ের তলায় জল জমে, পায়ের পাতা ছাড়াইয়া গোঁড়ালি ছাড়াইয়া উপরের দিকে ওঠে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা জল, মনে হয় রক্ত জমিয়া আসিতেছে।

মা ও ছেলে উভয়েই কাঁপিতেছিল, পাশেই একটা ব্যাঙ অবিশ্রান্ত ডাকে। কী কর্কশ ডাক! হঠাৎ একবার জোরে চীৎকার করিয়া সেটা থামিয়া গেল। শব্দটা মরণ মুহূর্তের শেষ কাতরানির মতন।

এঁ্যা, সাপে ব্যাঙটাকে গিলিয়া ফেলিল নাকি ? সাপ ! কুন্তী ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়। তার বুক ঢিপ ঢিপ করে।

বৃষ্টি থামে। জল ধারায় আকাশের পুঞ্জীভূত মালিন্য ধুইয়া গিয়াছে। উপরে ঝকঝকে নীল একখানা আয়না। এক কোণে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ, চার ধারে মেঘের লালচে বলয়, ঈষৎ হরিদ্রাভ।

আলোয় আলোয় চারদিক ভরিয়া যায়, পাশের ডোবায় ঝলমল করে ঠাণ্ডা আলো। নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ, শান্ত সুগম্ভীর।

কুন্তী আশ্রয়ের সন্ধানে চলে, শীতলা ভিটা, বংশীর আখড়া, জনার্দনের বাড়ির পাশের বাঁশঝাড় ও উপেনের উঠান পার হইয়া একেবারে বৈদ্যনাথের দালানের সামনে আসিয়া ওঠে। বৃষ্টি ধোয়া টকটকে লাল দেয়াল, সবুজ দরজা জানালা চাঁদের আলোয় আরও সুন্দর দেখায়। বাড়িটা বহুদিন অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। কিছুদিন আগে মহিম জীর্ণ সংস্কার করাইয়া জানালা দরজা গরাদে নূতন রং ধরাইয়াছে।

কুন্তী দালানটার দিকে চাহিয়া একটুক্ষণ কি ভাবে। মনে হয় বৈদ্যনাথের বুকে সে মূর্ছা গিয়াছিল এই ত সেদিন—বড় জোর সপ্তাহ খানেক আগে।

সে সিঁড়িতে যাইয়া বসিল, একেবারে দরজার পাল্লা ঘেঁষিয়া। কাপড় বিছাইয়া ঘুমন্ত ছেলেকে পাশেই শোয়াইল। তার দেহের ছোঁয়ায় পাল্লাটা খুলিয়া গেল, ভিতর হইতে আসিল ধূলি গন্ধ মিশানো গরম হাওয়ার একটা ঝাপটা।

চৌকাঠে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ বুজিয়া আসে, বাস্তব জগৎ যেন সামনে হইতে সরিয়া যায়। ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভাঙে একটা কুকুরের ডাক শুনিয়া—কুকুরটা তাদের তিলির বাচ্চা সোমালি। কোথায় যেন গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া একটা ছায়া দেখিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে।

কুন্তী তাকে বহুবার দেখিয়াছে, তার নামও জানে। সে ডাকিল, কিরে সোমালি, চেঁচাচ্ছিস কেন ? আমায় চিনিস না ?

সোমালি থামে না। আরও চেঁচায়, এক একবার সামনের কাঁঠাল গাছের দিকে রুখিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসে। কুন্তী চাহিয়া দেখে, গাছতলায় কালো এক মূর্তি। এ্যাঁ, বংশী বোষ্টম না? লোকটা কি সত্য সত্যই তার পিছু নিল?

সে কুন্তীকে দেখিলেই শিস দেয় আর মানিনী রাধার গান গায়। কিছুদিন আগে একবার তার আখড়ায় থাকারও প্রস্তাব করিয়াছিল। কুন্তী ক্রোধ প্রকাশ করায় সুর ধরে—

ক্রোধ করিল রাধা রঙ্গে
কানু মজিল আঁখি ভঙ্গে—

বংশীকে দেখা মাত্র সে ভিতরে আসিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। ভীতির কারণ এখানেও কম নয়। সে জানে এই বাড়িতে পেল্লাদী থাকে। তাকে দেখিলে হয়ত বঁটি হাতে ছুটিয়া আসিবে। তাই সোমালির চীৎকার থামার কিছু পরে সে বাহির হইয়া আসে। আবার বাড়িখানার দিকে তাকায়। নীলুকে বলে, জানিস এ বাড়ি কার? আমাদের রাজা-বাবুর, তিনি তোকে সারিয়ে তুলেছে, যমের হাত থেকে কেড়ে এনেছে।

তার মনে পড়ে বৈদ্যনাথের কথা। নীলুর জীবন তাঁরই দান। তার নিজের এই পরনের কাপড়খানাও তিনিই দিয়াছেন। বাবু কত ভাল মানুষ। তাকে কী ভালই না বাসিত। অমন চাহনি সে কাহারও চোখে দেখে নাই। হঠাৎ সে খেপিয়া গেল কেন?

নীলু, নীলু চন্দর।

কুন্তী মুখ ফিরাইয়া দেখে পিছনে তার ভাসুর দাঁড়াইয়া। তার হাতে একটা ঠোঙা।

জেঠাকে দেখিয়া নীলুর মুখে হাসি ফুটিল।

তোর জন্য এনেছি রে নীলু চন্দর। উপিনদা দুপুরে বামুনদের ফলার খাইয়েছে, রাত্তিরে হল কীর্তন। সেখান থেকে নিয়ে এলুম—বলিয়া হরিচরণ ভাইপোর দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়। নীলু তার প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। হরিচরণ ঠোঙার ভিতর হইতে মুড়ির

মোয়া ভাঙিয়া তার মুখে দেয়। তারপরে দেয় মালপোয়া। তার চোখ দিয়া স্নেহ যেন ঠিকরিয়া পড়ে। সে কুন্তীকে বলে, তুমিও একটু খাও মা।

কুন্তী বলিল, পরে খাব।

হরিচরণ বলিল, তোমাকে এখানে পাব মনে করি নি। কীর্তন ভাঙতে দুপুর রাত কেটে গেল। বাড়ি ফিরছি, পথে বংশীর সঙ্গে দেখা। সে বললে, তোমার ভাজ বড় লোকের মায়া এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। দেখ গে রায় বাড়ির রোয়াকে বসে আছে।

কথাটা কুন্তীর মুখের উপর যেন চাবুক মারিল। সে ভাসুরের দিকে মৌন দৃষ্টিতে তাকাইলে হরিচরণ আমতা আমতা করিয়া কহিল, আমি—আমি ও সব বিশ্বাস করি না।—বলিয়াই নীলুকে আদর করে, তার চোখে মুখে চুমা খায়।

খানিকক্ষণ পরে সে চলিয়া গেলে কুন্তী ঠোঙাটা খুলিয়া দেখিল গুড় মাখানো চিড়া-মুড়ি, মালপোয়া ও কতকগুলি কাটা ফল, নিচে কলাপাতায় ঢাকা ছোট্ট এক ভাঁড় দই।

ভাসুর নিজে হয়ত কিছু খায় নাই, সবই তাদের জন্য আনিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে খোঁজ করে, নিমন্ত্রণ বাড়ির খাবার পাইলেই তাদের দেয়। তবে স্ত্রীর ভয়ে বাড়ির কিছু দিতে ভরসা করে না।

প্রথম প্রথম কার্তিকও খোঁজ খবর করিত। ভাবিনী একদিন তাকে ডাকিয়া বলিল, খুব যে মজেছিস কেতো। তোর না সম্বন্ধ এসেছে শান্তি চৌকিদারের বোনের সঙ্গে? খবরটা সেইখানে পৌঁছে দিই তাহলে?

কার্তিক সেই হইতে কুন্তীকে এড়াইয়া চলে।

সন্ধ্যার সময় খাইয়াছে তাই সে ভাসুরের দেওয়া খাবার আর খাইল না। ছেলেকে সামান্য কিছু খাওয়াইয়া বাকী সব রাখিয়া দিল ভবিষ্যতের জন্য।

ভবিষ্যতে কবে আবার খাবার জুটিবে কে জানে?

উনিশ

কলিকাতায় একটানা দাঙ্গা চলিয়াছে। ঝড়ের মতন মাঝে মাঝে কিছুটা থমথমে ভাব হয় আবার একটা ঝাপটা আসে। কালীপূজার সময় ঐ রকম এক ঝাপটা আসিল, আগুন জ্বলিল শহরতলির পুব দিকটায়। অত্যাচারীর উল্লাস ও অত্যাচারিতের আর্তনাদে আকাশ যেন চিরিয়া যায়। রাত্রে পুব আকাশ বার বার লাল হইয়া ওঠে, রাস্তা কাঁপাইয়া দমকল ছোটে।

সারারাত ঘুম হয় নাই। জয়হিন্দ্ আর আল্লা হো-ও-ও ধ্বনির মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথ সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে বিবেকানন্দ রোড ও সার্কুলার রোডের মোড়ে বাজারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; উদ্দেশ্য সংবাদ সংগ্রহ। সে পুবমুখো যাইতেছিল, একটি লোক ডাকিয়া বলিল, ওপারে যাবেন না বাবু। কাল রাত্তিরেও বাজারের ভিতরে এসে খুন করে গেছে।

সার্কুলার রোডের দুপারেই জায়গায় জায়গায় ভিড়, দশ বিশজনের ছোট ছোট দল, যেন বারুদের স্তূপ, যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ হইতে পারে। একপাশে লালমুখো দুজন অফিসারের অধীনে বন্দুকধারী দশ বারটি গোর্খা সিপাই। তারা নিতান্ত নির্বিকার ভাবে বসিয়া, মনে হয় রাস্তার বাস ট্রাম গণিতেছে। মানুষ চলাচল খুবই কম, মাঝে মাঝে দু'চার খানা ট্রাম বাস যায়।

রিলিফ সমিতির গাড়ীতে পুলিস পাহারায় এক এক দল বাস্তুহারা যায়, কোন দল পশ্চিম হইতে পুবে, কোন দল পুব হইতে পশ্চিমে। তাদের চোখমুখ বিভীষিকা আর হতাশায় ভরা, যেন জীবনের সমস্ত প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে।

এই দৃশ্য বৈদ্যনাথকে ভারি পীড়া দেয়। তার মনে হয় আশাহীন এই অস্তিত্বের চেয়ে মানুষের দুঃখের আর কিছু নাই। মানুষগুলার জন্য তার যেমন করে দুঃখ তেমনি হয় লজ্জা। লজ্জা নিজের উপর, সমাজের উপর।

মানিকতলা পুলের দিক হইতে আগত একখানা রিলিফ গাড়ী রাস্তার মোড়ে কতগুলি লোককে রাখিয়া আবার ফিরিয়া পুব মুখো চলিল। তাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, দেখ, দেখ, পরশমুনির বাবু দাঁড়িয়ে আছে।

বৈদ্যনাথ মুখ ফিরাইয়া দেখে ভিড়ের মধ্যে পরশমুনি ষ্টেশনের সেই দম্পতী—স্বামীর কপালে ও বাহুতে রক্তমাখা নেকড়া জড়ানো। স্ত্রীর সঙ্গে আজও সে গাঁটছড়া বাঁধিয়াছে।

বৈদ্যনাথ তার দিকে চাহিবামাত্র প্রৌঢ় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, সারা-রাত আমাদের উন্টা ডাঙ্গায় হামলা হয়েছে। একটা দোকান ছিল মুদিখানার, বেটারা সেটা লুঠে নিয়ে গেল, আর তারই বাটখারা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিলে। কোন রকমে দু'জনে এক বস্তরে প্রাণ নিয়ে চলে এসেছি।

যাবেন কোথায় ?

কিছুই ঠিক করিনি। ওর কে একজন আছে, সুবাদে দাদা না কি হয়, পাথুরেঘাটায় থাকে। আপাততঃ তার বাড়ি গিয়ে উঠব ভাবছি। —একটু ভাবিয়া প্রৌঢ় আবার বলে, তিনি পরিবার নিয়েই আছে শুনেছি। এই অবস্থায়ও স্ত্রীর সম্পর্কে সদা সজাগ ভাবকে সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই দেখিয়া বৈদ্যনাথ মনে মনে হাসে।

প্রৌঢ় বৈদ্যনাথের ঠিকানা জানিয়া লইয়া বলিল, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করব। দেশী মানুষ আপনি।

বিদায় লওয়ার সময় বধূটি বৈদ্যনাথের দিকে চাহিয়া করজোড়ে বলিল, নমস্কার। ছোট্ট এই নমস্কারের মধ্যে সহায়হীনতার চেয়েও ফুটিয়া ওঠে একটা সপ্রতিভ ভাব। তারা চলিয়া গেলে বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সামনে দিয়া দলে দলে বাস্তহারার দল যায়। একটু পরে বাস ও ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়। দুই ধারের অপেক্ষমান ক্রুদ্ধ জনতার সংখ্যাও ক্ষীণ হইতে থাকে।

বেলা ১০টা আন্দাজ বৈদ্যনাথ কর্ণফুলীতে ফিরিয়া দেখে এই পটেরই

আর একদিক্। তাদের ঘরে একটি মুসলমান যুবা ও দুইটি শিশু—যেন ব্রোঞ্জে গড়া নিষ্প্রাণ তিনটি মূর্তি। পাশেই অমর ষ্টোভ জ্বালাইয়া পোচ তৈরি করে; একটা প্লেটে সেঁকা পাঁউরুটি, আর একটায় আলুর দম ও মিষ্টি। আর লক্ষ্য করে বোর্ডিংময় অমরের বিরুদ্ধে উত্তেজনা। ব্রজ মাষ্টার বলিল, আপনার রুমমেট আস্ত পাগল। কোত্থেকে জঞ্জাল এনে জুটিয়েছে।

সুধাংশু বলিল, পাগল নয়, শখ হয়েছে মহামানব সাজার।

ব্রজ মাষ্টার বলিল, আদর্শবাদ আমাদেরও কিছু কম নেই, বৈদ্যনাথবাবু। কিন্তু নোয়াখালিতে যখন হিন্দু নিধন চলছে তখন কিনা ওদের আশ্রয় দেওয়া!

অথচ কিছুদিন আগে অমর নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া মুসলমান পল্লী হইতে যখন গুটিকয়েক হিন্দুকে উদ্ধার করিয়া আনে তখন এই ব্রজই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য সে সময়ও বিপন্নদের দুটা পয়সা দিয়া কেহ সাহায্য করে নাই। কর্ণফুলীর মালিক অন্য বোর্ডারদের কাছে যে চার্জ নেয়, বিপন্ন সমধর্মীদের জন্য অমর ও বৈদ্যনাথের নিকট হইতে সেই চার্জই নিয়াছিল। অথচ পল্লীর হিন্দুদের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইত, এইত ক'দিন ধরে আট দশটা লোককে খাওয়াচ্ছি। ড্যুটি আছে ত—হিন্দুর প্রতি হিন্দুর ড্যুটি।

আজ বৈদ্যনাথদের কাছে বড় হইয়া উঠিল আশ্রিত মুসলমান শিশু দুটির ও তাদের বাবার নিরাপত্তার প্রশ্ন। হোটেলের এই অবস্থা, পাড়ার লোকে টের পাইলে হতভাগ্যদের আর রক্ষা করা যাইবে না। সে তাই সারাদিন বাহির হইল না। আর অমর তৈরি ছিল শাণিত কুকরী লইয়া।

সন্ধ্যার একটু পরে তারা আশ্রিতদের রাজাবাজারের মোড়ে পৌঁছাইয়া দেয়। সেখানে একদল মুসলমান তাদের আক্রমণ করে, ঐ দলে ছিল হিন্দুপ্রধান পল্লী হইতে সদ্য বিতাড়িত তিনটি মুসলমান। একজন ছোরা লইয়া বৈদ্যনাথের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাকে রক্ষা করে কর্ণফুলীতে আশ্রয়প্রাপ্ত যুবকটি।

ফেরার পথে বৈগুনাথ অমরকে জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি কে ?

আমাদের আপিসের দপ্তরি আফজল। কিছুদিন আগে ওর বিবি মারা গেছে। বেচারী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

বৈগুনাথ একদিনে কত দৃশুই না দেখিল—বাস্তুহারার করুণ মূর্ত, জাতির দুর্দশায় গোরা অফিসারের চোখে মুখে চাপা উল্লাস, ব্রজদের ভণ্ডামি, আবার সেই চোখেই দেখিল অমরকে আফজলকে। তারা তার মনের তমিস্রাময় হতাশাকে মুছিয়া দিল।

রাত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে অমর কহিল, কলকাতা, নোয়াখালি, বেহার যেমন সত্য, তেমনি সত্য 'অ' দ্বীপ।

কি রকম ?—বৈগুনাথ প্রশ্ন করে।

শোনেন নি 'অ' দ্বীপের কথা ? সেখানে হিঁদু-মুসলমান চাষী ভাইয়ের মতন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লাটদারের সঙ্গে লড়ছে।

লাটদার কি বৈগুনাথ জানিত না। অমর বুঝাইয়া দিল, সুন্দরবন অঞ্চলের বড় বড় প্লটের মালিকদের বলে লাটদার। জমিদারেরই মতন।

বৈগুনাথ বলিল, বেশত। এই লড়াই আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

দেখবেন ? আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

অমর মধ্যে মধ্যে কর্ণফুলীতে একটানা অনুপস্থিত থাকে। বাড়ি যায় না, কোথায় যে যায় কেহই জানে না। ব্যাপারটা বৈগুনাথের কাছে রহস্যময় মনে হইত। আজ বুঝিল তার অনুপস্থিতির কারণ এই কৃষক আন্দোলন। বৈগুনাথের তার উপর শ্রদ্ধা হইল। বলিল, নিয়ে যাবে তুমি ?

বেশ, ডাক আসুক তখন যেও।

পরস্পরকে তারা তুমি বলিল এই প্রথম।

সেই ডাক আসিল মাস দেড়েক পরে। অমর একদিন আপিস হইতে আসিয়া বলিল, ডাক এসেছে 'অ' দ্বীপ থেকে। যেতে হলে আজ রাত্রির মধ্যে তোমায় তৈরি হয়ে নিতে হবে।

তৈরি মানে কি ?

কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে নিজেকে যে রকম প্রস্তুত হয়ে নিতে হয়।

বৈদ্যনাথ কহিল, তৈরি আমি সব সময়। বাঁধন কিছু নেই, কেউ টানে না, আমায় বরং দূরেই ঠেলে দেয়।

সে কথায় কথায় প্রজাদের সঙ্গে তার বিরোধ, মামলা মোকদ্দমা, মহিমের নিষ্ফল নিষেধ, ডিক্রি মালক্রোক সব কিছুই বলিল। বাদ দিল শুধু কুন্তীর কথা।

অমর নীরবে সব শুনিল, তার দিকে একবার তাকাইলও না। খানিকক্ষণ পরে বলিল, কিষাণ আন্দোলন দেখা তোমারই দরকার—যদি অবশ্য দরদ দিয়ে দেখতে পার।

বৈদ্যনাথ কোন উত্তর করিল না।

অমর বলিল, তা পারবে। সে দরদ আছে তোমার। আচ্ছা হঠাৎ তুমি বদলে গিছলে কেন? প্রজা দরদী জমিদার থেকে একেবারে কাবলীওয়ালা।

বৈদ্যনাথ তথাপি নীরব।

বেশ, বাধা থাকলে ব'ল না।

বৈদ্যনাথ কহিল, বলব, তবে আজ নয়।

কুড়ি

পরদিন তাদের ট্রেন ছাড়িল বেলা ন' টায়। শহরতলির পরই লবণ হ্রদ—বিস্তীর্ণ জলরাশি, শুধু জল আর জল, দিক্‌চক্রবালের শেষে আকাশ ও জলে ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়াছে। কোথায়ও বা দু' একটা গ্রামের উঁচু উঁচু গাছ দেখা যায়। দূর হাতছানি দিয়া ডাকে।

লবণ হ্রদের পর গ্রাম, মাঠ ঘাট। কিছুদিন হইল ধানকাটা হইয়াছে, রোদে পোড়া ধানগাছের নাড়াগুলিকে মরচে পড়া তার কাঁটার মতন দেখায়। মাঝে মাঝে জলাভূমিতে বকের পাতি বসিয়া—নিবিড় নীলের নিচে শ্যাম ও হরিতের মাঝখানটায় শুভ্র কাশগুচ্ছের মতন।

ট্রেন ক্যানিং পৌছিল বেলা ১২টা আন্দাজ। ছোট্ট জায়গা কিন্তু গুরুত্ব

অনেক, সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল প্রথম ভাইসরয় ক্যানিং-এর নামানুষায়ী নাম।

নূতন শহর পত্তন ও সুন্দরবন আবাদের জন্য বিলাতী মূলধনে ক্যানিং কোম্পানী নামে এক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। সাহেবেরা অংশীদার, তারাই পরিচালক, তাদের কল্পনা ছিল এখানে দ্বিতীয় কলিকাতা গড়িয়া তুলিবে, উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু কোম্পানী আজ সুন্দরবনের জমিদারির মালিক।

দুইটি লোক প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছিল। একজনের বয়স সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ, গায়ের রং ধবধবে ফরসা, মাঝারি গড়ন, দেখিলেই মনে হয় ভাল মানুষ। ভূমিহীন চাষী সে নয়, মধ্যবিত্ত কৃষক। তবু আন্দোলনে নামিয়াছে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য। সে বলে, আজ না হতে পারি, দু'দিন পরে আমারও হয়ত ঐ দিনমজুরদের দলে নামতে হবে। অনেক ত দেখলাম।

তার সঙ্গীটি কৃশ, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায়, হাতপাগুলি শক্ত শক্ত, মনে হয় তার উপর দিয়া বহু ঝড় ঝঞ্ঝা গিয়াছে।

উভয়েই আগাইয়া আসিয়া অমরকে নমস্কার করিল। ফরসা লোকটি তার সঙ্গীর পরিচয় দিল, মহারাজ এই আমাদের ১নং হাতিয়ার।

অমর সরকারী আপিসে কাজ করে, তাই ওখানে তার আসল নাম গোপন আছে। সবাই ডাকে মহারাজ বলিয়া। বয়স্করা বলে খোকা মহারাজ।

সে নমস্কার করিয়া কহিল, ওঃ আপনি ১নং হাতিয়ার, আপনার কথা কলকাতায় বসেই শুনেছি, আগে উত্তর বঙ্গে কাজ করতেন না?

ফরসা লোকটি বলিল, হ্যাঁ, সমীরুদ্দিন আর অম্বুমাঝি ত ওর কোলেই মারা গেছে। অনেক লড়াই দেখেছে আমাদের হাতিয়ারদা।

নিজের এই প্রশংসায় হাতিয়ার সলজ্জভাবে হাত কচলায়।

অমর বলিল, কলকাতায় শুনলাম এখানকার অবস্থা খারাপ। ব্যাপার কি বলুন দেখি ভূতনাথবাবু?

ভূতনাথ অর্থাৎ ফরসা লোকটি এদিক ওদিক চাহিয়া উত্তর করিল, পরে বলব।

অমর বলিল, বেশ, আমার বন্ধুর পরিচয় দেই নি, ইনি একজন জমিদার।

এই পরিচয়ে বৈদ্যনাথের কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। জমিদার শুনিয়া ভূতনাথ অপ্রসন্ন হয়, পরক্ষণেই ভাবে, ছিঃ মহারাজদার বন্ধুকেও সন্দেহ।

নিকটেই ক্যানিং বন্দর। বন্দরের নিচে মাতলা নদী, নদীতীরে ছোট বড় মাঝারি দোকান। রোজ এখানে বাজার বসে, সপ্তাহে দু' দিন মেলে হাট। মনোরম জায়গা, দীর্ঘ দিন কলিকাতায় থাকার পর বিশাল নদী, ওপারের গাছের সারি, প্রকৃতির এই রূপের সঙ্গে বৈদ্যনাথ কেমন যেন অন্তরঙ্গতা বোধ করে।

ঘণ্টা দুই পরে প্রথম ভাঁটায় তাদের নৌকা ছাড়িল। হাল ধরে ভূতনাথ, হাতিয়ার দাঁড় টানে। দু'পারে সারি সারি খেজুর, তাল, সুপারি ও বাবলাগাছ। মাঝে মাঝে আগাছার লতা নানা আকারের তোরণ গড়িয়াছে। তোরণে তোরণে সবুজ, নীল, হলুদ কত রংয়ের ফুল, টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল। কোথায়ও নদীর পারে গৃহস্থের ঘর, গোশাল, ঢেঁকিশাল দেখা যায়। কোথায়ও বা গাছপালার পিছন হইতে ঘরের চালা উঁকি মারে।

কিছুক্ষণ পরে অমরও দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। এক একবার টান দেয় আর তার বাহুর গুলি ফুলিয়া ওঠে। বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করে, এ আবার শিখলে কবে?

অমর কহিল, শিক্ষা কলকাতার এক রোয়িং ক্লাবে। এখানে এলেই দাঁড় টানি।

ভূতনাথ হাসিয়া বলিল, মহারাজদা কিন্তু হালে যেতে নারাজ।

অমরও এই হাসিতে যোগ দেয়। বলে, এখানে প্রথমবার হালে গিয়ে

নিজেদের নৌকো ডুবিয়ে দিলুম। দ্বিতীয়বার গিয়ে পড়লুম আর এক নৌকোর উপর। সেখানাও ডুবুডুবু। তারাও মারমুখো হয়ে উঠল। শেষটায় রেহাই দিলে আমি একজন কৃষক কর্মী শুনে।

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, যাক্, গ্রামের খবর কি ভূতনাথবাবু?

শুনেছেন বোধ হয় ধান কেটে আমরা যার যার ঘরে এনেছি। লাটদারের গোলায় পৌছে দেই নি।

তারা বাধা দেয় নি?

কাটার সময় দেয় নি। এখন রোজই দু'জন একজন করে পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছে। পুলিস এসে আড্ডা গেড়েছে সেনেদের কাছারিতে।

মারধর?

এ ক'দিন মারে নি। তবে পরশু থেকে শুরু হয়েছে। পুলিসকে উস্কানি দিচ্ছে লাটদারের নায়েব গোমস্তারা। আর এক খবর, বড় বড় চাষীরা ঐ দলে গিয়ে ভিড়ছে।

অমর বলিল, তা ত যাবেই। ওদের স্বার্থ যে এক। যাক, আপনারা কি ঠিক করলেন?

আসামী ধরতে এলে বাধা দেব না। তবে লড়ব যদি ওরা ধানের গোলা ভাঙে, লুটতরাজ করে, মেয়েদের বে-ইজ্জত করে।

সে রকমও হয়েছে নাকি?

আমাদের গাঁয়ে হয়নি। হয়েছে দু' কোশ দূরে উমানাথে। সেখানে গোলা ভাঙা, ধান নিয়ে যাওয়া, গেরস্তর বাসন পত্তর ভাঙা, নিত্যিকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে আসামী না পেলে অত্যোচারটা চরমে ওঠে।

হুঁ—অমর শুধু একটা শব্দ করে। তার হাতের দাঁড় থামিয়া যায়।

অনেকক্ষণ কেহ আর কোন কথা বলে না। বেলা পড়িয়া আসে, জলের বুকে ঝলমল করে পড়ন্ত রোদের আলো। দাঁড়ের ঘায়ে আলো গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যায়। আবার নতুন আলোরেখার জন্ম হয়—নদীর বুকে চলে ভাঙ্গাগড়া। সৃষ্টির নাচন।

ভূতনাথ গান ধরে,—

নওজোয়ান
নওজোয়ান
শক্ত হাড়
টানরে দাঁড়
তুফান কাট্
কাটরে ঝড়
নওজোয়ান
কিসের ডর ?
পাগড়ি পর্
কৃপাণ ধর্
কিসের ভয়
সঙিন ধর্
বুকের পর্
রিপুর তোর
বুকের পর্।
জোরসে লড়্
কিসের ডর
নওজোয়ান
কাট তুফান

বীরের বাত
ঘুচবে রাত
কাটবে ঘোর
অমার ডোর
ওঠ্ রে বীর
সুগম্ভীর।
ওঠ রে ওঠ্—
তারার সনে
রবির সনে
ফুল্ল মনে
ছোট্‌রে ছোট্।
নওজোয়ান
নওজোয়ান
হান্‌রে বাণ
বজ্র হান্
রিপুর মাথায়
বজ্র হান্

শাণিত ফলার মতন ভূতনাথের গলা চড়ে—তার আঘাতে গোধূলির ম্লান ছায়া যেন খান খান হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে চারজনেই গান ধরিল—

নওজোয়ান
নওজোয়ান
হান্‌রে হান্
বজ্র হান্।

জলবাতাস উভয়ই অনুকূল থাকায় তারা রাত দুপুরের আগেই 'অ' দ্বীপে পৌঁছিল। নৌকা বাঁধিল এক'টা ঝোপের আড়ালে। চারটি নরমূর্তি অন্ধকারের গুহা ভেদ করিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া চলিল। কমিটির বাড়িতে নয়, আসিয়া উঠিল জীর্ণ পরিত্যক্ত একটা দালানে। ভূতনাথ কহিল, আজকাল কমিটি বসে এইখানে, এর নাম দিয়েছি মহারাজগড়।

অমর বলিল, আমার নামে ভাঙা বাড়ির নাম, ঠিকই হয়েছে। আপনাদের রসবোধ আছে বলতে হবে।

ভূতনাথ বলিল, কেমন আছেন আজকাল? এর মধ্যে আর বেদনা হয়নি ত?

না, তবে সারেও নি। গ্যাস্ট্রিক আলসার অপারেশন না করলে সারে না।

আজ প্রায় দেড় বছর অমর 'অ' দ্বীপের কৃষাণ সভার কাজ করে। প্রায়ই আসে। বছরখানেক আগে এখানে একবার আক্রান্ত হইয়াছিল। ভূতনাথরা বহু সেবা যত্ন করিয়া সারাইয়া তোলে।

সকালে তারা গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হয়। মস্ত গ্রাম, বাস বহু চাষীর। বেশীর ভাগই ভূমিহীন কৃষক, তারা ভাগে অপরের জমি চাষ করে। বীজ, বলদ মেহনত সবই তার কিন্তু ফসলের সে পায় অর্ধেক। সব ধানই তাকে মনিবের গোলায় তুলিয়া দিতে হয়। ভাগ হয় সেইখানে বসিয়া। যারা ভাগ-চাষও পায় না তাদের দারিদ্র্যের আর অবধি নাই। কৃষকশ্রেণীটাই গরিব। মলিন চোখমুখ, ছেঁড়া কাপড়, জীর্ণ কুঁড়ে সেই দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দেয়।

পাশেই লাটদারের কাছারি, বড় বড় ইমারত, দিঘি পুকুর, বাগিচা বেচারাদের যেন উপহাস করে।

লাটদাররা কোম্পানীর নিকট হইতে সুন্দর বনের প্লট ইজারা নিয়াছে। প্লটের মালিক, লোকে তাই বলে লাটদার। চাষীরা বছর বছর তাদের নিকট হইতে চাষের বন্দোবস্ত নেয়। লাটদারেরা ধনী, তারা থাকে

কলিকাতায়, জমিদারিতে আসে খুব কম। কচিৎ কখনও ফুর্তি করার জন্য আসে, বিষয় সম্পত্তি দেখার তাদের অবকাশ হয় না। প্রজা শাসন ও শোষণ করে গোমস্তাকে দিয়া।

আজ চাষী ও লাটদারের বিরোধ ফসলের ভাগ লইয়া। চাষীরা চায় বার আনা, লাটদারেরা আট আনার উপর এক কড়া বেশী দিতে রাজী নয়। বিরোধ এবার লড়াইয়ের পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে।

বৈদ্যনাথ ও ভূতনাথকে লইয়া অমর দরিদ্র পল্লীতে ঘুরিল, গেল বাড়ি বাড়ি।

অনেকেই পরিচিত। কেহ নমস্কার করে, কেহ কুশল প্রশ্ন করে। কেহ বলে, ক'দিন থাকবেন মহারাজ দা?

কৃষক আন্দোলনের জন্য কয়েকবার আসিয়া সে তাদের হৃদয় জয় করিয়াছে, বসিয়াছে মহারাজের আসনে। তার এই অভ্যর্থনায় বৈদ্যনাথ প্রীত হয়।

অমর এবার দেখে গ্রামের এক নূতন রূপ। চাষীর উঠান সোনায় সোনায় ছাওয়া। কাঁচা সোনা রোদে শুকায়, বুড়ীরা, কচি কচি ছেলে-মেয়েরা কঞ্চি বা গাছের ছোট ছোট ডাল হাতে করিয়া পাহারা দেয়। বুড়ীরা সেই সোনা হাতে করিয়া রগড়ায়, গালে চাপিয়া ধরে। তাদের ছেলে নাতিরা যে এই ফসল তুলিয়াছে, একী কম আনন্দের কথা?

গরু দিয়া ধান মলাই হয়, কেহ ধান সিদ্ধ করে, কেহ কুলায় করিয়া ঝাড়ে। গোশালে বাঁধা গাভী বলদও সতৃষ্ণ নয়নে ঐ দিকে তাকাইয়া থাকে।

'অ' দ্বীপের চাষীর এই প্রাচুর্য এক নূতন জিনিস। ক' দিন আগেও তারা আনন্দ উল্লাস করিয়াছে, কিন্তু পুলিসের ধর পাকড় শুরু হওয়ার পর হইতে সবই কেমন যেন নিষ্প্রাণ। লোকের চোখে মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কা।

জিতু সিকদার বয়স্ক চাষী, চাষীদের নেতৃস্থানীয়। তার বাড়িতে অমররা জল খাবার খাইতে বসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা এখন কি করি বলুন ত? আমরা অপিক্ষে করছি আপনার জন্য।

তবু ? নিজেরাও ত কিছু ঠিক করেছেন।

ওরা অত্যাচার করলে রুখে দাঁড়াব ঠিক করেছি।

এখানে কোন অত্যাচার হয়েছে ?

ধর পাকড় চলছে আর কিছু হয়নি। অত্যাচার চলছে দু' কোশ দূরে উমানাথে। চাষীর ধান নষ্ট করা, ডাকা মাত্তর আসামী হাজির না হলে তার ঘরের বাসন কোশন ভাঙা আরও অনেক কিছু।

এই সময় মিত্যুন নামে একটি কিশোর আসিয়া খবর দিল, আমাদের বাবুরা কলকাতা থেকে গুণ্ডা পাঠিয়েছে।

ভূতনাথ কহিল, এখানেও তাহ'লে হামলা শুরু হবে। গুণ্ডা এয়েছে কজন ?

জন দশ বার, তাগড়া তাগড়া চেহারা। তারা চেঁচাচ্ছে, লড়কে লেংগে।

ভূতনাথ কহিল, তাড়ি খেয়েছে বুঝি ?

তাদের জন্য কলকাতা থেকে সরাপ এসেছে, রাম না কি যেন বলে। সাহেবরা দৌড়ের ঘোড়াকে খাওয়ায়।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কাছারিতে বন্দুক আছে কটা ?

মিত্যুন কহিল, দারোয়ানদের কাছে আছে দুটো. আর পুলিসের দুটো। আমাদের লাটদার জঙ্গুলে মন্ত্রী হয়েছে, তানার হুকুম পুলিস ছাড়া আর কেউ যেন বন্দুক না ছোঁড়ে।

মন্ত্রী কিনা তাই আইন বাঁচিয়ে চলছে—মন্তব্য করিল অমর।

মিত্যুন এই জঙ্গুলে মন্ত্রীর কাছারির বরকন্দাজ; গোপনে কৃষাণ কমিটিকে খবর জোগায়। খবর দিয়াই সে দ্রুত চলিয়া গেল।

আরও অনেক বাড়ি ঘুরিয়া অমররা মহারাজগড়ে ফিরিল দুপুরের পর। সেখানে প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা ছিল, চাষীদের বাড়ি হইতেও দুধ দই ক্ষীর কলা পাটালি আসিয়াছে। অমররা কয়েক জায়গায় জলখাবার খাইয়াছিল, দুপুরের খাবারের আর সদ্ব্যবহার করিতে পারিল না। চাঁচিয়া মুছিয়া খাইল তাদের সঙ্গীরা।

খাওয়ার পর বসে বৈঠক। প্রতিরোধের সম্পর্কে পরামর্শ চলে। অনেকেই মতামত দেয়। অমর বৈগুনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি মত ভাই ?

বৈগুনাথ সকাল হইতে বিশেষ কোন কথা বলে নাই, চাষীদের হাবভাব লক্ষ্য করিতেছিল। এদের সে চেনে, ভালবাসে। এদের বহু সদগুণ লক্ষ্য করিয়াছে। এবার দেখিল চাষীদের সঙ্ঘশক্তি, উৎসাহ। এতে কোন চিড় নাই, ফাটল নাই। ইহাই তাদের হাতিয়ার আর চাষীদের বিশ্বাস এই অস্ত্রের সাহায্যে তারা জয়ী হইবে।

সে ভাবে, তার প্রজারা এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল না কেন ? বেশ হইত তাহা হইলে। কেতুর বাড়ির প্রতিরোধের খবর সে জানে না, সেইদিন সকালে দেশ ছাড়িয়াছে। আজ তার সমস্ত মন দেশের খবরের জন্য, চাষীদের জন্য আঁকুপাঁকু করে। অমর বলিল, ভাবছ কি ? জবাব দিচ্ছ না যে ?

বৈগুনাথ কহিল, এর একমাত্র জবাব রুখে দাঁড়ানো। তার সামনে অত্যাচারী শক্তি খান্ খান্ হয়ে যাবে—সাগরের ঢেউ লাখো লাখো বালুকণার উপর এসে যেমন ভেঙ্গে পড়ে।

সবাই সমর্থন করে, ঠিক ঠিক।

সন্ধ্যার সময় খবর আসিল কলিকাতা হইতে আগত গুণ্ডারা রামুমিয়ার নাক ভাঙিয়া দিয়াছে। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

তাকে আজ সকালে ধান চুরির অপরাধে গ্রেফতার করা হইয়াছে। অত্যাচার চলিতেছে স্বীকারোক্তির জন্য। তাদের বুদ্ধি যোগায় কে, তাদের আড্ডা কোথায়, বিরোধী পক্ষ এইসব জানিতে চায়।

খবর শুনিয়া একজন বলিয়া উঠিল, রাখ, আমরাও বেটাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।

বৈগুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, রামুমিয়ার জ্ঞান ফিরেছে ?

সংবাদদাতা কহিল, না।

ডাক্তার ডাকে নি ওরা ?

আবার ডাক্তারও? গুণ্ডাদের, একজন তবু বলেছিল। কাছারির গোমস্তা বললে, শালা মট্‌কা মেরে আছে, ওর মুখে মুতে দাও।

বৈদ্যনাথ বলিল, ব্রুট্‌।

রামুমিয়ার অজ্ঞান হওয়ার খবরের সঙ্গে সঙ্গে আরও খবর আসে লাটদারের লোকে আজ রাত্রে জিতু সিকদার ও সুকু পারিয়ালের বাড়ি হামলা করিবে। জোর হামলা।

স্থির হয় ভূতনাথ সুকুর বাড়িতে প্রতিরোধের নেতৃত্ব করিবে। জিতেন সিকদারের বাড়ির লড়াইর ভার থাকিবে হাতিয়ারের উপর।

চার দিকে লোক ছোটে, জোয়ানদের প্রতি নির্দেশ যায় কে কোথায় উপস্থিত থাকিবে, রিজার্ভ হিসাবে মহারাজগড়েই বা থাকিবে কারা।

একজন জিজ্ঞাসা করে, লাঠি বল্লম নিয়ে আসতে বলব, যে যা পারে?

অমর কহিল, তা ব'ল কিন্তু খুব দরকার না হ'লে যেন অস্তর চালায় না।

খুব দরকার বুঝব কি করে?

এবার উত্তর দিল ভূতনাথ—মেয়েদের ইজ্জত রক্ষার জন্য সব সময়ই অস্তর চালাবে, কারও পরোয়া করবে না। আর চালাবে নিজেরা অবস্থা বুঝে।

বৈদ্যনাথের ইচ্ছা সেও সংগ্রাম দেখে।

অমরের কাছে কথাটা তুলিলে সে বলিল, লড়াইয়ে যেতে ত আমারও ইচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি ধরা পড়ি তা হলে বিরোধী পক্ষ রটিয়ে দেবে, চাষীর এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এরা খেপেছে বাইরের লোকের উস্কানিতে। তাতে আন্দোলনের ক্ষতি হবে, আমাদের আদর্শেরও ক্ষতি হবে।

বৈদ্যনাথ বলিল, তুমি ত অনেক দেখেছ, লড়েছও অনেক। কিন্তু আমি—

তার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া ভূতনাথ শেষটায় বলিল, আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

অমর আর আপত্তি করিল না।

একুশ

'অ' দ্বীপ নিস্তব্ধ। মনে হয় সারা গ্রাম খানা ভয়ে অন্ধকারের গুহায় আত্মগোপন করিয়াছে। কী গভীর আর শীতল সেই অন্ধকার।

পারিয়াল বাড়িতে গাছ ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে কিষাণ-কর্মীরা অপেক্ষা করিতেছে। ভূতনাথের নির্দেশে সুকু ছিল ঘরের ভিতর, তার পাশে বৈদ্যনাথ।

মাঝখানে চট টাঙানো। ও পাশে সুকুর তরুণী স্ত্রী সাধনা শুইয়া, তার বুকের মধ্যে একটি শিশু স্তনের বোঁটা টানিতেছে, পিঠের কাছে আর একটি ঘুমাইয়া।

সাধনা রামু মিয়ার খবর জানিত, অমন জোয়ান মানুষটাকে মারিয়া ওরা অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। পুলিস তার স্বামীকে ধরিতে আসিতেছে শুনিয়া অবধি তার দুর্ভাবনার আর অন্ত ছিল না। সে ডাকে, হরি ঠাকুর আমার পিণ্টুর বাবাকে রক্ষা কর, অখন্তেরা ওর গায়ে যেন হাত না দেয়। আমি তোমায় হুট দেব—সাদা বাতাসার হুট।

সময় কাটে, রাত ১১টা, ১২টা, ১টা বাজিয়া যায়। বিরুদ্ধ পক্ষের সাড়া শব্দ না পাইয়া কর্মীদের আশঙ্কা হয় লাটদারের গোমস্তা ও পুলিস সম্ভবতঃ অন্য কোন জায়গায় হানা দিয়াছে। তারা হয়ত খবর পায় নাই, অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া কি বিপদেই না পড়িয়াছে।

আর এক ভয় মহারাজগড়ে পুলিসি হামলার। কিছুদিন হইল গ্রামের নিভৃত কোণে জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো বাড়িটায় তারা কিষাণ সভার আপিস খুলিয়াছে। কলিকাতার কর্মী অমরের নামে জায়গার নাম দিয়াছে মহারাজগড়। এখানে তাকে সবাই মহারাজদা বলিয়া ডাকে। সভার কাগজপত্র, নিশান, টাকাকড়ি এবং সামান্য কিছু লাঠিসোটা সবকিছুই মহারাজগড়ে থাকে। পুলিস আসিলে সে সব নষ্ট হইবে, অমর ধরা পড়িবে, ঝাঁকের মাছের মতন তারপর ধরা পড়িবে দলে দলে জোয়ান কৃষাণ-কর্মী।

ভূতনাথ জানে তাদের আন্দোলনের মৃত্যু নাই, কিন্তু এরকম দুর্ঘটনা

ঘটিলে আন্দোলন পিছাইয়া যাইবে। ঘরে ঘরে শুরু হইবে অনশন, অর্ধাশন। সে যেন ইহা কল্পনাও করিতে পারে না।

রাত্রি নিস্তব্ধ—পশুর ডাক, পাখীর কাকলি কিছুই শোনা যায় না। কানের কাছে শুধু মশা ভন্ ভন্ করে, গায়ে বসে। দূর শালা—বলিয়া কর্মীরা নিজের গায়ে চড় মাড়িয়া মশা তাড়ায়। কেহ কেহ বিড়ি টানে।

অদূরে জুতার মশ্ মশ শব্দ আর মানুষের কল কল ধ্বনি শুনিয়া ভূতনাথ বলিল, সবাই বিড়ি নিবিয়ে ফেল, জোরে মশা তাড়িও না। ওরা এসে পড়েছে।

ওরা কলকল করিতে করিতে সুকুর উঠানে আসিয়া উঠিল, ভূতনাথের গায়ে একজনের লুঙ্গির ছোঁয়া লাগিয়া গেল।

সুকু পারিয়াল হো ও—অন্ধকার বিদীর্ণকারী শব্দ হয়।

আর একজন লাঠি দিয়া বেড়ায় আঘাত করে। সুকু বলে, কে রে, বেড়ার উপর লাঠি মারে কে ?

থানাসে আইছি। হাম জিমাদার, সুকু পারি—

সুকু বাহির হইয়া আসে, একসঙ্গে তার মুখের উপর পড়ে তিন চারটা টর্চের আলো। চোখে ধাঁধা লাগে। পরক্ষণেই দেখে কালো কালো নরমুণ্ডে উঠানটা ছাইয়া গিয়াছে। সে বলিল, কি চাই তোমাদের ?

হাম জিমাদার আছে। তুম গিরিপতার—বলিয়া জমাদার সুকুর হাত ধরিল।

সে কহিল, গিরিপতার কেন ? ওয়ারিন আছে ?

জরুর। তুম চুরি কিয়েছ।

কি চুরি করলাম ?

ধান। ধান লিয়ে যাব, চোরাইমাল।

ধান নেওয়ার হুকুম কোথায় ?

অর্ডার দেগা হাম। হাম জিমাদার হ্যায়।

কাছারির হুকুম না থাকলে আমি কাউকে গোলার কাছে যেতে দেব না।

আলবৎ দিবে, তুমি চোট্টা হ্যায়।

ধান আমার নিজের, কোন শালার ধান আমি চুরি করি নি।

লাটদারের গোমস্তা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে বলিল, সেন বাবু দেশের জমিদার, তার উপর আবার মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁকে গাল দিলি।

তানাকে কিছু বলিনি। আমার ধান, আমি কেটে এনেছি।

ধান ত তাঁর।

তিন ভাগ আমার, একভাগ তানার।

দেখি কার ক' ভাগ—বলিয়া গোমস্তা স্বকুর ঘর ও ঢেঁকিশালের মাঝখানে ছোট্ট একটি মাড়াইয়ের উপর টর্চের আলো ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ দিকে তাকায়।

সেখানে মাথায় নীল ফিতা বাঁধা পাঁচ ছয়জন জোয়ান মরদ দাঁড়াইয়া-ছিল। লোকগুলা স্বকুর অচেনা। তার মনে হইল এরাই কলিকাতা হইতে আনীত গুণ্ডা। গুণ্ডারা দুইজন ধানের মড়াইর দিকে আগাইয়া যাইতেছিল; জমাদারের হাত ছাড়াইয়া স্বকু তাদের আগেই যাইয়া ধানের মড়াইয়ে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইল। একটা গুণ্ডা ঝাঁপাইয়া পড়িল তার উপর, সে এক লাথিতে তাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

ছোট্ট মানুষটি কিন্তু কী পরাক্রম স্বকুর যেন সিংহের বাচ্চা; শ্বাপদ পশুর মতন চোখদুটা অন্ধকারে জ্বলে, বড় বড় চুলগুলা কেশরের মতন দেখায়। একা পাঁচজনের সঙ্গে লড়ে' তার বুকের উপর দিয়া রক্তধারা গড়াইয়া যায়। উঠানের লোকগুলি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। ভূতনাথ ও তার সহকর্মীরাও দেখে। দেখে বৈদ্যনাথ।

মুহূর্তের জন্য জায়গাটায় বিরাজ করে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

গোমস্তা চীৎকার করিয়া উঠিল, একটা মানুষকে তোমরা ভয় করছ সর্দার?

ডর্, ডর্ কোন্ শালাকো—বলিয়া সর্দার ঘুরপাক খায়। তার লুঙ্গির নিচটা নাচনেওয়ালীর ঘাগরার মতন ঘোরে। সে আওয়াজ করে—কোঁকর কো—যেন প্রভাতের মোরগের ডাক। এক সঙ্গে

চার পাঁচটা মোরগ ডাকিলে যে রকম হয় তার চেয়েও জোরালো আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গেই সাত আটজন ডাকে, কোঁকর কো।

লোকটার নাম রোস্তাব, কালী পুকুরের বিখ্যাত গুণ্ডার দলের সর্দার সে। দলের আওয়াজ কোঁকর কো। সেই হইতে দলপতির নাম হইয়াছে মোরগ সর্দার। সে গোলার দিকে ছুটিয়া যায়। ছোরা হাতে করিয়া পিছু পিছু ছোটে তার সাকরেদরা। টর্চের আলোয় সেগুলি ঝলমল করে।

নিমেষের মধ্যে ভূতনাথের দল লম্বা লম্বা বাঁশ ও বল্লম হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাদের ঘিরিয়া ফেলিল। আরম্ভ হইল বিকট কলরব, গালাগালি, লাঠির ঠোকাঠুকি।

গোমস্তা চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দুক ছোঁড়ো জমাদার।

জমাদার আসিয়াছিল দুইটি মাত্র কনেষ্টবল লইয়া। গোলমালের মধ্যে তারা তিনজনেই কিছুটা পিছাইয়া গিয়াছিল।

গোমস্তা আবার বন্দুক ছোঁড়ার কথা বলিলে জমাদার বলিল, চিল্লাও মত। গোলি ছোঁড়নেকো হুকুম নেই হ্যায়।

আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কারণে বন্দুক ছোঁড়ার তাদের হুকুম ছিল না।

ঠিক এই সময় একজন কৃষাণকর্মী মোরগ সর্দারের পায়ে পা জড়াইয়া তাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল! এবারও শব্দ হইল কোঁকর কো। তবে আওয়াজটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত। গ্যাস বেলুনে ছেঁদা করিলে যে রকম ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ শব্দ হয় সেই রকম।

গোমস্তা এইরূপ বাধা পাওয়ার আশঙ্কা করে নাই। সে দেখিল অবস্থা মোটেই তাদের অনুকূল নয়। বাধার সম্মুখে পুলিস নিষ্ক্রিয়। সর্দারের পতনে গুণ্ডারা উৎসাহহীন। ওদিকে অপর পক্ষ হুঙ্কার ছাড়িতেছে। তার মনে হইল এখন সুকুকে নিয়া যাইতে পারিলেও কোন রকমে মান থাকে।

চাষীরা ধ্বনি করিতেছিল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সেই আওয়াজে সুকুর ছেলে পিণ্টুর ঘুম ভাঙ্গিল। বছর চারেক বয়সের শিশু, সেও 'ইনকিলাব' বলিতে বলিতে মায়ের অলক্ষ্যে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তার দেখাদেখি সকলে আরও জোরে আওয়াজ করে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

গোমস্তার মান রক্ষা করিল ভূতনাথ। বিনা বাধায়-ই সে সুকুকে পুলিসের সঙ্গে যাইতে দিল।

তারা চলিয়া গেলে সাধনা সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করিয়া ভূতনাথের সামনে আসিয়া কাদিতে কাঁদিতে বলিল, ওকে কেন যেতে দিলে তোমরা, কেন ছেড়ে দিলে? নিয়ে এস, তোমাদের পায়ে পড়ি।

ভূতনাথ নীরব।

ওকে যে মেরে ফেলবে ওরা, হাড়মাস গুঁড়িয়ে তুলোর বস্তার মতন করে দেবে।

ভূতনাথ কোন উত্তর করে না। সে জানে কথাটা সত্য কিন্তু আদর্শের সফলতার জন্য সুকুকে বিপদের মুখে ফেলিয়া দিতে হইল। আহুতি না হইলে যজ্ঞ যে সম্পূর্ণ হয় না, সফল হয় না।

পাহারা দিবার জন্য দুইজন কর্মীকে রাখিয়া ভূতনাথরা ফিরিয়া যায়। মহারাজগড়ে আসিয়া শোনে জিতেন শিকদারের বাড়িতে পুলিস শুধু তাকে নয় হাতিয়ার এবং প্রতুল লাহিড়ীকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। হাতিয়ারের নাক আর প্রতুলের বাঁ পায়ের পাঁচ পাঁচটা আঙুল ভাঙিয়াছে। আরও কয়েকজন সামান্য আহত অবস্থায় নিজ নিজ বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে।

হাতিয়ারদের জন্য সকলেরই মন খারাপ হইয়া যায়। হাতিয়ার নীরব নিঃস্বার্থ কর্মী, সাহসী পুরুষ। প্রতুল ছেলেমানুষ, তার এখনও পরীক্ষা হয় নাই বটে কিন্তু সেও উৎসাহী, ক্ষুরধার বুদ্ধি। লোকে তাকে দিয়া আশা করে অনেক কিছু।

ভোর ভোর সময় মিতুান খবর আনিল পুলিস হাতিয়ারদের থানায় চালান দিয়াছে, বেচারীরা সারা রাত এক মিনিটের জন্য চোখ বুজিতে

পারে নাই। চলিয়াছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কে কে তাদের দলে আছে, টাকা যোগায় কে, কলকাতার কেহ আসিয়াছে কি না। মধ্যে মধ্যে দাওয়াই অর্থাৎ প্রহার চলিয়াছে। পুলিসকে উস্কানি দিতেছে গোমস্তা।

একজন বলিয়া উঠিল, ওকে এমন শিক্ষা দেব যে শালা বাপের নাম ভুলে যাবে।

অমরও রাগিয়াছিল খুবই কিন্তু সে নিষেধ করিল। বলিল, ও বেচারা ত লাটদারের হাতের পুতুল, ওকে মেরে কি হবে?

তারা তার পরও কিছুদিন 'অ' দ্বীপে ছিল। তার মধ্যে পুলিস মাত্র দুইজন চাষীকে ধান চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করিল, তাও দিনের বেলায়।

রাত্রে কোন বাড়িতে হামলা হইল না, কেহ মার খাইল না।

বিরুদ্ধ পক্ষ গোলা ভাঙিয়া ধান বাজেয়াপ্ত করিল না। কিষাণের দল বিস্মিত হইয়া ভাবিল, ব্যাপার কি?

লাটদারদের হামলার ভয়ে কয়েকদিন ধান ভানা, ধান মলাই বন্ধ ছিল—আবার কাজ শুরু হইল।

উঠানে ধান মলাই হয়, বধূরা ধান সিদ্ধ করে, উঠানে বসিয়া, গাছের ডাল হাতে করিয়া বৃদ্ধারা, শিশুরা ধান পাহারা দেয়।

একদিন কলিকাতা হইতে কৃষাণ আন্দোলনের জয়ের খবর আসিল, সরকার তেভাগার অনুকূলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখন হইতে তারা ফসলের চার ভাগের তিন ভাগ পাইবে। নগরীর নেতারা নির্দেশ দিয়াছেন আন্দোলন যেন এখন বন্ধ থাকে। চিঠি শুনিয়া বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করে, এও ওদের কারসাজি নয় ত?

অমর বলিল, হবে।

* * * *

নদীর ঘাটে গ্রামের বহু চাষী সমবেত হইয়াছে অমরদের বিদায় দিতে। তাদের চাহনিতে আত্মীয় বিরহের কাতরতা। অনেকেই অনেক রকম খাবার লইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ লাউশাক ভালবাসে বলিয়া এক বৃদ্ধা তার গাছের শাক আনিয়াছে।

বুড়ী অত্যন্ত গরিব, কিন্তু বাবুরা তাদের জন্ম লড়াই করিতে আসিয়াছে শুনিয়া সে একদিন তাদের খাওয়ায়। নিজে রাঁধে, ডালে লাউশাক দেয়, উচ্ছে ভাজে, আর করে পেঁপের ডালনা। বৈদ্যনাথ বার দুই তিন ডালের শাক চাহিয়া নেয়। অমর বলিল, এত শাক নিয়ে ট্রেনে যেতে অসুবিধা হবে যে, মা। বৃদ্ধা কাতরভাবে বলিল, আমার শাক বড়লোকের ভোজে লাগবে না তা হ'লে?

নিশ্চয় লাগবে—বলিয়া বৈদ্যনাথ সাগ্রহে তার হাত হইতে লাউয়ের ডগাগুলি নেয়।

বৃদ্ধা সাশ্রু নয়নে আশীর্বাদ করে, তোমার ছেলে হোক, রাজার মতন ছেলে। বৈদ্যনাথ হাসিয়া বলিল, বিয়ে করি নি যে মা।

কর নি? যাও এবারই বিয়ে কর গিয়ে। যখন কার যা!

নৌকা ছাড়ার পরও চাষীরা বহুক্ষণ নদীর পারে দাঁড়াইয়া ছিল। নৌকা যতদূরে যায় মানুষগুলিকে ততই ছোট দেখায়। শেষ পর্যন্ত মনে হয় একটা বিন্দু—সেই বিন্দুও মিলাইয়া যায় অনন্ত নীলিমার বুকে।

নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলে, তলায় জলের শব্দ হয়। অমর দেখে প্রকৃতির সুষমা—উদার আকাশের তলায় চারধারের ঘন সবুজ রূপ। তার মন নৌকার তালে তালে নাচে।

বৈদ্যনাথ নীরবে বসিয়া। 'অ' দ্বীপ তার বুকে দোলা দিয়াছে। তার চাষীর সংগ্রামের মধ্যে সে দেখিয়াছে মানুষের নূতন রূপ—কী সাদাসিধা কৃত্রিমতাবর্জিত এই মানুষগুলো। কত নির্ভীক, একদিন সে এই শ্রেণীর উপর দয়া প্রদর্শন করিয়াছে—কিন্তু আজ তাদের দুঃখ তার দয়ার উদ্রেক করে নাই, করিয়াছে শ্রদ্ধাবুদ্ধির উদ্রেক। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে।

অমরও চুপ করিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করিল, কি ভাবছ বদ্দা?

ভাবছি চাষীদের কথা।

এদের ছেড়ে এসে আমারও মন ভাল নেই। এক একবার ওদের কথা ভাবি আর মুগ্ধ হয়ে যাই। মন 'অ' দ্বীপে টানে।

বৈদ্যনাথ বলিল, আমি ভাবছি মালঙ্গীর চাষীদের কথা। এতদিন তাদেরও হয়ত এই রকমই দুরবস্থা হয়েছে।

অমর বলিল, হ্যাঁ ভাবনার কথা বৈকি।

ছেলের কথা মনে পড়ায় বৈদ্যনাথের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া ওঠে। আগে অমরের কাছে আর সবই বলিয়াছিল, আজ বলিল কুন্তীর কথা, তার জীবনের উপর এই কৃষক বধূর প্রভাব, তার প্রতি নিজের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ। তার আকস্মিক পরিবর্তনের কারণও যে কুন্তী তাহাও জানাইল।

সব শুনিয়া অমর বলিল, মেয়েটার উপর তুমি অবিচার করেছ। সে তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলে নি। তোমায় নাচিয়েছে ঐ ভাবি।

তার তাতে লাভ ?

ওদের তুমি চেন না—যে তোমায় নাচিয়েছে সেই শ্রেণীর মেয়েদের।

আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি না।

সে হবে পরে। কলকাতায় ফিরেই প্রজাদের জন্য তুমি দেশে চলে যাও।

বৈদ্যনাথ বলিল, আমার প্রতি তোমার ঘৃণা হচ্ছে না ?

হ'লে প্রথম দিনই হত। মানুষ মানুষই ; অনেক ভাল কাজ তুমি করেছ আরও অনেক করবে। মাঝখানে যদি ভুল হয়ে থাকে সেও মানুষ বলেই হয়েছে। বাড়ি গিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি এর প্রতীকার কর।

বৈদ্যনাথ কহিল, প্রতীকার কতদূর হবে জানিনা। আমার নায়েব মেঘনাদ হয়ত এর মধ্যেই সবাইকে পথে বসিয়েছে, সে অতি সাঙ্ঘাতিক লোক, এখানকার গোমস্তারা তার কাছে ছেলে মানুষ।

সেইজন্যই তোমার আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

প্রজারা কি আর আমায় বিশ্বাস করবে ?

তা করবে বৈকি। ওরা মানুষ চেনে। সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিই হচ্ছে

ওদের ভাল মন্দ চিনে নেবার কষ্টিপাথর। তাই দিয়ে ঠিক বিচার করে নেবে।

বৈষ্ণনাথ আর কোন কথা বলিল না।

বাইশ

মালঙ্গীতে আবার কলেরা লাগে। প্রায়ই ধ্বনি ওঠে, বল হরি, হরিবোল।

রাত্রে কুন্তী হয়ত কোন পোড়ো নাটমন্দির, হয়ত বা কারও ঢেঁকিশালে ঘুমাইয়া আছে। ধ্বনি উঠিল, বল হরি, হরিবোল। নীলু মায়ের বুকের মধ্যে শুইয়াছিল, আকাশ বাতাস কাঁপানো হরি ধ্বনিতে ভয় পাইয়া সে ডাকিল, মা, মা, ঐ হরি আসছে।

কুন্তীর ঘুম ভাঙ্গিল। সে বলিল, কে, কে আসছে রে?

নীলু বলিল, হরিবোল আসছে।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার যেন কয়লা খনির অভ্যন্তরের নীরন্ধ্র তমিস্রা। ঐ আঁধার ভেদ করিয়া আওয়াজ আসে, বল হরি, হরিবোল। ঝরাপাতায় বাতাসের শব্দ হয়; মনে হয় কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছে। কুন্তী বলে, কে, কেরে?

নীলু কম্পিত কণ্ঠে বলে, হরিবোল মা।

নিজে ভয় পাইলেও কুন্তী ছেলেকে আশ্বাস দেয়, ভয় নেইরে।

হরিবোলের বিভীষিকা শুধু তাদের নয়, রাত্রে ঐ ধ্বনি শুনিলে সাহসী-জোয়ানরাও ভয় পায়।

মালঙ্গীতে এবার রোগীর সংখ্যা বেশী; আতঙ্কও বেশী। গ্রামে ঘটা করিয়া কালীপূজা হইল। ঢাকের বাদ্যে সারাগ্রাম মুখরিত হইল কিন্তু তুষ্ট হওয়া দূরের কথা ওলা দেবী যেন আরও কুপিত হইলেন। তার বলির সংখ্যা বাড়িল।

বিজয়া বলিল, হবে না? পূজো দিয়েছে কাঞ্জিলালকে দিয়ে। বেটা ঘোর নাস্তিক, বলে কিনা বামুন শুদ্দুর, রাজা জমিদার সব সমান। ছোঃ।

সন্ধ্যার পর গাঁজাক ও মাতাল ছাড়া কেহ ঘরের বাহির হয় না। 'বম্ বম্' 'কালী কালী' করিয়া তারা লোকের ভীতি আরও বাড়াইয়া দেয়।

কার্তিক একদিন ভর দুপুরে এক পোড়ো ভিটায় কলেরার দেবতার সাক্ষাৎ পাইল—এই দেবতা না পুরুষ, না স্ত্রী। কোন বয়স নাই, চেহারার বর্ণনা করা যায় না। সে পর দিনই কলেরায় মারা গেল। একবার ভয় পাইয়া যাদের অসুখ করে, তারা আর বাঁচে না।

কুন্তীও ভয় পাইল। এক দিন সন্ধ্যার পর সে জুজুর ভিটা দিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ কানে গেল, হিঃ হিঃ—। সে জোরে জোরে চলিতে লাগিল, তার মনে হইল কে যেন পাশের ঝোপ ঝাড়ের উপর দিয়া তার সমান তালে চলিতেছে। সে আর ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না। আপন মনে আওড়ায়, মধুসূদন, মধুসূদন। এক একবার কণ্ঠ জড়াইয়া যায়। নীলু বলে, কাকে ডাকছ মা?

ছেলের গলায় আওয়াজে মায়ের ভয় কিছুটা কমে। তাকে সে জোরে বুকে চাপিয়া ধরে।

ভিটার পরই উঁচু নিচু পথ, বাঁয়ে কচুরিপানায় ঢাকা এঁদো পুকুর। পথটা যাইয়া অভিরামের বাড়ির রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। পুব পশ্চিমে টানা রাস্তা, তার দক্ষিণে একটা নালা। নালার ওপারে অভিরামের ঘর হইতে আলোর ক্ষীণ রেখা আসিয়া পড়িয়াছে পথের উপর। কুন্তী সমস্ত প্রাণ দিয়া ঐ আলোটুকুকে অভিনন্দন জানাইল। ঐদিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

কিন্তু তার বিধিলিপির মতন অদৃশ্য আর একখানা হাত আলোটুকুকে নিভাইয়া দেয়। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়, আরও ভয়াল। ঠিক এইসময় একটা লোক কুন্তীর পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। ওঃ বাবা-বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিতেই আবার ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

ঘরের মধ্য হইতে তাকে অভয় দিল অভিরামের স্ত্রী—ভয় নেই। আমি আলো নিয়ে আসছি।

আলো নিয়া আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কিরে, কি হয়েছিল?

কুন্তী বলিল, কে যেন ছুটে গেল পাশ দিয়ে।

চিনতে পারলি না?

না।

অভিরামের স্ত্রী বলিল, তাহলে দেবতা টেবতাই হবে। বড় ভাবনার কথা ত। যে ডামাডোল পড়েছে।

কুন্তী কহিল, আজ রাত্তিরটা কোথায় থাকি বলতে পার?

তাইত। ছেলে নিয়ে এরাত্তিরে যাবিই বা কোথায়? আমাদের গোয়ালের একপাশেই থাক্। সেদিন সোনাটা মরে গেছে। কিন্তু দেখিস ভোরে উঠেই চলে যাবি, কেউ যেন টের না পায় যে তুই এখানে ছিলি।

তাদের একটা গাইর নাম ছিল সোনা।

কুন্তী ও নীলু সেই মৃতগাভীর ফাঁকা জায়গায় রাতটা কাটাইয়া দিল।

কুন্তী জানিত না যে গ্রামের লোক তাকে ওলার বাহন মনে করে। দেবতার বাহনের তবু ফুল কলা নৈবেদ্য জোটে কিন্তু সেই বাহন মানুষ হইলে তার অন্ন উঠিয়া যায়, আশ্রয় ওঠে।

সেদিনের ঘটনার পর গুজবটা আরও জোর রটিল। অসুখ না করায় কুন্তীর নিজেরও কেমন যেন বিশ্বাস জন্মিল, ওলাদেবী তার উপর ভর করিয়াছেন।

আগে তবু কিছু কাজকর্ম জুটিত, আশ্রয় মিলিত; এবার তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের মুখে মুখে রটিল, ওই গাঁময় বেয়াধি ছড়াচ্ছে।

নিজের ঘরবাড়ি আগেই গিয়াছিল, এবার বাহিরের আশ্রয়ও গেল। তার আশ্রয় হইল ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। গ্রামের লোকের করুণার উপর পশু পাখীর যতটুকু অধিকার থাকে কুন্তীর তাহাও আর রহিল না।

মালঙ্গীর কলেরার খবর কলিকাতার কাগজেও বাহির হয়। 'অ' দ্বীপ হইতে ফিরিয়া অমর পুরানো কাগজে ঐ সংবাদ পড়ে।

কলেরার প্রাদুর্ভাব

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত)

আজ মাসাবধি মিয়াপুর থানার জলঙ্গী মালঙ্গী শ্রীপুরে কলেরা লাগিয়াছে। এই অঞ্চলে চিকিৎসকের অভাব, পানীয় জলও দুর্লভ। লোকের নির্ভর একমাত্র মালঙ্গীর খালের উপর। এই সময় খালের জল অপেয় হইয়া যায়, উহা বরং রোগ বিস্তারেই সাহায্য করে। কিছুদিন আগেও গ্রামের জমিদার বৈদ্যনাথ বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন, রোগীদের পথ্য যোগাইতেন। তাঁর চিকিৎসা নৈপুণ্যে বহু রোগী রোগমুক্ত হইত।

আজ তিনি গ্রামে নাই। তাঁর অবর্তমানে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কলেরার টিকা ও চিকিৎসা এবং উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা না হইলে সমগ্র মিয়াপুর থানা শ্মশানে পরিণত হইবে। আমরা এই বিষয়ে সহৃদয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অমর পত্রিকাখানা বৈদ্যনাথের দিকে আগাইয়া দেয়। সংবাদটুকুর উপর চোখ বুলাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার চোখের উপর গ্রামের ছবি ভাসিয়া ওঠে, মালঙ্গীর খাল, মাঠঘাট, তালগাছে ঘেরা সুশীতল ছায়াঘন পুকুরপার। সেখানে মহামারী লাগিয়াছে, হয়ত নীলুর অসুখ করিয়াছে, হয়ত বা কুন্তীর।

নিজের অজ্ঞাতে বৈদ্যনাথের মুখদিয়া কাতর শব্দ বাহির হয়—উঃ।

সে স্থির করিল কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়া পরের দিনই দেশে ফিরিবে। কিন্তু সেই দিনই বৈকালে অমর আপিস হইতে অসুখ লইয়া ফিরিয়া আসিল—ক্ষত জন্য পেটে অসম্ভব বেদনা। তার নাকি মাঝে মাঝে এরকম হয়।

অবস্থা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বিব্রত হইয়া পড়ে। কি যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না।

অমর বলে, ব্যস্ত হয়ো না পেটে মাটির লেপ দিলেই কমে যাবে।

কি রকম ?

বেদনা হলেই গঙ্গামাটির প্রলেপ দেই। ডাক্তারি কবরেজীর চাইতে উপকার হয় অনেক বেশী। এ হ'ল গান্ধী মতে চিকিৎসা। আমি যদিও তাঁর পলিটিক্সের ভক্ত নই, তাঁর এই চিকিৎসার খুব পক্ষপাতী। ওকি, তুমি উঠলে কেন ? গঙ্গার মাটি আনতে ? তার দরকার নেই, বাড়িতে দাদাকে খবর দাও।

বৈদ্যনাথের নিকট খবর পাইয়া অমরের দাদা মাটি লইয়া আসিল। স্থূল বপু, গোল মুখ, বড় বড় চোখ, বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ হইবে। চেহারায় ও হাবভাবে অমরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে ঘরে ঢুকিয়াই ভাইকে বলে, বাড়ি চ'না। তোর বৌদি বলে দিলে। অমর উত্তর করিল, গেলে তার জন্যই যাব। তবে আজ নয়।

অমরের দাদা বৈদ্যনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, দেখলেন মশাই, দেখলেন ত ? বাড়িতে বাপ মা আছে, ভাই ভাইপো ভাইঝি আছে। তারা কেউ নয়, উনি বাড়ি যাবেন বৌদির জন্য। এতে স্বামীর জ্যেলাসি হতে পারে কিনা বলুন দেখি—বলিয়াই হাসিল। নির্মলের সেই হাসির মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিল স্বচ্ছ একখানা প্রাণ।

মাটির প্রলেপ দেওয়ার ফলে অমরের বেদনার কিছুটা উপশম হয় বটে কিন্তু শুরু হয় বমি ও রক্ত দাস্ত। সে বেশ কাবু হইয়া পড়ে।

বৈদ্যনাথ বলিল, তোমার পক্ষে বোধ করি বাড়ি গিয়ে থাকাই ভাল।

অমর বলিল, যাবও হয়ত।

বলিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার যাওয়া হইল না। সে ভুগিল দশবার দিন। বৈদ্যনাথ অক্লান্ত সেবা করিল আর সেবা করিলেন তার মা। ছেলের রোগের প্রকোপ একটু কমিলে কহিলেন, এবার থেকে বাউণ্ডুলে গিরি তোমার আর চলবে না। এইত কদিন ডুব মেরেছিলে।

অমর বলিল, তুমি বলতে পার বৈ কি, প্রতিবার অসুখ করলেই তোমার সেবা নেই। বেশ, এবার থেকে আর নেব না।

অমরের মা বৈদ্যনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, শুনলে, শুনলে ছেলের কথা! আমি কখন সেবার কথা বললুম?

তাদের কথা কাটাকাটিতে বৈদ্যনাথ মনে মনে আনন্দ অনুভব করে—নিজে চিরকাল মাতৃস্নেহে বঞ্চিত বলিয়া হয়ত একটু বেদনাও পায়।

একদিন আসিল অমরের বৌদি। স্বামীর মত স্থূল বপু, সাদাসিধা প্রকৃতি। সংসারী কাজে সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়, তার উপর একটি ছেলে পঙ্গু। আগে আসিতে পারে নাই বলিয়া সে দুঃখ করিল।

অমর কহিল, বছর বছর যারা মা হয় আর কোন কাজের তাদের সময় কোথায়?

লজ্জায় বধূটি মুখ ফিরাইয়া নেয়।

অমর কহিল, বৌদি আমার ভারি স্বার্থপর। আমায় বিয়ে দিয়ে খাটুনি কমাতে চায়।

বধূটি কহিল, আর উনি খুব ত্যাগী। পাছে ঝামেলা পোয়াতে হয় তাই সবাইকে ছেড়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন।

সময়টা এইরূপ লঘুচপল আলাপের মধ্য দিয়া কাটিয়া যায়। বধূটি বৈদ্যনাথকে তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিল, ঠাকুরপো সেরে উঠলেই আপনি দেশে যাবেন শুনেছি, তার আগে আমাদের ওখানে আর একবার হয়ে যাবেন। আমার বড় ছেলে প্রায়ই আপনার কথা বলে।

বৈদ্যনাথ কহিল, তাকে অন্ততঃ একবার না দেখে আমি কলকাতা ছাড়ব না।

বধূটি বলিল, ছেলে আমার ঐ রকম, কিন্তু ওকে ভালবাসে সবাই।

অমরের বাবা তার অসুখের প্রথম দিকটায় প্রায় প্রত্যহই আসিতেন। রোগ কমার সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত কমিতে লাগিল। সুবেশ, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, পাকা চুল দাড়ি এই গাম্ভীর্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কথা বলেন খুব কম, কাহাকেও বেশী কাছে টানেন না। কিন্তু দু'চার কথাতেই তাঁর দরদী প্রাণ ধরা পড়ে, বোঝা যায় মানুষকে ভালবাসিতে জানেন।

অমরের অসুখ কমিলে বৈদ্যনাথ একদিন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পরিবারের সবাই এত ভাল। তুমি বাড়ি ছাড়লে কেন বল দেখি?

ছাড়লুম বাবার সঙ্গে মতবিরোধের জন্য। তিনি সেকেলে সনাতনী, বাপ হিসাবে পাকা প্যাট্রিয়ার্ক।

বৈদ্যনাথ বলিল, তাঁকে দেখে ত খুব সদাশয় বলেই মনে হয়।

প্যাট্রিয়ার্কের সঙ্গে সদাশয়তার কোন বিরোধ নেই। বরং বুর্জোয়া প্যাট্রিয়ার্কের ও একটা লক্ষণ।

বাবাকে সদাশয় জেনেও বাড়ি ছেড়ে দিলে?

পারলুম না থাকতে। তাহলে শোন ব্যাপারটা। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর দিন, পূজো হয়ে গিয়েছে। বাবা বললেন, ঠাকুরের আশীর্বাদ নিতে। আমি বললুম, ওতে বিশ্বাস নেই। বাবা জিদ ধরলেন আমার বাড়িতে থাকতে হলে চলতে হবে আমার বিশ্বাস ও রুচি মাফিক।

আমি বললাম, বেশ আপনার বাড়িতে আছি বলে আজ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিচ্ছি, কিন্তু কালই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

বাবা বললেন, বেশ যেতে পার।

বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তখন তোমার বয়স?

ষোল সতর।

ঐ বয়সে বাড়ি ছাড়লে? তখন পড়াশুনো?

ক্লাস এইট অবধি। স্কুল ক্যারিয়ারে আমি বড়দের সমকক্ষ, রীতিমত ক্লাস প্রমোশন কোন দিনই পাইনি।

খরচা চলত কি করে?

প্রথমে রাস্তায় খবরের কাগজ ফেরি করতুম। সেখানে দেখলাম অবাঙ্গালী ছাতিরাম হাতিরামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তখন দাদার আপিসের ক্যান্টিনে ঢুকলাম 'বয়' হয়ে। বাবা এক সময় সেখানে সুপার ছিলেন। দাদাও ভাল মাইনেয় কাজ করে। আমি 'বয়' হয়ে ঢুকলে দাদার অসম্মান হবে, সে তাই আপত্তি করেছিল। বাবা তাকে

বললেন, অমর তার যোগ্যতা হিসাবে কাজ করবে, তাতে তোমার অসম্মান কিসের? এসব হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা।

বৈদ্যনাথ কহিল, ভারি যুক্তিবাদী ত।

হ্যাঁ, স্বচ্ছ বুদ্ধি কিন্তু ঠাকুর দেবতার বিষয়ে একেবারে অন্ধ।

অমর সারিয়া উঠিয়াছে, বৈদ্যনাথ পরের দিন দেশে যাইবে। আজ তার অমরের বাড়ি নিমন্ত্রণ। দু'জনে একসঙ্গে আসিয়াছে। অমর বলিল, তুমি খাবে পঞ্চ ব্যঞ্জন দই মিষ্টি আর আমি হিঞ্চে ডুমুরের ঝোল। আমার বড় হিংসে হচ্ছে বদ্যিনাথ।

তার বৌদি কহিল, অত্যাচার করার সময় মনে থাকে না? একসঙ্গে চারটে ডিম, আটখানা পেঁয়াজি।

বার মাস কি ধরাকাটে থাকা যায়, বিশেষতঃ এই বয়সে? তুমিই বল—অমর বৈদ্যনাথের দিকে চাহিয়া বলিল।

আহার্যের আয়োজন প্রচুর। মাছ, মাংস, মিষ্টিও অনেক রকম। বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, সীতাভোগ মিহিদানা কি বর্ধমান থেকে আনিয়েছেন?

অমরের বৌদি বলিল, না সবই মায়ের তৈরি।

বৈদ্যনাথ বলিল, ভারি খাসা হয়েছে ত।

অমরের মা বলিলেন, সুখ্যেতটা কিন্তু অমরের পাওনা। আমি ওর কাছে শিখেছি।

অমর কহিল, বাহাদুরি শিষ্যেরই বেশী। আমার শিখতে লেগেছে অনেক দিন। মা একবার দেখেই শিখেছেন।

প্রশংসা কার বেশী প্রাপ্য, মায়ের না ছেলের ইহা লইয়া হয়ত দীর্ঘ আলোচনা হইত, তার উপর ছেদ টানিয়া দিল অমরের বৌদি। সে বলিল, সুখ্যেতটা পাওনা ছিল আমার। আমি মাকে বললুম, এবার নামিয়ে ফেল, নইলে পাক কড়া হবে।

সকলে হাসিয়া ওঠে, এমন কি অমরের বড় ভাইপোটি পর্যন্ত।

কলিকাতা ছাড়িতে বৈদ্যনাথের কষ্ট হয়। কষ্ট অমর ও তার বড় ভাইপোটির জন্যই বেশী। ছেলেটির কোমরের নিচটা পক্ষাঘাত গ্রস্ত। হাতের আঙুলও বাঁকা, ডান হাত দিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। কোন এক জায়গায় বসাইয়া দিলে ঘটের মতন বসিয়া থাকে, নড়িতে পারে না। কথা বলে অস্পষ্ট। ভারি অসহায় জীব, অথচ দেখিলে মনে হয় বুদ্ধিমান, হয়ত বোঝেও সব। মাঝে মাঝে তার চোখে মুখে বেদনার ছাপ পড়ে। লোকের দিকে তখন করুণ চোখে তাকায়।

বৈদ্যনাথের মনে প্রশ্ন জাগে, ছেলেটির এই অবস্থার জন্য তার পিতা-মাতা দায়ী নয়ত? এই সম্পর্কে অমরকে সে প্রশ্নও করিয়াছিল। সে বলে, ও রকম হয়েছে টাইফয়েডের ফলে।

যাক্, ছেলেটা অন্ততঃ বাপমায়ের পাপের ফলে ভুগিতেছে না ভাবিয়া বৈদ্যনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

তেইশ

কুন্তী অনাথের বাড়ির উত্তরে জীর্ণ নাটমন্দিরের একপাশে শুইয়াছিল আর এক পাশে বাঁধা ছিল দুইটা ছাগল।

জায়গাটা নির্জন, পিছনে হাজামজা দিঘি, দু'পাশে জঙ্গল। শুধু দক্ষিণ দিকে রসি দুই দূরে অনাথের ঘর।

আজ তিন দিন কুন্তী এখানে শোয়, অনাথের ঘরের আলো নিবিলে আসে আবার ভোরে কাক ডাকার আগেই চলিয়া যায়।

সে ঘুমাইতেছিল; ছেলের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখে একটা লোক নামিয়া যাইতেছে। নীলু তখনও ডাকিতেছে, মা, মা।

তাকে কোলে তুলিয়া কুন্তী চীৎকার করিয়া উঠিল, চোর, চোর।

সে ডাক কারও কানে গেল না। তার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। সে ভাবে, লোকটা কেন আসিয়াছিল? কি মতলবে?

অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, তবে মনে হয়, মানুষটা মেঘনাদ ঠাকুর, পিছন হইতে দেখিতে অনেকটা তারই মতন।

কয়েকদিন আগে বংশীর আখড়ার ' ঙ্ক বোষ্টমী বলে, একজন লোকের কাছে থাকবি ?

কুন্তী জিজ্ঞাসা করে, খেতে দেবে ত দু'মুঠো, আমাকে আমার ছেলেকে ?

পঙ্ক কহিল, খালি খেতে ? সোনাদানায় সব্ব অঙ্গ মুড়ে দেবে।

পেটের জ্বালায় খাওয়ার কথাটা বলিয়াছিল বটে কিন্তু পঙ্কর প্রস্তাবের মর্ম বুঝিয়া কুন্তী সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা ফিরাইয়া নেয়। বলে, দরকার নেই আমার সোনাদানায়।

পঙ্ক বলে, তুই হলি হাড় বোকা, নইলে গাঁয়ের রাজরাণী হয়ে থাকতে পারতিস। আগে জমিদার পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল, এখন পড়তে চাইছে তার নায়েব।

কুন্তী বলে, তুমি চুপ কর, বোষ্টমী।

মানুষটি চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বাচ্চা ছাগলটা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া ওঠায় কুন্তী মনে খানিকটা বল পাইল। দুঃস্থ ও নিপীড়িতের ভরসার ধরনই এই। তুচ্ছকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে, টিকিয়াও থাকে তুচ্ছেরই উপর ভর করিয়া।

ছাগলটার উদ্দেশে সে বলিল, মানুষগুলা বড় পাজী। কি বলিস ?

ভ্যাঁ ভ্যাঁ—কুন্তীর কথার সমর্থনেই যেন ছাগল দুটা একসঙ্গে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া ওঠে।

সে রাত্রে তার আর ঘুম হয় না।

শুধু সেদিন নয়, এরপর রাত্রে চোখ বুজিলেই সে নানারূপ বিভীষিকা দেখিত, কখনও জাগ্রত অবস্থায়, কখনও বা স্বপ্নে ; দুঃস্বপ্ন নীলুকে দিয়া, নিজেকে দিয়া। তাই ছেলের হাতের সঙ্গে নিজের হাত বাঁধিয়া শুইত। রাত্রে মাথার কাছে একখানা ধারালো দা রাখিত। দিনে সেখানা লুকানো থাকিত পিয়ালি ফুলের জঙ্গলে।

দাখানা সে এক বাড়ি হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল।

সপ্তাহ দুই পরে। কুন্তী নাটমন্দিরে শুইয়া শুইয়া ককায়। আজ কয়দিন তার জ্বর। এই জ্বর গায়েই কাজের জন্য ঘুরিয়াছে। কাজ জোটে নাই, কাজের কোন খবরও পায় নাই।

ভাত, ভাত, খিদে—নীলু দিনরাত কাঁদে। শুকনা স্তনের বোঁটা টানিয়া টানিয়া কুন্তীকে বিব্রত করে। যখন আর সহ্য হয় না, কুন্তী তখন দুমদুম করিয়া কিলায়। পরক্ষণেই তার মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়।

সেদিন জ্বর বেশী, মাথার যাতনাও বেশী। তার উপর নূতন এক উপসর্গ, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এইরকম হইত, তার চেয়েও বেশী হইত তার বাবার। পেট চাপিয়া ধরিয়া সে কাতরাইত, উঃ নাড়ি-ভুঁড়ি সব যেন কুকুরে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

কুন্তীর বেদনা ঠিক সেইরকম। তার চোখের সামনে সব অন্ধকার হইয়া আসে। হঠাৎ মনে হয় কে যেন পাশে বসিয়া। সে বলে, কে? কে?

সামনের মূর্তি আরও কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একটু দুধ খাবে?

কুন্তী আধবোজা চোখে বলিল, কে তুমি?

যেই হই, তুমি একটু দুধ খাও দেখি—বলিয়া মানুষটি কুন্তীর মুখের সামনে দুধের বাটি তুলিয়া ধরে।

কী মিষ্টি গন্ধ! কুন্তীর সমস্ত সত্তায় উহা যেন একটা শিহরণ জাগায়। সে হাঁ করে। দুধ না যেন অমৃত, কয়েক ঢোক গিলিয়াই সে বলিল, আমার নীলুকে দাও।

নিশ্চয়। তুমি বড় কাহিল হয়ে পড়েছ, আমিই খাইয়ে দিচ্ছি। ওর হাত তোমার হাতের সঙ্গে বাঁধা দেখছি।

হ্যাঁ, আমি বেঁধে রাখি, কখন কি হয়।

তা ঠিক, যা দিন কাল পড়েছে। ঘোর কলি ত—বলিয়া লোকটি নীলুর হাত খুলিয়া তাকে যত্ন করিয়া খাওয়ায়।

নীলু চক্‌চক্ করিয়া খায়। কুন্তী জিজ্ঞাসা করে, কি খাওয়াচ্ছ ওকে?

পায়েস, ঠাকুরের ভোগ।

ঠাকুরের ভোগ! তুমি কে?

বংশী।

ওঃ, বড় বোষ্টম! কে পাঠিয়েছে তোমায়?

কে আবার পাঠাবে? পাঠিয়েছেন নাড়ুগোপাল।

কুন্তী পরম আশ্বাসের সঙ্গে কপালে যুক্ত কর ছোঁয়াইয়া বলে, দয়াল ঠাকুর।

বংশী বলিল, হরি তোমার সব দুসকু ঘোচাবেন। তানার নাম কর।

কুন্তী কহিল, আমায় তুমি একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পার?

তোমার অসুখ সারুক, তখন দেখব।

এদেশে থাকতে আর ইচ্ছে নেই, শ্বশুরের ভিটেয়ই যখন ঠাঁই হ'ল না।

ইচ্ছে হলে মহাকালীতে গিয়ে থাকতে পার রাধু গোঁসাইর আখড়ায়।

বংশী মহাকালীর আখড়ার এক রঙিন বর্ণনা দেয়। বলে, আখড়া না যেন বৃন্দাবন, মেলা ভক্ত থাকে, দিনরাত নাম হয়। আর চলে বোষ্টম বোষ্টমীর লীলা। গোঁসাইজীর কথা ছেড়েই দাও যেন গৌর নিতাইর অবতার।

কুন্তী জিজ্ঞাসা করিল, মহাকালী কত দূর?

সকালে নৌকায় উঠলে সন্ধ্যে সন্ধ্যি পৌছানো যায়। আমি তোমায় রেখে আসব।

বেশ ত, কবে নিয়ে যাবে?

আগে সেরে ওঠ। ততদিন জ্বর গায়ে এখানে পড়ে থেকে কাজ নেই। কে পথ্যি দেবে? তোমার নীলুকেই বা দেখবে কে?

কুন্তী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, কোথায় আর যাব? আমি যে বড় অনাথা।

যে ক'দিন সেরে না ওঠ আমার আখড়ায় গিয়ে থাকতে পার।

এই প্রস্তাব বংশী আগেও একবার করিয়াছে, কুন্তী সম্মত হয় নাই। আজ একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পঙ্ক নেই ত?

রাধে মাধব। সে কবে চলে গিয়েছে। বিদেশী মানুষ ত। আমরা একগুরুর চেলা কিনা তাই ওর বোষ্টম পটল তুললে এখানে এসে কিছুদিন ছিল।

সব কথা হয়ত কুন্তীর কানে যায় না। বংশীকে তার আজ বড় আপনার জন বলিয়া মনে হয়। সে কহিল, বেশ, সকালে উঠে যাব তোমার আখড়ায়।

বংশী সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, জয়, জয় রাধে। আমি নিয়ে যাব এসে।

এই উল্লাস অন্য মেয়ের হয়ত ভাল লাগিত না, কিন্তু কুন্তী সাদাসিধা মানুষ, উপরন্তু অসুস্থ, তার চোখে উহা বিসদৃশ ঠেকিল না। সে বলিল, না, দরকার নেই, আমি একাই যাব।

নীলু জিজ্ঞাসা করিল, ও কে মা?

কুন্তী কহিল, তোর মামা হয়।

নীলু বলে, মামা, পায়েসমামা।

বংশী তার গাল টিপিয়া দিয়া বলে, পায়েস মামা।

সে চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই মা ও ছেলে ঘুমাইয়া পড়ে। অনেকদিন পরে ভাল খাবার পাইয়া কুন্তীর গাঢ় ঘুম হয়। পরদিন ওঠে একটু বেলা করিয়া।

প্রথমে মনে হয় স্বপ্ন দেখিয়াছে। দুধ খাওয়া, বংশীর আগমন সবই স্বপ্ন! সে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, কাল কিছু খেয়েছিস?

নীলু বলে, হ্যাঁ, পায়েস।

এবার কুন্তীরও মনে পড়িল। সে কহিল, এ্যাঁ, তোর মনে আছে? ভারি সেয়ানা হয়েছিস তুই। হবিই ত, অমন বাপের ছেলে।

নীলুর কথাবার্তা ধরন ধারন এক এক সময় তার বাপের কথা মনে করাইয়া দেয়। কুন্তী তখন দুঃখ কষ্ট, ব্যথা-বেদনা অনেক কিছুই ভুলিয়া থাকে। মনে মনে হয়ত স্বপ্ন গড়ে রঙিন এক ভবিষ্যতের।

ছেলের চোখে মুখে জল দিয়া নীলুকে কোলে তুলিয়া বলিল, চ, তোর মামার আখড়ায়।

চলিতে কষ্ট হয়, সর্বাঙ্গে ব্যথা, মাথা যেন ছিঁড়িয়া যায়। পা আর চলে না। তবু সে পা ফেলে। কম্পি পদে নূতন আশ্রয়ের উদ্দেশে চলিতে থাকে।

বড় সাঁকো হইতে যে রাস্তাটা পুবমুখো গিয়াছে বংশীর আখড়া সেই রাস্তা হইতে কিছুটা দূরে। কাছে কোন গৃহস্থের বসতি নাই, দু'ধারে দুটা প'ড়ো জংলা ভিটা।

আখড়ায় ছোট ছোট দুখানি ঘর, দুখানারই চালায় সোনালি শণের ছাউনি, আলকাতরা মাখানো দরমার বেড়া। চৌকাঠের মধ্যে দরজা বসানো।

এক ঘরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ থাকে, অপর খানায় থাকে বংশী। বছর খানেক আগে আখড়ার অবস্থা ছিল শোচনীয়। একখানা মাত্র খড়ের চালা, তাতেও খড় থাকিত না। দরজার বদলে ছিল হোগলার ঝাঁপ। বংশী বলিত, আমার ঠাকুর সিংহাসনে শুয়ে শুয়েই সূয্যির মুখ দেখে, আলো বাতাস পায়।

এই পরিবর্তনের কারণ মেঘনাদ। তার কৃপায় বংশীর ভাগ্য ফিরিয়াছে। সে আজকাল মেঘনাদের কাজ করে। কাজ নানারকম, তার ধান, চাল ও সুদ আদায়, তার হইয়া দল গঠন।

মেঘনাদের কৃপার একটা ইতিহাস আছে। সে সদরে যাওয়ার জন্য রওনা হইয়াছে, খালঘাটে সাঁকোর নিচে নৌকা বাঁধা। কিন্তু খাল পর্যন্ত আসার আগেই ঝড়বৃষ্টি নামে। সে ছুটিয়া বংশীর আখড়ায় আসিয়া আশ্রয় নেয়।

একে জমিদারের নায়েব, তায় ব্রাহ্মণ। উপরন্তু বংশীর নামেও ডিক্রি ছিল। সে মেঘনাদকে খুব খাতির করে, চা করিয়া খাওয়ায়, সঙ্গে দেয় নারিকেলের নাড়ু।

মেঘনাদ বলিল, যে কাজে যাচ্ছি তাতে সুরাহা হলে তোমার ঠাকুরকে সোনার গয়না গড়িয়ে দেব, বংশী।

সেই কাজে সে আশাতীত ভাবে সফল হয়, এবং ঐ হইতেই তার সৌভাগ্যের সূত্রপাত। ধুলার মুঠা ধরিলে সোনা হইয়া যায়।

তার ধারণা বংশীর নাড়ুগোপাল জাগ্রৎ দেবতা। ঠাকুরকে সে শুধু সোনার গহনাই দেয় নাই, আখড়ায় নতুন দুইখানা ঘর তুলিয়া দিয়াছে। ঠাকুরের চন্দন কাঠের সিংহাসন, তোশক গদি ও নেটের মশারি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মালপোয়া ও পায়েসের ভোগ পড়ে।

কুন্তীর উপর তার নজর বহুদিনের, বংশী তাহা জানিত না। একদিন মেঘনাদ তাকে বলিল, নিশির বৌ অত কেলেশ পাচ্ছে, তাকে তোমার আখড়ায় এনে রাখ। খরচা যা লাগে আমি দেব।

কুন্তীর উপর বংশীরও নজর ছিল। সে তাকে একবার আখড়ায় আসিয়া থাকিতে বলে। সে সম্মত হয় নাই। সেদিন এত সহজে সম্মত হওয়ায় বংশীর মনে হইল ইহা মেঘনাদের সৌভাগ্যেরই ফল।

পরের দিন সকালে বংশী সুর ভাঁজিতেছিল। গানটা বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের মিলনের। সে সুর ভাঁজে আর কুন্তীর প্রতীক্ষা করে। তার খরচা যোগাইবে মেঘনাদ আর কুন্তী থাকিবে তার আখড়ায় ইহাই যথেষ্ট সৌভাগ্যের ফল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ঠাকুর কি করেন।

চব্বিশ

বংশীর আখড়ায় আসার পর কুন্তীর অসুখ বাড়িল॥ জ্বর বেশী, মাথায় দুঃসহ যন্ত্রণা, মধ্যে মধ্যে ভুল বকে।

বংশী চিকিৎসক ডাকিল না বটে কিন্তু রোগিনীকে নিয়মিত বেলপাতা তুলসী পাতার রস খাওয়াইত। সে ছটফট করিলে কপালে জলপটি দিয়া হাওয়া করিত, গায়ে হাত বুলাইত।

কয়েকদিন পরে অসুখ কিছুটা কমিলে সে চোখ মেলিয়া এদিক ওদিক তাকায়। প্রথমটায় ঠাহর করিতে পারে না কোথায় আসিয়াছে। নীলুকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় রে, আমরা এ কোথায় এসেছি?

নীলু বলে, পায়েস মামা।

কুন্তীর মনে পড়িয়া যায়। সে বলে, ওঃ।

কাটে আরও দু'তিনটা দিন। নিস্তব্ধ পরিবেশ। চার দিকে ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। বংশী ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ নাই। পাখীর ডাক আর রাত্রে শিয়ালের হুক্কা হুয়া ছাড়া শব্দ নাই। কুন্তীর ভয় ভয় করে।

সে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, আর কেউ নেই, তুমি এখানে একলা থাক বোষ্টম?

বংশী বলে, হ্যাঁ।

তুমি বলনি ত।

তুমিও ত জিজ্ঞেস করনি।

শুধুইনি তোমায়?

বংশী কহিল, হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছিলে পঙ্কর কথা। আমি বলেছি সে এখানে থাকে না। যাক, তোমার এত ভয় কিসের? আমি ত বাঘ ভালুক নই।

বাঘ ভালুকের চেয়েও কুন্তী মানুষকে বেশী ভয় করে। মানুষই তার এই অবস্থা করিয়াছে। শুধু তার জা নয়, ভাসুর নয়, তাকে এই অবস্থায় ফেলিয়াছে সারা মালঙ্গীর লোক।

কিন্তু এই মানুষটা তাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে, সেবা যত্ন করিতেছে। তাই তার প্রশ্নে কেমন যেন বিব্রত বোধ করিয়া কহিল, না, না, তোমায় ভয় করব কেন? তুমি ভাইয়ের মতন আমায় রাস্তা থেকে—

তার কথায় বাধা দিয়া বংশী বলিল, আমি আর কি করেছি? সবই করেছেন নাড়ুগোপাল। কথায় বলে, রাখে কেষ্ট মারে কে?

আরও কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন প্রথমে অন্নপথ্য করিয়া কুন্তী সবে চোখ বুজিয়াছে। চোখে নামিয়াছে তন্দ্রার আমেজ। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের মতন স্নিগ্ধ। পাশে ঘুমন্ত নীলু। বংশী কুন্তীর দিকে একটুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তার নিচের ঠোঁট ধরিয়া আদর করিলে কুন্তীর তন্দ্রা টুটিয়া গেল।

সে চাহিয়া দেখে বংশী তার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সে বলিল, ছিঃ বোষ্টম।

বংশী অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, তোমার সোঁদর মুখ দেখে আমার মাথা কেমন যেন—আমায় তুমি মাফ কর বোষ্টমী।

আমি ত বোষ্টমী নই। যাক আমায় তুমি মহাকালীতে দিয়ে আসবে কবে?

মহাকালী নয়, সেই গাঁয়ের নাম মহাকাল। আর একটু সেরে ওঠ। দুব্বল শরীরে অত ধকল সইবে কেন? তাছাড়া একটা নৌকো যোগাড় করতে হবে, বাবুর হুকুম নিতে হবে।

কুন্তী প্রশ্ন করে, বাবু কে?

বাবু আবার কে? মেঘনাদ ঠাকুর—তাঁকে এখন জলঙ্গী মালঙ্গী ছিরিপুরের রাজা বললেও চলে।

জমিদার ত রায় বাবু।

সে সব ভুলে যাও। শোন নি বুঝি কিছু? আর শুনবেই বা কোত্থেকে? তুমি যাহক করে তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেল।

আচ্ছা করব। তবে সবই তানার ইচ্ছে।

কুন্তী আবার একদিন তাগিদ দিলে বংশী বলিল, যত শীগগির পারি ব্যবস্থা করছি। বাবু আসুন। তিনি আমার উপর সব রেখে সদরে গেছেন।

দু'তিন দিন পরে। দুপুরে কুন্তী উঠানে বসিয়া নীলুকে স্নান করাইতেছিল, পিছন হইতে পুরুষকণ্ঠে কে একজন ডাকিল, বংশী, বংশী। বংশী কোথায় গেছে জান তুমি?

ঘোমটা টানিয়া কুন্তী মাথা নাড়িল।

লোকটি কহিল, ওঃ বাড়ি নেই। তুমি নিশির পরিবার না?

কুন্তী ঘোমটার আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে মেঘনাদ। কিছুদিন তাকে দেখে নাই, এর মধ্যে চেহারা অনেক বদলাইয়াছে। আগে ছিল রোগা, এখন বেশ নাদুসনুদুস, তেল কুচকুচে চেহারা। পায়ে রামধনু

রংয়ের মোজা ও বাদামী জুতা, কালো কোর্টের উপর রূপার চেইন চক্ চক্ করে।

সেদিন অন্ধকার রাত্রে মণ্ডপে যাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল তার সঙ্গে মেঘনাদের চেহারার কোন মিল নাই।

মেঘনাদ রূপা বাঁধানো লাঠির ডগা চুষিতে চুষিতে বলিল, তুমি নাকি মহাকালে যেতে চাও? বংশী বলছিল।

হ্যাঁ যাবার কথা হয়েছে—কুন্তী মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়।

কেন যাবে? শুধু শুধু ছেলেটাকে পথে বসাচ্ছ। ওর বাপের ঘর বাড়ি জমি জমা আছে। ও কেন বৈরাগী হতে যাবে?

জমি জমা ঘর বাড়ি ত নিলেম হয়ে গেছে।

নিলেম কিনেছে আমার শালা। তুমি থাকতে চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

পুরুষের এই অযাচিত করুণা নারী মাত্রেই সন্দেহের চোখে দেখে। কুন্তীরও সন্দেহ হয়। আবার মনে হয়, মহাকালের ভবিষ্যৎও ত অনিশ্চিত। কে জানে সেখানেই বা কি হইবে?

অন্য পাঁচটি নারীর মতন নীড় বাঁধার শখ তার বরাবরের। নিজের নীড় হইয়াও বরাতে টিকিল না। ছেলেকে দিয়া সেই শখ পূর্ণ করিতে পারিলে বাল্যের স্বপ্ন সফল হয়।

মেঘনাদ জিজ্ঞাসা করিল, কি বল, থাকবে দেশে?

কুন্তী বলে, আমার জা—

সে ভয় নেই। আমি পিছনে আছি জানলে হরির বৌ টুঁশব্দ করবে না। তা ছাড়া তোমার ভাসুর লোকটা ভাল, তোমাদের ভালবাসে।

তা বাসে। তবে দিদি—

তাকে ভয় করে চলতে হবে না। সে কথা দিচ্ছি তোমায়।

তাহলে দেশেই থাকব। আপনি যদি ব্যবস্থা করে দাও।

তা দেব করে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি কাল একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এসেই হরিচরণকে বলব। সে এসে তোমায় নিয়ে যাবে।

নীলু এতক্ষণ মেঘনাদের রূপা বাঁধানো লাঠি ও কালো কোটের উপরের চকচকে শাদা চেইনের দিকে চাহিয়াছিল। এবার জিজ্ঞাসা করিল, কে মা?

তোর মামা হয়।

লাঠি মামা, লাঠি মামা—বলিয়া নীলু লাঠি ধরার চেষ্টা করে।

ছোটদের আমি কখনও কোলে নেই না। তবে তোমার ছেলে—বলিয়া মেঘনাদ নীলুকে কোলে তুলিয়া নেয়। তার হাতে দেয় ঘড়ির চেইনটা। নীলু সঙ্গে সঙ্গেই সেটা চুষিতে আরম্ভ করে।

মিনিট দুই এই ভাবে কাটে।

তা হলে এই কথাই ঠিক রইল—বলিয়া মেঘনাদ বিদায় লইল। সাঁকোর ওপারে প্রথমেই তার দেখা বংশীর সঙ্গে। সে জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি হুজুর?

ভাল। বৌটো গাঁয়ে থাকতে রাজী হয়েছে। হেঃ হেঃ, সবই তোমার নাড়ুগোপালের মহিমা।

মেঘনাদ বংশীর পিঠ চাপড়াইয়া দেয়। ধরনটা এইরকম যে নাড়ুগোপাল সামনে থাকিলে হয়ত তারও পিঠ চাপড়াইয়া দিত।

অপরের মুখে নাড়ুগোপালের দোহাই বংশীর ভাল লাগে না। সে মনে করে উহা অনধিকার চর্চা। ঠাকুর যে শুধু তারই। তার অবচেতন মনে প্রতিক্রিয়া চলে অন্যরূপ। সে চায় কুন্তীকে একা ভোগ করিতে। কুন্তীর উপর এই মানুষটার আকর্ষণ দেখিয়া তার রাগ হয়।

মেঘনাদ যাওয়ার সময় বলিল, সাবধান, বামুনকে এঁটো খাইয়ো না যেন।

তা' তা আপনার খাবারে আমার মত অভাজন—বংশী বোধহয় বলিতে চাহিয়াছিল, আপনার খাবারে আমার মতন অভাজন কি দাঁত বসাতে পারে? কিন্তু দাঁত বসানো ব্যাপারটা বৈষ্ণবোচিত নয় মনে করিয়াই হোক বা পরস্পরের প্রভুভৃত্যের সম্পর্কের জন্যেই হোক কথাটা চাপিয়া গেল।

মেঘনাদ চলিয়া গেলে কুন্তী নীলুকে জিজ্ঞাসা করিল, কি করি বল্ দেখি, মহাকালে যাব, না তোর বাবার ভিটায় ফিরে যাব ?

নীলু বলিল, বাবার ভিটেয় ফিরে যাব।

তোর মধ্যে নারাণ আছে রে। তুইই আমার নাড়ুগোপাল। তুই যা বলবি তাই করব।

পরদিন মেঘনাদের নিকট হইতে কুন্তীর একখানা রঙিন শাড়ী আসিল আর নীলুর একটি ফ্রক।

নিয়মিত আহার ও আদর যত্ন পাইয়া কয়দিনেই নীলুর চেহারার বেশ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। লাল পেনিতে ভারি সুন্দর মানাইল। তাকে কোলে তুলিয়া কুন্তী একটি চুমা খাইয়া বলিল, বাপকো বেটা।

পঁচিশ

বেলা বড় জোর সাড়ে নটা। এর মধ্যেই রোদে রোদে আকাশ পুড়িয়া যায়। চারধারে যেন আগুন জ্বলে।

বৈদ্যনাথ খালের বড় সাকোর কাছে নৌকা হইতে নামিয়াই দেখিল ডাইনে গুরুচরণের বাড়ির নিচে চিতা জ্বলিতেছে। নিভন্ত চিতা, কয়লাগুলি ধিকি ধিকি জ্বলে, কাছে কোন মানুষ নাই। শুধু একটা কুকুর চিতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, বোধ হয় আধ পোড়া নাভিটুকুর আশায়।

বৈদ্যনাথ ভারাক্রান্ত মনে জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তার বাঁয়ে ছোট্ট একটা নালা, নালার ওপারে তিন চারটা পোড়ো ভিটা। তারপর বিস্তীর্ণ জলাভূমি, ডাইনে মঙ্গলের বাড়ির পরেই মাঠ। ধেনো জমি। খটখটে রুক্ষ মাটি ও মাঝে মাঝে আগাছার ঝোপ ঝাড় দেখিলে মনে হয় জমিতে লাঙল পড়ে নাই বহুদিন।

বাঁয়ের জলাভূমির প্রান্তে দাঁড়াইয়া একটি কিশোর নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। মাটি খামচায় আর কি যেন খোঁজে।

বৈদ্যনাথকে দেখিয়া পা টানিয়া টানিয়া সে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করে। বৈদ্যনাথ ডাকে, পালাচ্ছিস কেন ? দাঁড়া।

ছেলেটি অনিচ্ছা সত্বেও ফিরিয়া দাঁড়ায়। বৈদ্যনাথ বলে, ভয় নেই। তোর নাম কি ?

ছিরিচরণ।

মঙ্গলদার ছেলে না তুই ?

ছেলেটি মাথা নাড়াইয়া জানায়, হ্যাঁ।

তোদের বাড়িতে মারা গেল কে ?

বাবা।

কি হয়েছিল, কলেরা ?

শ্রীচরণ আবার মাথা নাড়ায়।

তুই কি করছিলি ?

গেঁড়ি গুগ্‌লি কাছিমের ডিম খুঁজছিলুম।

বাপের চিতা এখনও নিভে নাই আর খোঁড়া ছেলে বিলে নামিয়াছে গেঁড়ি গুগ্‌লি খুঁজিতে। এই একটা ঘটনাই তার সমস্ত অবস্থা জানাইয়া দেয়।

বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তোর ঘরে আর কে আছে ?

কেউ নেই। মা আর দাদা আগেই গেছে। এবার গেল বাবা—বলিয়া ছেলেটি উত্তর পুব দিকে তাকায়, মনে হয় বাপের অদৃশ্য চিতার দিকে চাহিতেছে। একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনি আমাদের রাজাবাবু না ?

বৈদ্যনাথ বলিল, আমি রাজা নই, রায় বাড়ির বদ্যিনাথবাবু।

আপনি মানুষের ঘর-বাড়ি ভেঙে দাও, ধান কলাই কেড়ে নাও ?

বৈদ্যনাথ এতক্ষণে বুঝিল ছেলেটি তাকে দেখিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কেন ? তাকে সে ভয় করে, হয়ত তার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, আর কি কি করি ?

না, আর কিছু না—বলিয়া শ্রীচরণ মাথা নাড়ে।

নে, এই নিয়ে কিছু কিনে খা গিয়ে—বলিয়া বৈদ্যনাথ তার দিকে একটা টাকা ছুঁড়িয়া দেয়।

শ্রীচরণের যেন বিশ্বাস হয় না। অভিভূতের মতন সে একটুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। তার কোঁচড়ে ছিল গেঁড়ি গুগলি, তাড়াতাড়ি কোঁচড়ের প্রান্ত কোমরের কাপড়ে গুঁজিয়া কাঙারুর মতন লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া যায়।

বৈদ্যনাথও ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করে। খানিকটা পরেই রাস্তার দু'ধারে মানুষের ঘন বসতি, চাষী গৃহস্থের বাস। ঘরের চালায় শণ নাই, বেড়ায় দরমা নাই, উঠানে গরু ধুঁকিতেছে, পাশেই ধুলা-বালিতে উলঙ্গ শিশুর দল গড়াগড়ি যায়। দৃশ্যটা চরমতম দীনতার।

বাড়িছাড়ার সময়ও সে এই পথ দিয়াই যায়, তখন পল্লীর চেহারা ছিল অন্যরকম। আজকের এই দৃশ্যে তার মন ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে।

সারা রাস্তায় মোটে দুটি লোকের সঙ্গে দেখা। দু'জনেই তার প্রজা। একজনের নাম মনে নাই, বাড়ি শ্রীপুরে। সে নমস্কার করিয়া পাশ কাটাইয়া গেল। আর একজন মালঙ্গীরই পরশুরাম ঢাল। সে তাকে দেখিয়া বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া নেয়।

মিনিট কুড়ি পরে বৈদ্যনাথ বাড়ি পৌঁছিল। লাল ইটের সুন্দর বাড়িখানা দেখিয়া পিতাকে নয়, পিতামহকে নয়, প্রথমেই তার মনে পড়িল মহিমকে। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িল।

সদর দরজা খোলা, দরজার কড়ার সঙ্গে তালা ঝুলিতেছে, একটা ভিন্ন নিচের সব ঘরের জানালা বন্ধ। উপরে তার ঘরের জানালা দিয়া শব্দ আসিতেছে—মার্‌-মার্‌ পঁচিশ।

আর একজন কে বলিল, হাঃ হাঃ খুব পাঁচশ পড়েছে।

ঘেউ ঘেউ করিয়া বৈদ্যনাথকে অভ্যর্থনা করে সোমালি। দীর্ঘদিন পরে প্রভুকে পাইয়া তার চারধারে লাফায়, তার জুতা চাটে। তীরবেগে একবার বাড়ির ভিতরে ছুটিয়া যায় আবার দরজায় আসিয়া বৈদ্যনাথের দিকে চাহিয়া চেঁচায়, ঘেউ ঘেউ। যেন ডাকে, এস ভিতরে এস।

বৈদ্যনাথ তার মাথায় আস্তে আস্তে গোটা দুই চাপড় দিয়া তার পিছু পিছু বাড়িতে ঢোকে। প্রথমেই দেখে ডান দিকের ঘরের মেজেয় সারি

সারি কলাপাতা পাতা, পাতার পাশে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়, চিংড়ির খোসা।

ঘরখানা ননীবাবুর সময়ে ছিল জমিদারির কাছারি, তার গোমস্তা এইখানে বসিয়া প্রজাদের খাজনা আদায় করিত, দাখিলা দিত। ফণীবাবুর সময় এটা ছিল কংগ্রেসের আপিস। বৈদ্যনাথ এই ঘরে ডিসপেনসারি করে। পুব দিকে দেয়ালের পাশে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও বইর আলমারি যেভাবে রাখিয়া সে কলিকাতায় গিয়াছিল, আজও ঠিক সেই ভাবে আছে। দেয়ালে গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের ছবির পাশে হ্যানিম্যানের ছবি। সবগুলিই ধুলি-মলিন।

নিচের সব ঘরই নোংরা, আলুর খোসা, মাছের আঁশ ও ডিমের খোলা ছড়ানো। পিছনের বারান্দায় ছাই ভরতি উনুন, তার উপর ডালের দাগ।

সিঁড়িতে ঝাঁট পড়ে নাই বহুদিন। দেয়ালে দোক্তা মিশানো খয়েরি পিক, তার উপরই কেহ কেহ চুন মুছিয়াছে।

উপরের ঘর কয়খানিও সমান নোংরা। পড়ার ঘরে তার বাবার তৈল চিত্রের ফ্রেম ধুলায় পড়িয়া আছে। ফ্রেমের নিচে ডান দিকে মাকড়সার জাল, মাঝখানটা ফাঁকা, ছবির কোন কিছুই নাই। নিচের দিকে পোকায় কাটা খানিকটা ক্যানভাস।

বৈদ্যনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সারা বাড়িতে শুধু তার শোয়ার ঘরখানিই অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। মধ্যে মধ্যে ঝাঁট পড়ে। খাটের উপরের গদি জাজিমও ঠিকই আছে। তার উপর স্থান পাইয়াছে ছেঁড়া ময়লা কাঁথা ও তেল কুচকুচে বালিশ। ঝড়ু ও তার মা হয়ত এই খাটেই শোয়।

ঝড়ু একটি মেয়ের সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলিতেছিল। মেয়েটির পরনে মলিন বসন, বুকের কাছে খানিকটা ছেঁড়া। ঝড়ু কড়ির চালের ফাঁকে ফাঁকে তার দিকে তাকায়।

হঠাৎ চোখ তুলিয়া দরজায় বৈদ্যনাথকে দেখিয়াই সে দশ-পঁচিশের

কোটটা উলটাইয়া দিল। মেয়েটি তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ছুয়ো, হেরে গেছে বলে খেলবে না।

ঝড়ু হাত ছিনাইয়া নিয়া বলিল, ধেৎ, দেখছিস না দরজায় কে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বৈদ্যনাথকে দেখিয়া জিভে কামড় দেয়। বৈদ্যনাথ তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোন্ বাড়ির মেয়ে ?

মেয়েটি বলিল, বিরিঞ্চিদের বাড়ির উত্তরের হাউলিতে আমাদের ঘর।

ঝড়ু বলিল, ব্রজ জেঠার মেয়ে ও।

বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তোর মা কোথায় রে ঝড়ু ?

মা নায়েব ঠাকুরের বাড়ি কাজে গেছে।

ওঃ, তাই বাড়িময় এত জঞ্জাল।

মা বলে গেছে দুপুরে এসে সব মুক্ত করবে।

যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। মেঘনাদকে বলবি পারলে সেও যেন এ বেলায়ই আসে।

বাড়িময় জঞ্জাল, মায়ের অনুপস্থিতি, নিজের দশ-পঁচিশ খেলা সব মিলিয়া ঝড়ু নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে করিতেছিল। বাহিরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বৈদ্যনাথ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম ?

মেয়েটি বলিল, রঙ্গ।

তোমার না এক বোন আছে ?

হ্যাঁ, সে আমার দিদি, নাম বঙ্গ। তার চোখ নেই।

তোমার বাবার খবর কি ?

বাবা কলেরায় মারা গেছে।

এঁ্যা, কবে গেল ? এ বছর আর কে কে গেছে ?

বাবা গেছে দু মাসের উপর। এবার মরেছে কার্তিক গণেশ দুই ভাই, উপীন দাদু আর তার ছেলে, গুরুচরণ কাকা, আমার বাবা মা, তেজুদার বোন, এপাড়ারই কত।

তোমাদের দেখাশুনো করে কে ?

দিদিকে আমি দেখি, আমায় দেখে দিদি আর দেখে ভগবান।

তার এই সপ্রতিভ উত্তরে খুশি হইয়া বৈদ্যনাথ বলিল, এখানে কাজ করবে?

মেয়েটির মুখ খুশিতে ভরিয়া যায়। সে বলে, থাকব। আমাদের দুজনকে খেতে দিও। দিদিও তোমার কাজ করে দেবে। সে খুব ভাল কাজ করে।

বেশ দুজনেই থাকবে। কাল এখানে ভোজ হয়ে গেছে বুঝি?

মেয়েটি মাথা নাড়াইয়া জানাইল, হ্যাঁ।

ভোজ দিলে কে?

মেঘু ঠাকুরের শালা রমণ গোঁসাই।

বৈদ্যনাথ বলিল, খেয়েছে কতজন?

নায়েব ঠাকুরের আর গোঁসাইর বাড়ির সবাই, তাদের জ্ঞাত কুটুম। আমিও খেয়েছি। পেল্লাদ মাসী বলেছিল।

মেয়েটির কাছে আরও প্রশ্ন করিয়া সে জানিল নিত্য তাদের ভাত-জোটে না, চিঁড়া মুড়ি, নিমন্ত্রণ বাড়ির ভুক্তাবশেষ যখন যা পায় খাইয়া দিন কাটাইয়া-দেয়।

দেশে ফিরিয়া বৈদ্যনাথ দেখিল চরমতম দারিদ্র্যের ছবি। প্রথমে যে তিনটি কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে দেখা তাদের দু'জনেরই ভাত জোটে না, তারা বাঁচিয়া আছে গেঁড়ি ও গুগলি কাছিমের ডিম ও অপরের উচ্ছিষ্ট খাইয়া। অথচ এই জন্য তাদের কোন ক্ষোভ নাই, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই।

দেশের এই অবস্থার জন্য নিজের দায়িত্বের কথা ভাবিয়া বৈদ্যনাথ গ্লানি অনুভব করে। মনে পড়ে গুরুচরণের ছেলের প্রশ্ন, আপনি লোকের ঘর বাড়ি ভেঙে দাও, ধান কলাই কেড়ে নাও।

তার অনুপস্থিতিতে মেঘনাদ তা হইলে অনেক কিছুই করিয়াছে।

সংশয় তারও হইয়াছিল কিন্তু ব্যাপারটা যে এত দূর গড়াইয়াছে ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়ু তার মা পেল্লাদিকে লইয়া মেঘনাদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। পেল্লাদি তার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতে গেলে বৈদ্যনাথ বাধা দিয়া বলিল, না, না, ওকি করছ?

পেল্লাদি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে একটুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলে, বামুনকে গড় করব না? একে বামুন তায় রাজা। তুই পেন্নাম করিসনি ঝড়ু?

ঝড়ু বলিল, খেলতে খেলতে ভুলে গেলুম মা।

ও মা! কী হবে এমন ছেলেকে দিয়ে?—পেল্লাদি উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপ করে। বৈদ্যনাথ বলে, ও পেন্নাম করলেও আমি নিতুম না।

পেল্লাদির বরাবরই ধারণা বাবুর মাথার ঠিক নাই। বৈদ্যনাথ প্রণাম নিতে না চাওয়ায় সেই ধারণা বদ্ধমূল হয়। এই সময় বৈদ্যনাথ আবার বলিল, তুমি রান্নার যোগাড় কর।

পেল্লাদি আরও অবাক হইয়া গেল। বাবু এ বলে কী? সে কহিল, আমি রাঁধব আর তাই তুমি খাবে?

কেন, কি হয়েছে তাতে?

অত জানিনে। তবে ছেলের মন্দ আমি করতে পারব না।

পেল্লাদির ধারণা ব্রাহ্মণকে রান্না খাওয়াইলে ছেলের অমঙ্গল হইবে। এরপর কোন কথা চলে না। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় অন্ততঃ এবেলার মতন পেল্লাদি হাঁড়িতে চাল ও গোটা কয়েক আলু চড়াইয়া দিবে। নামাইয়া নিবে বৈদ্যনাথ।

খাইতে বসিয়া সে পেল্লাদিকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। বেশীর ভাগই মেঘনাদ সম্পর্কে। আজ সকালে সে মামলার তদ্বিরে মহকুমায় গিয়াছে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত মামলা কিসের?

তা জানিনা। তবে দেখি খালি সদর মফঃস্বল করে। কাগজে কাগজে দুটো তোরঙ্গ বোঝাই করেছে।

অবস্থাও ফিরিয়েছে শুনলাম।

পেল্লাদি কোন উত্তর করে না।

কাল রমণ এখানে ভোজ দিয়েছে কেন?

তার মেয়ের ছেলের মুখে ভাত হল।

বৈদ্যনাথ বলিল, শুধু নিজের নয় শালার অবস্থাও ফিরিয়েছে দেখছি।

বৈকালে দিদিকে লইয়া রঙ্গ আসিল। মেয়েটি শ্যামলী, ছিমছাম দোহারা গড়ন। পরনে কারকাচা কাপড়। মাথার চুল সুবিন্যস্ত, চোখ নাই তবুও মুখখানা বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন জল্ জল্ করে।

রাত্রে রঙ্গরা দুই বোন ভাগাভাগি করিয়া রান্না করে। আর পেন্নাদি করে গজর গজর—এরই নাম ঘোর কলি নইলে ভজর মেয়েদের এত সাহস, বামুনকে রান্না খাওয়ায়, তাও যে সে বামুন নয়। দেশের রাজা!

বৈদ্যনাথ রঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিল, গাঁয়ে এখনও নাকি কলেরা আছে শুনলাম।

রঙ্গ বলিল, হ্যাঁ, আছে তবে আমাদের পাড়ায় নেই।

ঝড়ু ছিল দরজায় দাঁড়াইয়া। সে সোৎসাহে বলিল, ছুটে গিয়ে খবর নিয়ে আসব?

পেন্নাদি বৈদ্যনাথের উদ্দেশে বলিল, দেখলে হতভাগার কাণ্ড! পুঁচকে ছেলে, ও এখন বেরুবে কার কোথায় কলেরা হয়েছে জানতে।

মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝড়ু রওনা হইতেছিল। বৈদ্যনাথ ডাকিয়া বলিল, এই, তোর এখন যেতে হবে না।

বাধা পাইয়া দেয়ালের আড়ালে যাইয়া ঝড়ু মা ও বাবু উভয়ের উদ্দেশেই ভেংচি কাটে।

রঙ্গ মুচকি হাসিতেছিল, তাকে দেখাইল একটা কিল।

ছাব্বিশ

কর্তা আছেন, আমাদের হুজুর?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যনাথের কানে যায়, কর্তা আছেন, আমাদের হুজুর?

হয়ত বা ঐ ডাকেই তার ঘুম ভাঙে। সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে গামছার পাগড়ি। ডাকে, হরিচরণ না? উপরে এস।

হরিচরণ প্রতিটি সিঁড়িতে লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া উপরে ওঠে। বৈদ্যনাথের নিষেধ সত্ত্বেও তার সামনে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলে, হুজুরের দেহের কৈশল ত?

বৈদ্যনাথ কহিল, তা কৌশল। তুমি জানলে কি করে যে আমি এসেছি?

ওকি আর গোপন থাকে, করতা? মোরগ না ডাকলেও ভোরের আলোর খবর মানষের অজানা থাকে না।

যাক্, ব্যাপার কি বল দেখি?

আমার পরিবারের ওলার দয়া হয়েছেন। আপনাকে একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

অসুখ করেছে কখন?

কাল দুপুরে খাওয়ার পর।

কা'কে দেখিয়েছ?

দেখাব আর কা'কে? আপনি এয়েছ জেনেও আমি আসতে ভরসা পাইনি। ভাবি জোর করে পাঠিয়ে দিলে।

তার কি কি কষ্ট হচ্ছে বল দেখি?

হরিচরণ বলিল, বড্ড কেলেশ পাচ্ছে, সাঁতার কাটছে ভিজে কাঁথার উপর।

রোগিনীর সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে করিতে বৈদ্যনাথ বলিল, কলেরা এবার দেশটাকে উজোড় করে দেবে দেখছি।

উজোড় ত করেইছে। জলঙ্গী মালঙ্গী শ্রীপুর মিলে শ'খানেক গেছে। আমাদের বাড়িরই গেছে কার্তিক গণেশ দু'ভাই, আমাদের পাড়ার উপিনদা, তার হৈমপথি পড়া ছেলে ফটিক, খুদে বংশী, ছিরিপুরের মোসাদ্দেক খুড়ো।

মোসাদ্দেক মিয়াও মারা গেছেন?

তিনি, তানার বুড়ো চাচা মেনাজ।

ছোট্ট একটা ব্যাগে কতগুলি ঔষধ লইয়া বৈদ্যনাথ হরিচরণের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। হরিচরণ সারাটা পথ বকবক করে। বলে, মানুষের দুদ্দশার আর সীমে পরিসীমে নেই হুজুর, আমরা একেবারে দুস্কুর গহনে পড়েছি।

বৈদ্যনাথ বলিল, কি রকম ?

ঘরে ভাত নেই, পরনে বস্তর নেই।

হ্যাঁ, কাল খাল পার থেকে আসতে আসতে দেখলুম বটে।

এ অবস্থা করেছে আপনার লায়েব ঠাকুর। আপনি যাবার পর সদর থেকে আবার নতুন করে নাজির আনিয়ে সবার ঘর থেকে ঘটি বাটি টেনে বার করল। আপনি নাকি হুকুম করে পাঠিয়েছিলে কলকাতা থেকে।

কলকাতা থেকে কি হুকুম করেছি ?

তা জানি না হুজুর। কেতুকার বাড়িতে বাধা পেয়ে কাছারির বাবু সেবার চলে যায়। মাস দুই পরে আবার আসে, সঙ্গে মেলা পুলিস।

ওঃ—বলিয়া বৈদ্যনাথ গম্ভীর হইয়া যায়। হরিচরণও ভরসা করিয়া আর কথা বলে না।

পরিচিত ঘর, সেই নিচু চালা, মাথা নোয়াইয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। দু' তিনটা খুঁটি না থাকায় একটা দিক যেন মাটির উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। চালার শণ নাই বহু জায়গায়। ভাঙা বেড়ার বাঁশ ও দরমা প্রকৃতিকে যেন ভেংচি কাটে। নীলুর অসুখের সময় ঘরের মাঝখানটায় বেড়া ছিল, উহাও নাই। ভিতরে উৎকট গন্ধ।

ভাবিনী মাটিতে গড়াগড়ি করে। তার মুখে কালির পোঁচ, চোখদুটি কপালের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। সারা শরীরে খিচুনি, হাত পা মোচড়াইয়া যেন ভাঙিয়া নেয়। বৈদ্যনাথকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি পায়ের নিকট হইতে একখানা কাঁথা টানিয়া গায়ে জড়াইল। ভিজা জবজবে কাঁথা, তার উপর অস্পষ্ট হলদে দাগ। বৈদ্যনাথ চাহিয়া দেখে ঘরে লজ্জা নিবারণের মতন দ্বিতীয় কোন আচ্ছাদন নাই। তার দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া ভাবিনী বলিল, যাক্ তুমি এয়েছ রাজাবাবু।

তার ক্ষীণ কণ্ঠে ছিল অপূর্ব নির্ভরতা, ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষার ব্যথাহত ক্লান্ত সুর। সে হরিচরণকে বলিল, বাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে। তুমি একটু বাইরে যাও দেখি।

এঁ্যা! আমি—আমি এই যাচ্ছি—বলিয়া হরিচরণ অপ্রস্তুতভাবে বাহির হইয়া যায়।

ভাবিনী গড়াইয়া গড়াইয়া বৈদ্যনাথের কাছে আসিয়া তার পা নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুমি আমায় ক্ষমা কর, বাবু।

বৈদ্যনাথ অবাক্। সে বলে, ছিঃ ওকি করছ?

আমায় মাফ কর।

মাফ করার কি হল? তুমি বরং রোগের কথা বল, কি কি কষ্ট হচ্ছে।

গাঁয়ে আগুন জ্বালিয়েছি আমি। তোমায় ঘরছাড়া করেছি—একটু থামিয়া ভাবিনী আবার বলিল, কুন্তীর নামে মিছে কথা বলেছি। সে তোমায় ডাকতে বারণ করে নি।

তবে, তবে?

সবই বানানো, কাতিকের বউর ভয় পেয়ে মরার গপ্প অবধি।

বৈদ্যনাথ গুম হইয়া বসিয়া থাকে। তার চোখের উপর ভাসে ছবির পর ছবি। পুকুরপারে ভাবিনীর সঙ্গে দেখা, মামলা মোকদ্দমা, তার বুকের মধ্যে কুন্তীর মূর্ছা, বুড়া জেঠামণির মৃত্যু। মিথ্যায় যার শুরু, শেষ তার হাহাকার আর কান্নার রোলে। শুধু মানুষ নয়, নিতাইর গরুটা পর্যন্ত কাঁদিল।

আশ্চর্য! সমস্ত অনর্থের মূল এই নারী। অমর তাহা হইলে ঠিকই বলিয়াছে। অথচ সে বোঝে নাই। বৈদ্যনাথের নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল। একটা স্ত্রীলোকের কথায় সে পর্ব্বত-প্রমাণ ভুল করিল, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিল না। সে রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মিছে বলেছ কেন? কি জন্য?

প্রথমবার ভাবিনী কোন উত্তর করে না। বার দুই তিন প্রশ্নের পর বলে, তা তুমি বুঝবে না, বাবু।

বৈদ্যনাথ এতদিন বুঝিত না ঠিকই। আজ প্রথম বুঝিল, প্রথম দেখিল নারী চরিত্রের নূতন এই দিক্। একটু পরে সে প্রশ্ন করিল, তোমার জা আর নীলু কোথায়?

কুন্তী কহিল, জানি না।

সেই যে তাড়িয়ে দিয়েছিলে তারা আর আসেনি? কেতুর বাড়ি আছে বুঝি?

ভাবিনী ধীরে ধীরে বলিল, না, সেখানেও নেই।

তবে, তবে?

বলতে পারব না, কাল থেকে ত খোঁজ করতে বলেছি।—বলিয়াই ভাবিনী চোখ বোজে।

মুহূর্তের জন্য বৈদ্যনাথের ভিতরের হিংস্র মানুষটা জাগিয়া ওঠে। ভাবিনীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। পরক্ষণেই হয় অনুকম্পা।

ভাবিনীরও নিজের উপর কেমন একটা বিরক্তি জন্মিয়াছিল। তার এই আত্মগ্লানি আজকের নয়। প্রথমটায় নিজের অনর্থ করার শক্তিতে সে কিছুটা তৃপ্তিলাভ করে বটে কিন্তু লোকসানের দিকটা ধরা পড়ে তাদের নামে মামলা হওয়ার পর। মামলা হইল, মালক্রোক আসিল। নাজিরের পেয়াদা ও মালিকের বরকন্দাজ ঘরের ঘটি বাটি টানিয়া বাহির করিল।

রাগের মাথায় কুন্তীকে সে ঘরের বাহির করিয়া দিল বটে কিন্তু সেই হইতে মনে কোন শান্তি ছিল না। বৈদ্যনাথ দেশ ছাড়ায় সেই কষ্ট আরও বাড়িল। আসিল চরমতম দারিদ্র্য। খবর আসিল মেঘনাদের শালা রমণ গোঁসাই তাদের ঘরবাড়ি জমিজমা নিলামে কিনিয়া নিয়াছে। এখন হইতে তার স্বামীকে নিজের জমিতে কৃষাণ খাটিতে হইবে। তাহাও মিলিবে কি না কে জানে?

কাল অসুখ হওয়ার পরই সে হরিচরণকে বলে, আমার নীলুকে নিয়ে এস, নীলুচন্দরকে।

হরিচরণ তাদের খোঁজ পাইল না। ভাবিনী রাগ করিল, গালি দিল, আনাড়ী, অকর্মার ধাড়ী, খালি জান পগ্‌গ বাঁধতে।

রাত্রে হরিচরণ বৈদ্যনাথের দেশে ফেরার খবর আনিল। খবরটা সে পায় শ্রীচরণের কাছে। ভাবিনী ব্যস্তভাবে বলিল, বদিবাবু, আমাদের রাজাবাবু ফিরেছে? যাও, যাও, তাকে একবার ডেকে আন। মরার আগে—কথাটা সে শেষ করিল না।

রোগ সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিয়া বৈদ্যনাথ ভাবিনীকে ঔষধ দিল। সে বলিল, বড়িগুলি তুমিই মুখে ঢেলে দাও রাজাবাবু। তার আগে আমার কপালে ছুঁইয়ে দিও।

সে ঔষধ খাইলে বৈদ্যনাথ আশ্বাস দেয়, ভয় নেই, তুমি সেরে উঠবে।

ভাবিনী কোন উত্তর করে না।

বৈদ্যনাথ বাহিরে আসিয়া দেখে হরিচরণ দরজার পাশে ঘরের পোঁতায় হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে। পাগড়ির কিছুটা অংশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে তার বাঁ নাকের উপর।

বৈদ্যনাথ তার ঘুম ভাঙাইলে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, কোন ভয় নেই ত?

না।

আপনার সঙ্গে যেতে হবে না?

দরকার নেই। বিকেলে খবর দিও। আর এই থেকে চারটি করে বড়ি দেবে দু'ঘণ্টা অন্তর—বলিয়া বৈদ্যনাথ হরিচরণের হাতে একটা পুরিয়া দেয়।

যাওয়ার সময় বলে, ওর একটু কমলে তোমার ভাইপো আর ভাজের খবর নিও।

নিশ্চয় নেব, নীলুচন্দর আমার কুলের পিদ্দিম, তাকে এনে ভিটেয় স্থাতা করে যাব। আমি ত বুড়ো হয়ে গেছি।

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেলে হরিচরণ ঘরে আসিয়া পুরিয়াটা ভাবিনীর মাথার কাছে রাখিলে সে সেটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ভিজে মাটির উপর সাদা গ্লোবিউলগুলি চকচক করে।

হরিচরণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। সেই চাহনি প্রকাশ করে অন্তস্তলের গূঢ় বেদনা। এ এক অজানা অনুভূতি। তার দম যেন বন্ধ হইয়া আসে।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু পরে সে ডাকে, ভাবি—

আঃ মরণ, বুড়ো বয়সে আবার ওসব কি ?—বলিয়া ভাবিনী মুখ ফিরাইয়া শোয়।

হরিচরণের বাড়ির নিচেই মিয়ার মাঠ। অদূরে খালপারে সরকারী রাস্তা—বৈদ্যনাথের বাড়ি যাওয়ার সোজা পথ। রাস্তায় না উঠিয়া, মেঠো পথ বাহিয়া সে উত্তর মুখো চলে।

পথটা ফিতার মতন সরু, দু'ধারের ঘাস, চোর কাঁটা ও আগাছা সেটাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। পায়ে ঘাসের শুকনা ডগা বেঁধে, কাপড়ে চোরকাঁটা লাগিয়া যায়। হাল না পড়ায় মাটি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহীন শুকনা মাটি যেন ভাবিনীরই মতন, তারই মতন বঞ্চিত। হরিচরণকে দিয়া ভাবিনীর কোন ক্ষুধাই মেটে নাই। নীলুর অসুখের সময় তার ভিতরের ক্ষুধার্ত নারী বৈদ্যনাথের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোন আশা নাই দেখিয়া ছোবল মারিল। কী বিষই না ছিল তার কণ্ঠে! অত ক্রোধ, অত হিংসা মানুষের থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য! সেই মানুষই মনের সমস্ত দৈন্য লইয়া আজ অমন করিয়া মাটিতে লুটাপুটি করিল।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈদ্যনাথ বাড়ি ফেরে বেশ একটু বেলায়। খাওয়ার পর শ্রান্ত দেহটাকে জানালার কাছে একটা ইজিচেয়ারে এলাইয়া দেয়। জানালার দক্ষিণে বাড়ন্ত একটা গাছ; গাছটা ডালপালা দিয়া ওদিকের আলোকে আড়াল করিয়া দিয়াছে। বাতাসে পাতা কাঁপে, ঘুম পাড়ানি গানের মতন তার শর শর শব্দে বৈদ্যনাথ ঘুমাইয়া পড়ে।

ঘুম ভাঙিলে সে বঙ্গকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিশির বৌ-এর খবর কিছু জান ?

বঙ্গ বলিল, না। অনেকদিন কেউ তাকে দেখে নি। এর আগে ঝোপে জঙ্গলে থাকত।

ঝোপে জঙ্গলে কেন ?

লোকে বাড়িতে ঠাঁই দিত না।

বঙ্গ কুন্তীর অবস্থা যতটুকু জানিত, সংক্ষেপে সবই বলিল। লোকে মনে করে সে ব্যাধির বাহন, ওলা আসিয়াছে তার কাঁধে ভর করিয়া। আগে তবু গৃহস্থের গোশালে ঢেঁকিশালে আশ্রয় মিলিত, কিছুদিন যাবৎ উহাও উঠিয়া গিয়াছে।

শুনিতে শুনিতে বৈদ্যনাথের মুখ রুক্ষ কঠোর হইয়া ওঠে, ঠোঁট কাপে। সে জিজ্ঞাসা করে, বৌটি তেজচন্দ্রের ওখানে থাকত না? কেতুর ছেলে তেজ।

হ্যাঁ, ছিল ক'দিন। কেতুর শ্রাদ্ধের দিন তারা তাড়িয়ে দিলে।

কেন? সেখানে আবার কি হ'ল?

বঙ্গ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, শ্রাদ্ধের সময় ওদের ঘরে আগুন লাগে। সবাই নিশির বৌকে সন্দ করে।

সে আগুন দিয়েছে বলে সন্দেহ, না আর কিছু?

কি একটা গোলমাল হয়েছিল। সব আমি ঠিক বলতে পারব না।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে, কী দুর্ভাগ্য এই মেয়েটার। অত ভাল অথচ এ দুর্ভোগ কেন?

তার ভাবনা বৈদ্যনাথের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সন্ধ্যা নামে। জানালার মধ্য দিয়া গাছটা ঘরের ভিতর কালো কালো হাত বাড়াইয়া দেয়।

রঙ্গ আলো লইয়া আসিয়াছিল। বৈদ্যনাথ বলিল, নিয়ে যাও, আলোর দরকার নেই।

পরের দিন পুকুর ঘাটের পথে হরিচরণের সঙ্গে দেখা। আগের দিন বৈকালেও সে আসিয়াছিল। ভাবিনীর অবস্থা কিছুটা ভাল শুনিয়া বৈদ্যনাথ তার সঙ্গে দেখা করে নাই। বলিয়াছে, ঐ ঔষধই খাওয়াও গিয়ে।

হরিচরণ কি যেন উত্তর করে, সে কথা তার কানে যায় না।

আজ তাকে দেখিয়াই বৈদ্যনাথ ছুটিয়া আসিয়া তার দুই কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে বলিল, তুই মানুষ না আর কিছু?

হরিচরণ ভয় পাইয়া যায়। বাবু কি আবার পাগল হইয়া গেল নাকি? কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, জয় জয় গুরু।

ভাজকে অমন করে তাড়িয়ে দিয়েছিস, ইউ ফুল।

হরিচরণ প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই বলিল, ভাবির হাতে পড়লে আপনারও এই দশা হত হুজুর।

তার কাতর মুখচ্ছবি বৈদ্যনাথের অনুকম্পার উদ্রেক করে। সে বলে, যাও, বৈঠকখানায় ব'স গিয়ে।

হরিচরণ বাড়ির রোয়াকে আসিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে বসিয়া থাকে। হয়ত আকাশ পাতাল অনেক কিছু ভাবে, হয়ত বা ভাবেই না।

কিছুক্ষণ পর সে বৈদ্যনাথের প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল, তোমার পরিবার কেমন আছে?

আপনার ওষুধে কথা কয়েছিল। কিন্তুক—

কিন্তুক কি?

সেই যে আপনি খাইয়ে এয়েছ তার পর ওষুধ পড়েনি। বড়িগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সে কী কোরোধ!

যাক্, এখন কেমন?

প্রথমে সেই যে সুরাহা হয়েছিল তার পর আর মন্দর দিকে যায় নি। মনটা খুশি আছে ত।

বৈদ্যনাথ তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। লোকে মনে করে সে বোকা, কিন্তু তা ত নয়। বেচারীর এই অবস্থা হয়ত ভাবিনীর হাতে পড়ারই ফল। সে বলিল, তুমি যাও, একটু একটু ডাবের জল দাও গিয়ে। আমি যাচ্ছি।

ডাব। ডাব দিতে হবে? কটা?

তোমার গাছে ডাব নেই বুঝি?

ঘর বাড়ির সঙ্গে ব্রেক্ষও নিলেম হয়ে গেছেন। ফল ধরেছিল খুব, নায়েব ঠাকুর সেদিন সব পেড়ে নিয়ে গেল।

আর কারও বাড়ির ফল পাকুড় নিয়েছে?

হ্যাঁ, কর্তা। আমের কষিটি পর্যন্ত বাদ দেয়নি। লোকে বলে, এরপর জমিদার হবে মেঘু ঠাকুর।

আচ্ছা, যাও, এই টাকাটা দিয়ে ডাব কিনে নাওগে—বলিয়া বৈদ্যনাথ একটা টাকা ফেলিয়া দেয়।

হরিচরণ টাকাটা কপালে ছোঁয়াইয়া বলিল, ডাব কিনতেও নায়েব বাড়িই যেতে হবে।

একটু পরে বৈদ্যনাথ হরিচরণের বাড়ি যাইতেছিল। রাস্তা হইতে লকাই তাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তার মায়ের কলেরা।

বৈদ্যনাথের সে খেলার সাথী। তার বাবা অকাই, ঠাকুরদা মকাই ছিল রায়েদের বরকন্দাজ। ননীবাবু তাদের লাঠির সাহায্যে জমিদারি দখল করেন, প্রজাদের শাসনে রাখেন।

শৈশবে মায়ের অসুখ থাকায় বৈদ্যনাথ কিছুদিন লকাইর মায়ের স্তন্য পান করিয়াছিল। সে ঘরে ঢুকিলে লকাই বলিল, দেখ না কে এয়েছেন।

মা কিছুই শোনে না, চোখের সামনেও বৈদ্যনাথকে দেখিতে পায় না। সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল বৃদ্ধার দেহ হিমশীতল, নাড়ী নাই। বায়ুতে পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে, নিঃশ্বাসও ঠিক মতন পড়ে কিনা সন্দেহ। লকাই এবার জোর গলায় ডাকে, বাবু এয়েছে মা, রাজাবাবু। তোমার ছোট ছেলে।

বৃদ্ধার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিয়া ওঠে। পরক্ষণেই মিলাইয়া যায়।

বৈদ্যনাথ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। স্তন্য দাত্রীর মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। তারপর 'মা' বলিয়া ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল।

হরিচরণের বাড়ি আর যাওয়া হইল না।

সাতাশ

আজ এক বছরের উপর মালঙ্গী জলঙ্গীর চাষী মজুরের দুঃখের আর সীমা নাই। রোগ শোক দুঃখ দৈন্য লাগিয়াই আছে। গরিবকে রোগ যেন ছাড়ে না। তিন মাসের উপর কলেরা লাগিয়াছে, এখনও বিদায় লওয়ার নাম নাই।

মামলা মকদ্দমার জন্য গত বছর চাষীরা জমির কাছে যাইতে পারে নাই। তার পরই আসে ইনজাংশন। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট চাষীদের জমির কাছে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে।

সব খবরই বৈদ্যনাথের কানে ওঠে। এদিকে হাতে অনেকগুলি সঙিন রোগী, তাদের বার বার দেখিতে হয়, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। আছে কুন্তীর জন্য দুশ্চিন্তা। সে হরিচরণকে তার খোঁজ করিতে বলিয়াছে, ঝড়ু ও শ্রীচরণকে বকশিশ কবুল করিয়াছে। কিন্তু তারা কোন সন্ধানই পায় নাই।

মেঘনাদ অনুপস্থিত। তার কাজকর্ম দেখে রমণ ও বংশী। বৈদ্যনাথ তাদের ডাকিয়া পাঠাইল। বংশী আসিল না। রমণ আসিল বটে কিন্তু প্রতি কথায়ই দাদাবাবুর অর্থাৎ ভগ্নীপতির দোহাই দিল। বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, গেল বছর ইনজাংশন জারি করে তোমরা চাষীদের জমিতে যেতে দাও নি কেন?

রমণ কহিল, সে জানেন দাদাবাবু। আপনি জমিদার, তিনি নায়েব। জমিদারি রক্ষার জন্যই হয়ত করেছেন।

বৈদ্যনাথ তার পর দিনই প্রজাদের হুকুম দিয়া দিল তারা যেন যত শীঘ্র সম্ভব মাঠে নামে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাটে ঢেঁড়া পড়িল রমণ গোঁসাইর বিনা হুকুমে কেহ যেন জমির কাছে না যায়।

শুধু চাষীরা নয়, দেশসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। তারা বলাবলি করিল, শেষটায় রমণ হল দেশের রাজা দুদিন আগে যা'র পেটে ভাত জুটত না!

খবরটা বৈদ্যনাথকে প্রথমে জানায় হরিচরণ। ভাবিনী কাল অন্ন পথ্য করিবে, হরিচরণ হাটে গিয়াছিল তার জন্য সরু চাল আনিতে। সেই পয়সাও দেয় বৈদ্যনাথ। হাট হইতে ফেরার পথে সে খবরটা বলিলে বৈদ্যনাথ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। বলে, সবই মেঘা রাস্কেলটার কারসাজি।

হরিচরণ থাকিতে থাকিতেই একজন দুইজন করিয়া বৈদ্যনাথের প্রজারা আসিতে থাকে। সকলের মুখেই রমণের ঢেঁড়া দেওয়ার খবর।

কতগুলি কলেরার রোগী সারাইয়া, ঔষধ পথ্য বিতরণ করিয়া এর মধ্যেই বৈদ্যনাথ আবার দেশবাসীর, বিশেষ করিয়া গরিব চাষী মজুরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিল। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, ওরা যে আমাদের মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছে। এখন কি করি করতা?

বৈদ্যনাথ বলিল, আমি না এলে তোমরা কি করতে?

লড়তাম—সমস্বরে উত্তর করে তিন চারজন। সবার উপরে হরিচরণের কণ্ঠ—রক্তবরিষণ হয়ে যেত, করতা। (বোধ হয় বলে রক্তবর্ষণ এই অর্থে)।

অভিরাম বলিল, কিন্তু আমাদের মধ্যেও দুটো দল হয়ে গেছে। বৈদ্যনাথ বলিল, হ্যাঁ, সে খবর শুনেছি। সেইটাই ভাবনার কথা। আচ্ছা কাল তোমরা এসো। আমায় একটু ভাববার সময় দাও।

রাত্রে পেল্লাদি মেঘনাদের বাড়ি হইতে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, নায়েব ফিরবে কবে জান?

পেল্লাদি বলিল, না। শুনেছি মহকুমা থেকে কলকাতায় গিছল, সেখান থেকে আবার মহকুমায় ফিরেছে।

এরকম যাতায়াত করছে কেন, তা নিয়ে বাড়ির লোকেরা কিছু বলাবলি করে না?

পেল্লাদি বলিল, দাসী চাকরের কাছে ওসব কি কেউ ফাঁস করে?

তার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল ; কাজ করিবে কার, কোথায় থাকিবে।

বৈদ্যনাথ পুরানো মনিব, লোক ভাল—দেশে আসিয়াই আবার পাঁচ-জনের মঙ্গল করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ঘর সংসার বলিয়া তার কিছুই নাই। চট্ করিয়া হয়ত আবার একদিন চলিয়া যাইবে।

মেঘনাদের দয়ামায়ার কোন বালাই নাই, একদিন কামাই করিলে মাহিনা কাটে। মুখে বড়মানষি দেখায় বটে কিন্তু প্রাণটা যেন পুঁটি মাছের। তবুও তার উঠতি অবস্থা, বাড়ন্ত গাছের মতন তার সংসারের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।

পেল্লাদি তাই জানিয়াও অনেক কথা গোপন করিয়া গেল। কিন্তু বৈদ্যনাথ কিছু কিছু খবর পাইল বঙ্গর নিকট।

রমণ গোঁসাই নূতন দু'খানা ঘর তুলিয়াছে, অনেকগুলি বলদ কিনিয়াছে। নিজে কৃষাণ রাখিয়া চাষ করাইবে। নায়েবের দয়ায় বংশীরও অবস্থা ফিরিয়াছে। তার আখড়ার ঘর হইয়াছে, ঠাকুরের গায়ে উঠিয়াছে সোনার গহনা।

বৈদ্যনাথ বলিল, ওঃ, তাই বংশীর এত সাহস। আমি ডাকলুম তবু এল না। যাক্, বলদ কেনার কথাই বা তুমি জানলে কি করে? চাষীরা ত কিছু বললে না।

বলদ কিনে অন্য জায়গায় রেখেছে। কদিন আগে পেল্লাদ মাসী ঝড়ুকে বলছিল, তুই বড় হ'লে কোন ভাবনা থাকত না। বাবুর জমিতে কৃষাণ খাটতিস।

বৈদ্যনাথ 'অ' দ্বীপে ভূমিহারা কৃষকের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া আসিয়াছে। তাদের দেশে এতদিন ঐ শ্রেণীর কৃষক ছিল না। মেঘনাদ এবার একসঙ্গে সবাইকে ভূমিহারা করিল। কিন্তু—

এজন্য দায়ী ত শুধু মেঘনাদ নয়, তার চেয়েও বেশী দায়ী সে নিজে। ভাবিতে ভাবিতে বৈদ্যনাথ কেমন যেন চঞ্চল হইয়া ওঠে। ঘুম আসে না ; আসে দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা।

গভীর রাত্রে উঠিয়া সে অমরের কাছে চিঠি লিখিতে বসিল।

মালঙ্গী, বুধবার রাত ১॥টা

ভাই অমর, দেশে এসেই পৌঁছ-সংবাদ দিয়েছি। উত্তর না পেয়ে চিন্তিত আছি। কিন্তু তার পরে চিঠি লেখার সময় পাইনি। সারাক্ষণই কলেরার রোগী নিয়ে ব্যস্ত আছি। মহামারী দেশটাকে এবার উজাড় করে দিয়েছে। তবে আমি এসে অবধি যতগুলি রোগী দেখলাম একজন ছাড়া তাদের সকলের খবরই ভাল। কেউ কেউ আরোগ্য হয়েছেন, কেউ বা আরোগ্যের পথে। যিনি মারা গেছেন তিনি ছিলেন আমার স্তন্যদাত্রী মা। তাঁকে এক ফোঁটাও ওষুধ দিতে পারিনি। দিলেও যে বাঁচতেন একথা অবশ্য বলতে পারি না, কিন্তু আমার মনে ক্ষোভ থাকত না।

যা আশঙ্কা করেছিলাম বর্ণে বর্ণে তা সত্য হয়েছে। আমার নায়েব মেঘনাদ প্রজাদের পথে বসিয়েছে। এই ক'দিন উড়ো উড়ো অনেক খবরই কানে আসছিল। আজ সন্ধ্যায় হাটে ঢেঁড়া পড়ল মেঘনাদের শালার সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে কেউ যেন জমির কাছে না যায়। শুনলাম সে নিজে শালার নামে সমস্ত জমির প্রজাস্বত্ব কিনেছে।

আমার যে কতদূর ক্ষতি করেছে জানি না তবে সেজন্য দুঃখ নেই। দুঃখ যে এতগুলি লোককে আমি পথে বসালাম। তুমি একদিন আমায় স্বার্থপর বলেছিলে। হরিপ্রসাদ নামে কলেজের এক সহপাঠী বলত আত্ম-কেন্দ্রিক। তখন প্রতিবাদ করেছি কিন্তু আজ দেখছি অভিযোগটা সত্য। যে মানুষ খুশির খেয়ালে হাজারো লোককে পথে বসাতে পারে স্বার্থপর সে নিশ্চয়ই, ভারি করুণার পাত্র সে।

আজ অবধি কুন্তীর কোন খবর পাইনি বেচারা যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে। আঘাতটা আমার উপর এসে পড়েছে বুমেরাংএর মতন।

তুমি যা বলেছিলে তাইই ঠিক, কুন্তী আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি। সবই বলেছে ভাবিনী। নিজেই সে আমার কাছে স্বীকারোক্তি করেছে অত্যন্ত করুণ ভাবে।

এই পর্যন্ত লিখিয়া ক্লান্তির বশে চিঠিখানা সে রাখিয়া দেয়। রাত

তখন তিনটা কি আরও বেশী। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

মধ্যে মধ্যে আসে আর একটা শব্দ, বাহিরের বাগানে একটা কাঠ-বিড়ালী কট্ কট্ করে, মনে হয় অন্ধকারকে দাঁত দিয়া কাটিতেছে।

শেষ রাত্তিরে ঠাণ্ডা বাতাসে সে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সকাল হইতে দুপুরের পর পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল রোগী লইয়া। এ-বাড়ি ও বাড়ি ঘুরিল। খাওয়ার পর আবার চিঠি লইয়া বসিল। লিখিল—

আমার ইচ্ছা চাষীদের নিয়ে মাঠে নামা। এদিকে ওরাও চেষ্টা করছে নানাভাবে বাধা দেবার। প্রথম চেষ্টা করেছিল হিন্দু মুসলমানে গোলমাল বাধাবার। মুসলমানরা সংখ্যায় অল্প তাই তাতে কোন সুবিধা করতে পারেনি। তবে মাতব্বর ও দুদান্ত প্রকৃতির কতগুলি লোককে হাত করে ফেলেছে। কৃষকদের দিয়েই কৃষকদেব বাধা দেবে।

মেঘনাদ দেশে নেই, সে কলকাঠি টিপছে বিদেশ থেকে। তবে হয়ত সত্যিকারেব লড়াইয়ের সময় এসে হাজির হবে।

পত্রপাঠ তোমাদের কুশল দিও, তোমাদের পরিবারের সকলের, বিশেষ করে তোমাব পঙ্গু ভাইপোটির আর মাঠাককনের।

আর আশীর্বাদ কর এই গরিব বেচারাদের যেন মঙ্গল হয়। ইতি—

বড়দা

তৃতীয় দিনে জবাব আসিল—

দাদা, তোমার দ্বিতীয় পত্র পেলাম। মাঝে অসুখ বেড়েছিল তাই এতদিন জবাব দিতে পারিনি। আজকাল কিছুটা সুস্থ আছি।

ডাক্তার বলেছেন আরও কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে। শাক আলু আর শশার রস আমার পথ্য। হয়ত এ পথ্যও বন্ধ হবে। চলবে শিরা-পথে গ্লুকোজ সেবন।

কুন্তীর জন্য চিন্তিত রইলাম।

তোমায় আমি স্বার্থপর বলেছি অন্য অর্থে, যে অর্থে আত্মসচেতন

ব্যক্তি মাত্রেই স্বার্থপর অথচ সঙ্কীর্ণ নয়, নিচ নয়। এই আত্মসচেতনতাই তোমাকে জয়ী করবে।

দুনিয়াটা মেঘনাদের ভয়া বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা জয়ী হয় না, এই আমার বিশ্বাস।

যাক্ কুন্তীর খবর পাওয়া মাত্র জানাবে। তোমার প্রিয় সে, তাই আমারও অনেকখানি আপনার।

হিংসা ক'র না যেন। ইতি—

স্নেহের—অমর

এই চিঠি পাইয়াই অমরের রোগের খবর জানার জন্য বৈদ্যনাথ জরুরি টেলিগ্রাম করিয়া দিল।

চিঠিতে লিখিল, তোমার খবর পেয়ে চিন্তিত আছি। আশা করি ফেরত তারে কুশল সংবাদ পাব।

এদিকে মালঙ্গী জলঙ্গী মিয়াপুরে দিনের পর দিন বারুদ স্তূপীকৃত হচ্ছে। অপেক্ষা শুধু স্ফুলিঙ্গের।

তখন দেশের অবস্থা যে কি হবে তা বলতে পারে শুধু ভবিতব্য। তবে আমার বিশ্বাস আছে যে এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আসবে কল্যাণ।

আজ আসি ভাই। নিচে একদল চাষী অপেক্ষা করছে। রোজই এরা আসে, উপদেশ চায়, সাহায্য চায়। তোমার কুশল সংবাদের আশায় রইলাম। ইতি

তোমার—বড়দা

পুঃ—কুন্তীর কোন খবর পাইনি। কবে পাব তাও জানিনা।

আটাশ

জমিতে তাড়াতাড়ি লাঙল দেওয়া দরকার না হইলে আগামীবারের ফসলও পাইবে না। চাষীরা তাই মাঠে নামার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। পরস্পর দেখা হইলে ঐ একই কথা, কি করি ভাই? তোমাদের পাড়ার সবাই কি ঠিক করলে?

সবচেয়ে বেশি জমি মিয়ার মাঠে, একটানা প্রায় হাজার বিঘা। বৈদ্যনাথ ঐ মাঠের মালিক। তার প্রজাদের ইচ্ছা রমণের ঢেঁড়া উপেক্ষা করিয়া মিয়ার মাঠে নামে। তাদের বিশ্বাস অতগুলি লোককে একত্র দেখিলে মেঘনাদও বাধা দিতে আসার আগে পাঁচবার ইতস্তত করিবে।

কয়েকদিন পরের কথা। কলেরার রোগীরা প্রায় সকলেই সারিয়া উঠিয়াছে, এই সময় একদিন মাতব্বর চাষীরা বৈদ্যনাথের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। তাদের সঙ্গে আসিল রতন ওপেল আবীর প্রভৃতি কয়েকটি কৃষাণ কর্মী। প্রথমেই বিরিঞ্চিবাঙ্গা বলিল, আপনি মাঠে নামার একটা ভাল দিন ঠিক করে দাও, কর্তা।

বৈদ্যনাথ বলিল, আমি ত গনৎকার নই, তোমরাই পরামর্শ করে ঠিক কর।

আপনি যা করবে তাতেই আমাদের ভাল হবে—বলিল বেঁটে বাদল।

ভাল ত অনেকই করেছি। তার ফলও তোমরা পাচ্ছ।

তিন চারজন সমস্বরে বলিল, ওকথা ছেড়ে দিন হুজুর।

বৈদ্যনাথ বলিল, তোমাদের ভিতর একদলকে ওরা হাত করেছে, তোমরাও আবার পিছিয়ে যাবে না ত?

বৃদ্ধ জনার্দন বলিল, নিশ্চয় নয়।

রতন এক ক্ষুদ্র ভূস্বামীর পুত্র। সে আসিয়াছে কিষাণ সভার কর্মী হিসাবে। জনার্দন তার দিকে চাহিয়া কহিল, আপনাদের কুমিটি পিছনে থাকলে আমরা কোন শালাকে ডরাই না।

অথচ কিছুদিন আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণগণের গড়া এই কিষাণ

সভাকে চাষীরা সন্দেহের চোখে দেখিত। বলিত, ওরা কুমিটি করেছে নিশ্চয়ই কোন মতলবে।

আজ তাদের উপর কৃষক সমাজের আস্থা দেখিয়া কর্মীরা উৎসাহ বোধ করে।

গ্রামে গুজব মেঘনাদ কলিকাতা হইতে গুণ্ডা আনাইবে। কেহ বা বলে, গুণ্ডা নয়, আনাবে রির্জাভ পুলিস।

কিন্তু পুলিস বা গুণ্ডার চেয়ে বৈদ্যনাথ চাষীদের নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠির ভয় করে বেশী। কতগুলি মাতব্বরকে মেঘনাদ হাত করিয়াছে। তারা হয়ত তার পক্ষ হইয়া চাষীদেরই মাথা ফাটাইবে।

ওপেল বলিল, মোসাদ্দেক মিয়া ছিলেন ভাল মানুষ আর তার ছেলে কাসানি গেল কিনা ঐদলে।

বৈদ্যনাথ বলিল, তাকে ফেরাতে পারব আশা করি। ভয় পরশুরাম-দেরই বেশী।

আবীর বলিল, ন নটা ভাই ওরা পাকা লেঠেল।

জনার্দন বলিল, জেঠতুত ভাই অভি যে দলে থাকবে ওরা তার পালটা দলে যাবেই।

হরিচরণ বলিল, এইত শাস্তরের বিধেন। জ্ঞাত শত্তুরের কলো— তুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সময় থেকে চলে আসছে।

কিছুদিন যাবতই বৈদ্যনাথ ভাবিতেছিল শিবচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করিবার কথা। কিন্তু কেমন যেন বাধবাধ ঠেকিয়াছে। আজ বলিল, চল একবার শিবুদার কাছে যাই। লোকটা ভাল, বুদ্ধিমান, সুপরামর্শ পাওয়া যাবে।

প্রস্তাবটা সকলের সমর্থন লাভ করে, বৈদ্যনাথ কৃষক ও কৃষাণ কর্মিদের লইয়া রওনা হইয়া যায়।

শিবচন্দ্রের শরীর ভাল নয়, তিনি বারান্দায় বসিয়া মকরধ্বজ মাড়িতে ছিলেন। বৈদ্যনাথ বলিল, আপনার কাছে আসতে আমার কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকছিল।

শিবচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, আমাকে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলে সে কথা এখনও ভুলতে পারনি দেখছি। যাক্ ভিতরে এসো, ওরে কেলো, কখানা আসন দিয়ে যা।

আপনার আর জেঠামণির উপদেশ না শুনে ভুল করেছিলুম।

তাতে কি? ভুল মানুষেরই হয়।

কৃষ্ণবর্ণ লম্বা চওড়া এক যুবা খান তিনেক শতরঞ্চি আনিয়া পাতিয়া দিলে শিবচন্দ্র তামাক আনিতে বলিলেন।

বিরিঞ্চি বলিল, আপনার সামনে—

অভিরাম বলিল, আপনি আমাদের বড় লজ্জা দিলেন কর্তা।

বৈদ্যনাথ বলিল, শুনেছেন বোধ হয় মেঘনাদ হাটে ঢেঁড়া দিইয়েছে।

সবই শুনেছি। তুমি কি মেঘনাদকে আমমোক্তার নামা লিখে দিয়েছ?

বৈদ্যনাথ বলিল, না।

হরিচরণ বলিল, গাঁয়ে কিন্তু গুঞ্জন উঠেছিল আপনি তাকে সব লিখিতঞ্চাগে করে দিয়েছ।

বৈদ্যনাথ বলিল, ওঃ মনে পড়েছে, বৈষয়িক কাজে লাগতে পারে বলে আমার যাবার আগে সে দু'টো ডেমিতে সই করিয়ে রেখেছিল।

শিবচন্দ্র কহিলেন, সে ত আরও খারাপ, দেশে গুজব মেঘনাদ তোমার জমিদারি ইজারা নিয়েছে। এর পর থেকে তুমি শুধু মাসহারা পাবে।

বৈদ্যনাথ বলিল, এ সবই মিথ্যে।

শিবচন্দ্র কহিলেন, আশ্চর্য!

আবীর বলিয়া উঠিল, বাবু যেমন আমাদের জন্য লড়বেন, আমরাও লড়ব ওঁর জন্য।

বৈদ্যনাথ বলিল, বিষয় সম্পত্তিতে আমার দরকার নেই। আমি চাই তোমাদের মাটির তোমরা মালিক হও।

শ্রোতারা পরস্পরের দিকে তাকায়। চোখ ইশারায় যেন বলাবলি করে, বলিনি এমন মানুষ হয় না? মানুষ না যেন দেবতা। দেখ না চেহারাও কেমন খোলতাই হয়েছে।

চেহারার কথাটা উঠিয়াছে বৈদ্যনাথ এবার দেশে ফেরার পর। অনুরূপ সিদ্ধান্তও হইয়াছে, ও-রকমটি হয়। ভিতরের মানুষ যেমন যেমন বদলায়,তার চেহারাও সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়।

বৈদ্যনাথ শিবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা আপনার পরামর্শের জন্য এসেছেন। আপনি কি বলেন?

শিবচন্দ্র কহিলেন, আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। মেঘনাদ এমনি ছাড়বে না।

শিবচন্দ্রের ঔষধ খলে পড়িয়াছিল। রতন বলিল, ওষুধটা আমি মেড়ে দিচ্ছি। পাশের বাটিতে ওটা পাচন ত?

হ্যাঁ, ওষুধের সঙ্গে মেশাতে হবে।

রতন পাচন ও ঔষধ মিশাইয়া শিবচন্দ্রের হাতে দেয়, এই সময় আসে বড় এক বারকোশ ভরতি ফুটি শশা ও বাতাসা।

বৈদ্যনাথ ও রতনদের খাবার পৃথক পাত্রে আসিয়াছিল।

তোমাদের আপত্তি নেইত একসঙ্গে খেতে? আর লড়াইর সময় অত বাছ বিচার করাও চলেনা—বলিয়া বৈদ্যনাথ সকলের মুখের দিকে তাকায়।

কিষাণ সঙ্ঘের সভ্যরা বলে, না, আপত্তি আবার কি? কিন্তু চাষীদের মধ্যে ওঠে মৃদু গুঞ্জন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জমিদার বৈদ্যনাথের সঙ্গে এক বাসনে খাইতে তারা ভরসা করে না। উহা উপেক্ষা করিয়া বৈদ্যনাথ সমস্ত খাবারই বড় বারকোশ খানায় ঢালিয়া নেয়।

সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ঐটুকু দিয়া সে অধিকাংশের মন আরও গভীর ভাবে জয় করিল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিল আলোচনা। কি করা উচিৎ সে সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ। অভিরাম বলিল, ঢেঁড়া মেনে চলার মানে না খেয়ে মরা। মরতে আমরা রাজি নই।

বেঁটে বাদল বলিল, নিশ্চয় নয়। চুলোয় যাক হাকিমের হুকুম। আমরা মাঠে নামব।

জনার্দন কহিল, এখুনি নেমে পড়া উচিত, যত শীগগির সম্ভব। আপনি কি বলেন?—বলিয়া সে শিবচন্দ্রের মুখের দিকে তাকায়।

শিবচন্দ্র বলেন, আমি বলি তোমরা নেমে পড়।

আপনার আশীর্বাদ থাকলে আমাদের কেউ রুখতে পারবে না—বলিয়া হরিচরণ পাগড়ি খুলিয়া গামছা খানা মাথার উপর ঘুরায়।

মাঠে নামাই স্থির হইল। বৈদ্যনাথ বলিল, আমি তুটো দিন সময় চাই।

কেন?—প্রশ্ন করে অভিরাম।

তেজচন্দ্র, কাসানি, পরশু-ঢাল, ওদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দেখি কাউকে ফেরাতে পারি কি না।

তার অভিমত সকলের মনঃপূত হইল। সে শিবচন্দ্রের আশীভিক্ষা করিলে তিনি কহিলেন, জয়ী তোমরা-হবেই। এ বয়সেও আমি কোন বিষয়ে হতাশ হই না।

হরিচরণ বলিয়া উঠিল, আমিও দেখতে পাই হুজুর লতুন আলো, লতুন হাওয়ার আমেজ।

বৈকালে বৈদ্যনাথ একাই কেতুর বাড়ি গেল। তেজ তাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আপনাকে একটু চা দিক্ হুজুর?

হুজুর হুজুর কর না তেজ্—ও আমার ভাল লাগে না।

আপনাকে একটু চা আর তু'খানা লুচি দেই?

তা দেও, আমি কেন এসেছি বুঝতে পেরেছ বোধহয়।

হ্যাঁ, আমি জানতুম আপনি আসবেন। ভিতর থেকে একটু আসছি কর্তা—বলিয়া তেজ ভিতরে চলিয়া যায়। সে ফিরিয়া আসিলে বৈদ্যনাথ বলিল, চাষীরা তিন চার দিনের মধ্যেই মিয়ার মাঠে নামতে চায়, তোমায়ও সেই সঙ্গে নামতে হবে।

তেজচন্দ্র বলিল, আমি নামব আগে থেকেই ঠিক আছে। কিন্তু—

কিন্তু আবার কি? তোমার জাতের তুমি মাথা, আগে ছিলেন তোমার বাবা।

বাবা মাথা ছিলেন বটে, আমি সামান্য ত্রেণ—

কিন্তু সবাই তোমায় মানে, তোমার উপর অনেকখানি ভরসা করে। তুমি সঙ্গে থাকলে তারা বল পাবে। চুপ করে রইলে যে?

বৈদ্যনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে তেজচন্দ্রের কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে।

বৈদ্যনাথ বলিল, মাঠে তোমার অনেক জমি।

তা আছে কর্তা।

তবে?

আর পাঁচ জনের সঙ্গে আমি মাঠে নামব কি করে? তাদের ত জমির কাছে যেতে মানা আছে।

তোমার মানা নেই?

আমি যে নায়েব ঠাকুরের কাছে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছি।

কি সর্তে?

আপনি তানাকে জমিদারি ইজেরা দিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি।

আমি ত ইজারা দেই নি।

নায়েব বলেছে আপনি কাশী থাকবেন, তিনি আপনাকে মাস মাস টাকা পাঠাবে।

সবই মিথ্যে। শেষটায় সে আমায় কাশী প্রাপ্তি অবধি ঘটিয়েছে।

মিথ্যে? শুনছি বটে এখন। আগে জানলে এ কাজ কখনও করি? তিন পুরুষের রায়ত আমরা আপনার।

এই সময় দরজার পাশে ছোট্ট একটি কাসির শব্দ পাওয়ায় তেজ আবার বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা দরজার ধারে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল; স্বামী ভিতরে গেলে বলিল, ইনিই আমাদের জমিদার রায়বাবু? ভারি ভাল মানুষ ত। শুনেছিলুম মাথা খারাপ।

তেজ বলিল, মানুষটা খাসা, তবে মাঝে কেমন হয়ে গিছল।

যাক্, তুমি ওর কথায় রাজী হও গিয়ে।

আমিও তাই ভাবছিলুম কিন্তু ও-রাস্তায় বিপদ আছে।

ওদের সঙ্গে না গেলেও কি বিপদ কম?

তেজচন্দ্র আমতা আমতা করে।

সুশীলা বলিল, তুমি আর কিন্তু কর না।

লুচি ও বেগুন ভাজার থালা বৈদ্যনাথের সামনে রাখিয়া তেজচন্দ্র বলিল, আপনার কথাই মাথা পেতে নিলুম।

বৈদ্যনাথ তার দিকে সপ্রংশস দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, আমি জানতুম তুমি রাজী হবে। অমন বাপের ছেলে তুমি।

খাবার খাইতে খাইতে একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, নিশির বৌ তোমার বাড়ি থেকে গেল কেন? কোথায় আছে এখন সে?

এখন কোথায় আছে জানি না। তবে অনেকদিন বনে বাদাড়ে ছিল।

তেজ তারপর পিতৃশ্রাদ্ধের দিনের ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেয়।

বৈদ্যনাথ বলে, এইজন্য গেল সে? তুমি দিলে যেতে?

আমি—আমার হাত ছিল না কর্তা।

তেজচন্দ্র এরপর যাহা বলে তার অর্থ এই যে নিজের ইচ্ছা থাকিলেও কুন্তীকে সে বাড়িতে রাখিতে পারিত না। এই সম্পর্কে সে ছিল একান্তই অসহায়। কুন্তীকে স্থান দিলে মায়ের পেটের বোনও তার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, সমাজ একঘরে করিত। বিশেষতঃ সেটা ছিল তার পিতৃ শ্রাদ্ধের দিন।

কথার উপসংহারে বলিল, কুন্তী মেয়েটা কিন্তু নির্দ্দোষী, বাবু। আমার পরিবার তাকে মায়ের পেটের বোনের মত ভাল বাসত।

তেজচন্দ্রের বাড়ি হইতে বৈদ্যনাথ অনেকটা হাল্কা মন লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

উনত্রিশ

বংশীর আখড়ায় প্রায় একমাস হইতে চলিল, এর মধ্যে একবার শুধু মেঘনাদ আসিয়াছিল। কুন্তী তা'ছাড়া বাহিরের কোন লোকের মুখ দেখে নাই। সারাদিন ছেলেকে লইয়া একা থাকে। মায়ে ছেলেয় কত কথাই

না হয়, সে অর্থহীন প্রশ্ন করে, নীলু অনুরূপ জবাব দেয়। নীলু প্রশ্ন করে, কুন্তী তখন আরও ছোট সাজে, প্রশ্নের অর্থই যেন বোঝে না।

শুধু এই খেলায়ই দিন কাটে না, সময় ভারী মনে হয়। একদিন সে বংশীকে বলিল, এখানে আর কাউকে দেখি না কেন, বল দেখি। তুমিও আর কীর্তন দাও না, ভোগ দাও না।

বংশী বলে, সময় কোথায়? নায়েব ঠাকুর যাবার পর সবই আমার ঘাড়ে পড়েছে। রমণ গোঁসাই ত শালাবাবু, নামে যেমন কাজেও তেমনি। পারে শুধু ভোগ গিলতে। তা'ছাড়া, তুমি যে এখানে আছ লোককে তা জানাতে চাই না। ভাল করিনি কি? কুন্তী সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ে।

সে সারিয়া ওঠার পর হইতে দিনের বেলায় বংশী আখড়ায় থাকে খুব কম, কিন্তু রোজই ঠিক সন্ধ্যার সময় ফেরে। তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া কুন্তীর কাছে আসিয়া বসে। নীলু জাগিয়া থাকিলে তাকে আদর করে, চুমা খায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গল্প, সেদিন কোথায় কোথায় গিয়াছিল, কি কাজ করিয়াছে, লোকে তাকে কিরূপ খাতির করিল,—দেয় তার দীর্ঘ ফিরিস্তি। বলে নিজের জীবন কাহিনী।

সে ছিল ভারি গরিব। নিজের শক্তিতে আজ বড় হইয়াছে, আরও বড় হইবে। অবশ্য এসবের পিছনে আছে নাড়ু গোপালের দয়া।

নিজেকে সে নানা ভাবে বড় প্রতিপন্ন করিতে চায়, কুন্তীর ভাল লাগে না। প্রায় দিনই ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসে, হাই তুলিতে তুলিতে বলে, তুমি এখন শোওগে বোষ্টম।

হ্যাঁ, এই, এই যাচ্ছি, বলিয়া বংশী হয়ত আরও আধ ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। মধুভাণ্ডের গায়ে মৌমাছির মতন কুন্তীর পাশ ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। খালি ভন ভন করে।

সে একদিন আসিয়া ভাবিনীর অসুখের খবর দিলে কুন্তী কহিল, এ্যাঁ! দিদির ওলাউঠো? আমায় ত যেতে হবে তা হলে। দেখার কেউ নেই, ভাসুর ভোলানাথ পুরুষ।

বংশী একটু হাসিয়া বলিল, কোথায় যাবে ? আমি হরিচরণকে বলেছিলুম, তোমার পরিবারের অসুখ, বাড়িতে কোন মেয়েছেলে নেই। এবার ভাজকে আনিয়ে নাও।

কুন্তী কহিল, কেন, তিনি জানে না যে আমি এখানে থাকি ?

পাগল, তা কি বলতে পারি ?

তোমার কথা শুনে কি বললে তিনি ?

বললে, ওদের নাম আর মুখে এনো না। ওরা গেছে না যেন আপদ বালাই দূর হয়েছে।

তিনিও এই কথা বললে ? সবই আমার বরাত, বলিয়া কুন্তী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

বংশী বলিল, এ চাকাও ঘুরবে। ভাল মানুষ তুমি, এমন সোঁদর, বলিয়া সে কুন্তীর পিঠে হাত বুলায়। সে সুস্থ হইয়া ওঠার পর আদর করে এই প্রথম।

কুন্তীর মন এত খারাপ ছিল যে সে টেরই পাইল না।

পরদিন সন্ধ্যার পর হরিধ্বনি শুনিয়া কুন্তী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কে গেল ?

লকাইর মা।

কুন্তী বলিল, এ্যাঁ, তিনিও মারা গেল, অমন ভাল মানুষটা।

গ্রামে কোথাও তার ঠাঁই নাই। এক মুঠি উদরান্নের জন্য পাঁচ দরজায় এঁটো কাঁটা ঘাঁটিয়া বেড়ায়, থাকে বনে বাদাড়ে সেই সময়ে লকাইর মা কতদিন তাকে ডাল ভাত দিয়াছে। শীতের সময় দিয়াছিল একটা চট।

কুন্তীকে ভাত দিলে ছেলে বৌ রাগ করে। পাঁচ জনে বলে, 'ওলার জীবটাকে তুমিই তা'হলে বাঁচিয়ে রেখেছ।' সেই জন্য সে এঁটো ফেলার ছুঁতা করিয়া ঘটি ভরতি ভাত ডাল আনিয়া তাকে দিত। ঐ অন্নের প্রতীক্ষায় কুন্তী তার ঘরের পিছনে অন্ধকার বাঁশ ঝাড়ের নিচে দাঁড়াইয়া থাকিত।

উহা মনে পড়ায় তার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে।

বংশী বলে, ছিঃ কেঁদো না, তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারি না। কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।

কুন্তী কোনরূপ উষ্মা বা বিরক্তি প্রকাশ করে না, সে শুধু তার দিকে তাকায়। জল্ জল্ করে তার স্নিগ্ধ সুন্দর দুটি চোখ। বংশীর ইচ্ছা করে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া পিষিয়া একেবারে নিজের হাড় মাসের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়।

সে তাকে কাছে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতেই কুন্তী ঘুমন্ত ছেলের পিঠে দুম দুম করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় নীলু তার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। কাঁদেনা, কোন শব্দ করে না। ভাবে, একী?

আর বংশী উঠিয়া যায় ছোট্ট একটা 'ধুত্তোর' বলিয়া।

কুন্তীর ঘুম আসেনা। আকাশ পাতাল অনেক কিছুই মনে পড়ে, লকাইয়ের মায়ের স্নেহ, নিজের অদৃষ্ট, জায়ের কলেরা, ভাসুরের অসন্তোষ, রায় বাবু। ক্রমে ক্রমে নিজের দুর্ভাগ্য আর সব ভাবনাকে ছাপাইয়া যায়। বর্তমান সব চেয়ে বড় হইয়া ওঠে। এখানে আসিয়া কী ভুলই না করিয়াছে! আসিয়াছে পেটের জ্বালায়, রোগ-যাতনায়। এখন উপায়?

ভোরে প্রথমেই দেখা বংশীর সঙ্গে। হঠাৎ তাকে চেনা যায় না। এক রাত্রে চেহারা কী অদ্ভুত বদলাইয়াছে। চোখ দুটা যেন জলন্ত দু'টুকরা আঙার। তার আঁচে সমস্ত মুখ কালো হইয়া গিয়াছে। দেখিলে ভয় করে।

বংশী অন্যদিন সকালে হাত মুখ ধুইয়া ঠাকুর প্রণাম করে। নীলুকে আদর করে। কুন্তী তাকে খাবার দেয়।

খাওয়ার পর বংশী হাসিয়া বলে, চললুম এখন।

কোন্ দিন কখন ফিরিবে তাহাও বলিয়া যায়। আজ কোন কথা বলিল না। একবার ঠাকুর ঘরের সামনেও আসিল না। নিঃশব্দে বাহির লইয়া গেল।

নীলুর ঘুম ভাঙিলে সে আসিয়া দেখে মা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে বলে, খাব মা, খিদে।

কুন্তী উঠিয়া তার হাত মুখ ধোয়াইয়া গুড় মুড়ি দেয়। বলে, এ খাবারও আর বেশী দিন পাবি না, বুঝলি ?

নীলু একবার চোখ তুলিয়া মায়ের দিকে তাকায়। কি যেন ভাবিয়া আবার খাইতে আরম্ভ করে।

কুন্তী ভাবে কি করিবে। এই মুহূর্তে এখান হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবে যাইবে কোথায় ? মনে পড়ে বন-বাদাড়ের জীবন। পোকা মাকড় জন্তু জানোয়ার তখন নিত্যসঙ্গী— কতদিন ছিনা জোঁকে ধরিয়াছে। পিঁপড়ায় মাংস ছিঁড়িয়া দিয়াছে। গা ঘেঁষিয়া সাপ চলিয়া গিয়াছে।

পেটে ভাত ছিলনা। মধ্যে মধ্যে পেটের ভিতরটা যেন পোকায় কুরিয়া খাইত। লোকের এঁটো কাঁটা খুঁটিয়া বেড়াইত। নীলু একদিন ভিক্ষালব্ধ সেঁকা রুটি খাইতেছিল, একটা শিয়াল আসিয়া ছোঁ মারিয়া রুটিখানা লইয়া গেল। কুন্তী তার মুখ হইতে ছিনাইয়া আনিল। খানিকটা অংশ শিয়ালে খাইয়াছিল, বাকীটা খাইল সে নিজে। নীলু চেঁচাইতে লাগিল, মা আমার খাবার কেড়ে নিলে।

নিজের পরনে কতগুলি গেরো দেওয়া এক খানা মাত্র কাপড়। ছেলেটা দিগম্বর। বর্ষাবাদল শীত রৌদ্র তাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত। বর্ষায় ভিজিত, শীতে কাঁপিত। লকাইর মায়ের দেওয়া চটে শীত নিবারণ হইত না। কুন্তী তখন ছেলের গা নিজের গায়ে ঘষিত। তাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিত, গলাটা জড়িয়ে ধর্‌ ত, আরও কাছে আয়।

এই আশ্রয় ছাড়িলে আবার সেই জীবন শুরু হইবে। এখন দুবেলা খাইতে পায়। তার দুখানা কাপড় হইয়াছে, নীলুর একটা জামা। যখন ভাসুরের আশ্রয়ে ছিল তখনও অনেক সময়ই একসঙ্গে দুখানা কাপড় থাকিত না। নীলুকে নেংটা থাকিতে হইত।

কিন্তু এই ভাত কাপড়ের বিনিময়ে বংশী যাহা চায় দিনের পর দিন তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিনা স্বার্থে সে তাকে আশ্রয় দেয় নাই। কেহ দেয়ও না, বিশেষ করিয়া কোন যুবতী নারীকে। আগেই তার বোঝা উচিত ছিল।

এখন উপায়? বংশীর চাহিদা সে মিটাইতে পারিবে না, জীবন গেলেও পারিবে না। এখানে থাকাও চলিবে না। কিন্তু যাওয়ার সবচেয়ে বাধা দুর্বল শরীর। রোগ সারিয়াছে কিন্তু এখনও উঠিলে পা টলে, মাথা ঘুরিয়া যায়। বুক ধড়ফড় করে। একটানা অত লম্বা উপবাস, তার উপর অসুখ। বিশ পঁচিশ দিনে কতই বা সারিবে?

সারাটা দিন এই ভাবে কাটে। খালি ভাবনা আর ভাবনা। কি করা উচিত, কোথায় যাইবে? মুখে ভাত রোচে নাই। কয়েকবার নীলুকে প্রশ্ন করিয়াছে, কি করি বল্ ত। বেরিয়ে পড়ব না থাকব আরও দু'দিন, নায়েব ঠাকুর আসা অবধি?

নীলু মাথা নাড়িয়া হাঁ না দুইই বলিয়াছে।

না, এখানে আর থাকব না, চ বেরিয়ে পড়ি, -বলিয়া দুই দুইবার ছেলের হাত ধরিয়া সে নালার উপরের তালগাছটা পর্যন্ত আসে। আবার ফিরিয়া যায়। ছেলেকে বলে, বাবু দেশে থাকলে নিশ্চয় যেতুম। তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়তুম। তিনি ফেলে দিতে পারতেন না, তোকে ত তিনিই পরাণ দিয়েছেন। ভারি দয়ার শরীল।

শুধু আজ নয়, অনেকবারই তাঁকে মনে পড়িয়াছে।

বিপদের সময় মালঙ্গী জলঙ্গী শ্রীপুরের দুঃখীরা বৈদ্যনাথের কাছে সাহায্য পায়। এটা যেন তাদের জন্মগত অধিকার। বিপদে সকলেই তার কথা ভাবে। কিন্তু কুন্তী এমনিও ভাবিত; সে আজও ভুলিতে পারে নাই নীলুর অসুখের সময় বাবুর সেই নম্র ভদ্র কাতর চাহনি। গাঁয়ের জমিদারের আকর্ষণ তার অবচেতন মনে অদ্ভুত এক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যদিও সময় সময় তার উপর রাগ হইত। ভাবিত, তার এই দুর্দশা ত সেই করিয়াছে। ঘরে ঘরে হাহাকার তুলিয়াছে।

পরক্ষণেই আবার বড় হইয়া উঠিত কৃতজ্ঞতা, হয়ত বা তার চেয়েও বড় কিছু।

দুপুরের বেশ কিছু পরে সে যখন একবার নালা পর্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসে, ছেলেকে বলে, বাবু দেশে থাকলে এখানে পড়ে থাকতুম নারে, ঠিক সেই সময় বৈদ্যনাথ প্রজাবাড়ি হইতে ফিরিতেছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল পাঁচ ছয় হাত মাত্র জঙ্গলের। কিন্তু এই ব্যবধান শুধু জঙ্গলের নয়; এ যেন তার ভাগ্যলিপির তৈরি যবনিকা।

বংশী আখড়ায় ফিরিল বেশ একটু রাত করিয়া। হাত মুখ ধুইয়া অন্য দিনের মতন ঠাকুর প্রণাম করিল না। কুন্তীর কাছে খাবারও চাহিল না। সোজাসুজি নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

তার চলার ভঙ্গী ধরন ধারন সবই আজ অভিনব। চলে সাপের মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া। দু' একবার গলা খাঁকারি দেয়। সেও কেমন যেন অস্বাভাবিক। কুন্তী ভাবে, বৈষ্ণব নেশা করিয়া আসিয়াছে নাকি ?

রাত বাড়ে। চারধারের নিস্তব্ধতাও বাড়ে। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক ও শিয়ালের হুক্কা হুয়া ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না।

নীলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কুন্তীর চোখে ঘুম নাই। বংশীর সাড়া শব্দ নাই বটে। কিন্তু সে জানে বৈষ্ণব জাগিয়া আছে। তার এই নীরবতায় বেচারীর আরও বেশী ভয় করে।

বংশী একটা কথা বলিলে, একবারটি আসিয়া খাবার চাহিলে তার এতটা ভয় হইত না। সে ভাবে তার দুঃখের কী শেষ নাই ? ভগবানকে ডাকে, আর যে পারি না ঠাকুর, নেও, তুমি আমায় নেও।

হঠাৎ বাহিরে বিকট কান্নার রোল উঠিল। কে, কাঁদে কে এখানে ?

শব্দ হয় আরও জোরে। ছোরার আঘাতে অন্ধকার যেন ফুকাইয়া ওঠে। কুন্তীর সর্বাঙ্গ ঘামিয়া যায়, শীত করে, সে কাঁপে।

তৃতীয়বার কান্নার রোলে মনে হইল মানুষের কণ্ঠ নয়। অনেকগুলি

শকুন ছানার চীৎকার। আজ দুপুর অবধি এখানে ত শকুন ছিল না। তারা আসিল কোথা হইতে, আসিলই বা কেন?

সে স্থির করিল এখানে আর থাকিবে না, কপালে যা আছে তা আসুক। আখড়া হইতে এই মুহূর্তে বাহির হইয়া যাইবে।

সে নিঃশব্দে ছেলেকে কোলে তুলিল। বাহিরে আসিল পা টিপিয়া টিপিয়া। উঃ কী অন্ধকার! চেনা জায়গায়ও অন্ধের মতন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিতে হয়। এক পা, দু পা, তিন পা—পা ফেলে আস্তে আস্তে। হঠাৎ মনে হয় পাশের ঝোপ ঝাড় যেন তার গলা টিপিয়া ধরার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে।

বংশীও কাল রাত হইতে বিরক্তিতে এবং রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। এই মেয়েটার জন্য সারা রাত ঘুমাইতে পারে নাই। আস্তাকুঁড়ের মেয়ে কিন্তু কী সতীপনা! আচ্ছা।

ভাবে আর দাঁতে দাঁত ঘষে, সেই শব্দ শুনিলে কুন্তী কেন, যে কোন জোয়ান পুরুষও ভয় পাইত।

বংশী সকালে বাহির হইয়া দু পা যাইতে না যাইতেই শুনিল বৈদ্যনাথ তেজচন্দ্রকে হাত করিয়াছে। চাষীদের মধ্যে তার অবস্থা ভাল, তার বাবাকে সবাই মান্য করিত। তেজু হাত ছাড়া হইলে তার দেখাদেখি আরও অনেকে ঐ দলে যাইবে।

যত অনর্থের গোড়া ঐ বদ্যিবাবু। বদ্যি সারা গ্রামের লোককে পথে বসাইয়াছে, কুন্তীর এই অবস্থাও তারই জন্য অথচ কুন্তী তাকে ভালবাসে। তার কথাবার্তার মধ্যে সেই ভালবাসা ধরা পড়িয়া যায়।

বংশী ভাবে অমন কুৎসিত মানুষটাকে লোকে ভালবাসে কেমন করিয়া?

দুপুর যাইতে না যাইতেই শুনিল তাদের দলের আরও দুই তিন জন বিরোধী দলে যাইয়া মিশিয়াছে। মেঘনাদের নিকট হইতে এদের প্রত্যেকের নাম করিয়া সে কিছু কিছু টাকা নিয়াছিল। তাদের ঘুষ দিতে হইবে, দেনা দিতে হইবে, এই সব ছিল ওজুহাত। মেঘনাদের মতন সেও

বলিত, 'রাজ্য রক্ষার ইহাই ত নিয়ম' অথচ তাদের একজনও সে টাকা পায় নাই। মেঘনাদ ফিরিলে তাকে হিসাব দিবে কেমন করিয়া?

সে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গেল, অনেক বুঝাইল কিন্তু একটি লোককেও দলে টানিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় আখড়ায় ফেরার পথে মেঘনাদের বাড়িতে শুনিল দু'এক দিনের মধ্যেই সে বাড়ি ফিরিবে। সে বাড়ি ফিরিলে বিপদ সব রকমে। সবচেয়ে বড় বিপদ কুন্তীকে পাওয়ার কোন আশাই থাকিবে না। মেঘনাদ তাকে পুরাপুরি দখল করিয়া নিবে, তাকে এখানে রাখিবেও না।

এতদিন সে তাকে পুষিল, তার সেবা করিল। সে কি শুধু মেঘনাদের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য? না, না, এ কল্পনাও তার পক্ষে দুঃসহ।

* * * *

বংশী কুন্তীর সামনে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

কুন্তী কহিল, আমি যাব। পথ ছেড়ে দাও।

কোথায় যাবে?

তা জানি না।

ভাবছ বদু রায়ের কাছে যাবে। তা হবে না। হতে দেব না আমি।

বাবু এসেছে নাকি?

হ্যাঁ এসেছে, বলিয়া বংশী হা হা করিয়া হাসিয়া ওঠে। শকুনের হাসিরই মতন।

কুন্তী ভাবে এও তার অদৃষ্ট। বাবু আসিয়াছে আর সেই খবর সে জানে না। জানিলে কবে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইত। সে আবার চলিতে আরম্ভ করিলে বংশী তার বাহুতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া খোঁচা দেয়। কুন্তী চীৎকার করিয়া ওঠে।

বংশী বলে, যাবার চেষ্টা কর না। তাহলে তোমার ছেলেকে খুঁচিয়ে মারব।

না, না, যাব না।

এই সময় নীলুর ঘুম ভাঙিল।

কুন্তীর হাত বাহিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে টের পায় নাই, কিন্তু বংশী টের পাইয়া চুষিয়া চুষিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া দিল। রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হইলে বলিল, যাও ছেলেকে রেখে এস, আমি ঠাকুর-ঘরে যাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

নীলু নীরবে দেখিতেছিল, বংশীর কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া কহিল, রাগেনা মামা, রাগেনা।

বংশী গর্জন করিয়া উঠিল, ধুত্তোর মামার নিকুচি করেছে।

কুন্তী ছেলেকে লইয়া আবার ঠাকুর-ঘরে চলিয়া যায়। হতভাগিনীর তখনও ভরসা ছিল, বংশী এখনও নাড়ুগোপালকে ভয় করে। দেবতার সামনে যাইয়া কোন মহাপাতক সে করিবে না।

ঠাকুরের আসন ছুঁইয়া সে বসিয়া রহিল, ছেলেকে বলিল, তুইও ঘুমোস নি।

কিন্তু নীলু ঘুমাইয়া পড়ে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বংশী ধৈর্য হারাইয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ডাক ছাড়িল, কই, ছেলে ঘুমোল?

দু' তিন বার কুন্তী কহিল, না ঘুমোয় নি।

আরও কিছুক্ষণ পরে এক লাথিতে ঠাকুর-ঘরের দরজা ভাঙিয়া বংশী ঘরে ঢুকিল।

কুন্তী তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

ত্রিশ

পরের দিন চাষীরা মাঠে নামিবে। সারা গ্রামময় উত্তেজনা চলিয়াছে, কি হয়, কি হয় এই ভাব।

মেঘনাদ দেশে ফেরে নাই, বৈদ্যনাথ তাই রমণ গোঁসাইর বাড়ির দিকে রওনা হইল। দেখা যাক্ শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় আসা যায় কি না।

উজ্জ্বল প্রভাত। গাছপালা লতা পাতায় রোদের ঝিলিমিলি। মালঙ্গী

হাসিতেছে। জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে অনন্তর পুকুর পারে বিরিঞ্চি বাগ্দী বঁড়শি হাতে বসিয়া। সাধনারত মানুষের মতন তার দৃষ্টি ন্যস্ত বঁড়শির ফাতনার দিকে। মৎস্যের সাধনায় সে রোজই দু' তিন ঘণ্টা এই রকম বসিয়া থাকে।

ফাতনার পাশে জলের মধ্যে টুপ করিয়া একটা ঢিল পড়িল। বিরিঞ্চি চাহিয়া দেখে অদূরে দাঁড়াইয়া ঝড়ু খিল খিল করিয়া হাসিতেছে।

তুই হারামজাদা আমার দু'সেরি মাছটাকে তাড়িয়ে দিলি—বলিয়া বিরিঞ্চি তাকে তাড়া করিয়া যায়। পরক্ষণেই বৈদ্যনাথকে সামনে দেখিয়া হাত জোড় করিয়া বলে, পেন্নাম করতা। আর কেউ এল আমাদের দিকে ?

বৈদ্যনাথ বলিল, এসেছে ক'জন। তবে পরশু ঢাল রাজী হচ্ছে না।

বিরিঞ্চি বলে, সে এলে খুব ভাল হ'ত। তার সঙ্গে আরও অনেককে পাওয়া যেত। যাক্, আপনি যাচ্ছ কোথায় ?

রমণের ওখানে। দেখি যদি কিছু সুবিধে হয়।

বিরিঞ্চি বলিল, তা' হবেনা। তা' ছাড়া গোঁসাইর ক্ষ্যামতাই বা কি ?

আরও কিছুটা যাইয়া বৈদ্যনাথ দেখিল বড় এক ঝাঁকা ভরতি লাউ-বেগুন লইয়া পরশুরাম বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে। সম্ভবতঃ বাজারে যাইবে। বৈদ্যনাথ পুরানো মনিব, তার নিকটে তারা নানা রকমে ঋণী অথচ দু'দিন আগেও তার মুখের উপর কড়া কথা বলিয়াছে, সেই লজ্জায় পরশুরাম রাস্তা হইতে মেঠো পথে নামিয়া গেল।

ঝড়ু ছিল বৈদ্যনাথের সঙ্গে। সে আগে আগে যাইতেছিল। পরশুরামকে ডাকিয়া বলিল, কি ঢাল মশাই, বাবুকে দেখে নামলে যে ? লজ্জা ঠেকছে বুঝি ?

লজ্জা ? লজ্জা আবার কিসের ?—পরশুরাম মুখে বলিল বটে কিন্তু বৈদ্যনাথকে নিকটে দেখিয়া আরও দ্রুত হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

ঝড়ু তাকে শুনাইয়া শুনাইয়া হাসে। পরশু পিছন ফিরিয়া বলে, আচ্ছা মজা টের পাবি। বেটা পেল্লাদির ডিম।

ঝড়ু আরও জোরে হাসিয়া ওঠে। সে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে আর একটা কঞ্চি দিয়া নরম লতাপাতার উপর সপাং সপাং মারে, বিশেষ করিয়া বড় বড় কচু পাতার উপর। কোঁকড়ানো পাতা দেখিয়া আনন্দ পায়। ভাবে চাষীতে চাষীতে লাঠালাঠি হইলে কী মজাই না হয়। সে ডাল পালার আড়াল হইতে দেখিবে। ঢিল ছুঁড়িবে। যেখানে কলহ কোলাহল, লাঠালাঠি সেখানেই ঝড়ু দূরে থাকিয়া বুড়া আঙুলের নখে নখ ঠুকিয়া বলে,—

নারদ নারদ খেংরা কাঠি
লেগে যা নারদ ঝটা পটি।

খানিকটা পরে রাস্তার ডাইনে পূর্ণর পোড়ো ভিটায় একটা শিয়াল দেখিয়া ঝড়ু তাকে তাড়া করে। শিয়ালটা দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটাইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। সেও পিছু পিছু দৌড়ায়।

পূর্ণর ভিটা ও বংশীর আখড়ার মাঝখানে নালার সামনে আসিয়া শিয়ালটা চেঁচায়, হুক্কা হুয়া, হুক্কা।

জানোয়ারটা হয়ত পিছু ফিরিয়া কামড়াইবে ঝড়ু তাই থমকিয়া দাঁড়ায়। পরক্ষণেই আখড়ার গাব গাছের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে, ওঃ বাবা।

সেই শব্দ বৈদ্যনাথের কানেও গেল। সে দ্রুতপদে আগাইয়া যাইতে ছিল, ঝড়ু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বংশীর আখড়ায় মড়া ঝুলছে, করতা।

মড়া!—বৈদ্যনাথের বুক ছাঁৎ করিয়া ওঠে। সে বলে, মড়া ঝুলছে কী রে?

হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখে এনু, মাইরি বলছি।

বৈদ্যনাথ ঝড়ুর পিছু পিছু আসিয়া দেখিল আখড়ার পশ্চিমে, নালার পাশে গাব গাছে কুন্তীর মৃত দেহ ঝুলিতেছে। গলায় রক্ত মাখা কাপড়ের ফাঁস। দুই পা বাহিয়া রক্তের ধারা নামিয়াছে, যেন কালো কালো কতগুলি জড়ুল।

বৈদ্যনাথ স্তব্ধ ভাবে ঐ দিকে তাকাইয়া থাকে। তার মাথা ঘোরে।

রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ যেন কালো হইয়া যায়। ধাক্কাটা সামলাইয়া লইতেই বেশ কিছু সময় লাগে। তার পর চাহিয়া দেখে ঝড়ু ভিটায় নাই আর শিয়ালটা তখনও চেঁচাইতেছে। উহা কান্না কি উল্লাস বোঝা যায় না।

আবার তার চোখ পড়ে শবের উপর। শবের চোখ নিচে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে, পায়ের তলায় নীলু ঘুমাইয়া। মরণ মুহূর্তে হতভাগিনী হয়ত ছেলের দিকে চাহিয়াছিল।

ঝড়ু খবরটা বেতার বার্তার মতন ছড়াইয়া দেয়।

সর্বপ্রথম আখড়ায় আসিয়া পৌছিল বিদেশী এক মাঝি।

বংশীর আখড়ার কাছেই বড় খাল। খালের সাঁকোয় নৌকা বাঁধিয়া মাঝিটি দাঁতন করিতেছিল। সাঁকোর উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে ঝড়ু ডাকিয়া বলে, পুব দিকের ঐ ভিটেয় মড়া ঝুলছে।

মাঝি বলিল, ইয়া আল্লা। মড়া! কোথায় মড়া?

ঝড়ু অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়।

খালের ওপারেই পরশুরামের সঙ্গে দেখা। বাজারের পথে ওপেলের সঙ্গে সে লাউ বেগুনের দরদস্তুর করিতেছিল।

নির্শির বৌ খুন, বংশীর আখড়ায়—বলিয়া ঝড়ু তাদের পাশ দিয়া ছুটিয়া যায়।

বেচা-কেনা আর হয় না। পরশুরাম বংশীর আখড়ায় আসিয়া দেখে বৈদ্যনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। ঝুলন্ত শবের দিকে চাহিয়া আরও একটি লোক। পরশু গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, কে তুমি?

ভিন দেশী মাঝি বলিল, বাড়ি গাজীর হাটে, সাঁকোয় নৌকো বেঁধে দাঁতন কচ্ছি এমন সময় একটা ছেলে বলে গেল—

বিদেশী মানুষ তাদের গাঁয়ের বধূর নগ্ন দেহ দেখিবে পরশু ইহা সহ্য করিতে পারে না। বলে, যাও, যাও। এখানে বেকুফের মতন দাঁড়িয়ে কেন?

এই, এই, যাচ্ছ—বলিয়া মাঝিটি দাঁতন করিতে করিতেই চলিয়া যায়।

পরশু বৈদ্যনাথকে বলিল, এই দেখ্ন্ কর্তা আর পেল্লাদ মাসীর ছেলে রাস্তা দিয়ে আসছিলেন, আর এর মধ্যে—

বাকীটা সে গুছাইয়া বলিতে পারিল না। বৈদ্যনাথ বলিল, প্রথম দেখেছে ঝড়ু।

একটি দুইটি করিয়া লোক আসে, শুরু হয় অনুমান, আলোচনা।

খুন না আত্মহত্যা? আত্মহত্যাই হবে। না খুন। দেখছ না ফাঁসের কাপড়ে রক্তের দাগ? মেরে লটকে রেখেছে।

তা—বৌটা এখানে কেন?

পরশুরামের ভাই বলরাম বলিল, মাস দেড়েক আগে ওর সঙ্গে বংশীকে গুজুর গুজুর করতে দেখেছি।

দেখেছি আমিও—তাকে সমর্থন করিল বেঁটে বাদল।

দেড়মাস লুকিয়ে রেখে এই কাণ্ড করল! শালা ভণ্ড—

ঐ শালারই কাজ।

গেল কোথায় বেটা?

লোকে ক্রমেই উত্তেজিত হয়। বংশীর খোঁজ পড়ে। একদল ঘর দেখে, আর একদল খোঁজে বাগান। ঝোপ ঝাড়ে লাঠি দিয়া আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে চলে কুন্তীর জন্য আক্ষেপ। বাঁচিয়া থাকিতে বেচারীকে যারা এক মুঠা ভাত দেয় নাই, আশ্রয় চাহিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে তারা কতই না ক্ষোভ করে। কুন্তীর প্রশংসায় মুখর হইয়া ওঠে।

বেলা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ও বাড়ে। লোক আর ধরে না, ঝোপ ঝাড় ভাঙিয়া কাঁটার খোঁচা উপেক্ষা করিয়া তারা স্থান করিয়া লয়। বংশীর সন্ধান না মেলায় রাগের চোটে ঘরের চালা পিটায়, গাছের ডাল ভাঙে, ছোট ছোট গাছ উপড়াইয়া ফেলে।

একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, দে শালার ঘরে আগুন লাগিয়ে।

ঠিক্ ঠিক, দে আগুন।

তেজচন্দ্র ও পরশু প্রভৃতি কয়েকজন তাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল। তারা না শোনায় শেষটায় পুলিসের ভয় দেখাইল।

পুলিস শুধু আগুন দেওয়ার অপরাধেই ধরিবে না, হয়ত খুনের দায়েও পড়িতে হইবে।

পুলিসের ভয়ে লোকগুলি নিবৃত্ত হয়। ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক। এরই মধ্যে কেহ অনুরূপ খুনের কাহিনী জুড়িয়া দেয়, কেহ বলে ভূতের গল্প। একজন বলিল, বৌটাও ভূত হবে। তবে ছেলের ঘাড়ে না চাপলে বাঁচি।

একটি প্রৌঢ় বাজারের ফেরতা পথে শশা চিবাইতে চিবাইতে আসিয়াছিল। সে কুন্তীর শবের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া বলিয়া উঠিল, হোঃ হোঃ হোঃ। এই জন্যই বলেছে সংসার অনিত্য। তার পরই গান ধরিল,

মিছা মায়া, কাঞ্চন কায়া—

বৈদ্যনাথ স্থাণুর মতন বসিয়াছিল। সামনে কুন্তীর নগ্ন শব, তার উপর আলো পড়িয়াছে। হাজারো লোক চাহিয়া আছে ঐ দিকে। দৃশ্যটা তাকে যেন বিদ্রূপ করে। এ তার কৃত কর্মের শাস্তি—মহাপাতকের।

একবার ভাবে শবটা ঢাকিয়া দিলে কেমন হয়। পাশে ছিল রতন, তাকে কথাটা বলিতেই শিবচন্দ্র কহিলেন, না দরকার নেই।

তিনি যে কখন পাশে আসিয়া বসিয়াছিলেন, স্নেহ মাখানো দৃষ্টি দিয়া আশীর্বাদ করিতেছিলেন বৈদ্যনাথ জানিত না। করুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিলে বৃদ্ধ হাত তুলিয়া ধৈর্য ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন।

ঠিক এই সময় নীলুর ঘুম ভাঙে। সে এদিক-ওদিক তাকায়। বোধ হয় ভাবে, 'এত মানুষ, এরা কারা'? চোখ রগড়াইয়া আবার দেখে।

জনতা নিস্তব্ধ, তাদের দৃষ্টি ন্যস্ত নীলুর উপর। তারা তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করে।

গাব গাছটার দিকে চাহিয়া সে মা-মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মায়ের কোলে ওঠার জন্য দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। অনেকেই স্থির থাকিতে পারিল না, তাদের চোখ জলে ভরিয়া গেল কেহ কেহ শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শান্ত স্বভাব শিবচন্দ্র, শত বিপদেও যিনি অনড়, তাঁরও চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল।

একটু পরে নীলু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, মা খিদে পেয়েছে, দে, খাবার দে।

মা নড়ে না। তাঁর কথার কেহ জবাব দেয় না দেখিয়া নীলু কাঁদিয়া ফেলে।

তেজচন্দ্র তার কৃষাণ রাম্বকে বলিল, যা বাড়ি থেকে চারটি ভাত নিয়ে আয়। ভাত না পেলে মুড়ি।

রাম্ব রওনা হইলে আবার ডাকিয়া কহিল, ঘরে পাটালি আছে, দীপুর মায়ের কাছ থেকে চেয়ে আনবি।

দীপু তার মেয়ের নাম।

পরশু বলিল, তোর গিয়ে কাজ নেই, রেসো। আমার বাড়ি অনেক কাছে, বলা গিয়ে ছুটে নিয়ে আসুক।

আরও তিন চার জন নীলুর খাবার আনিতে যাইতেছিল কিন্তু তাদের সকলের আগে বলরাম ছুটিয়া গেল। দুধ ভাত কলা লইয়া ফিরিলও খুব তাড়াতাড়ি। সে-ই মাখিয়া দিল।

নীলু একগ্রাস মুখে দিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া মুখ নাড়িতে থাকে। সেই গ্রাসই আর ফুরায় না। মাকে দেখে আর কি যেন ভাবে, খানিকক্ষণ পরে বাটিটা সরাইয়া রাখে।

বলরাম বহু চেষ্টা করে। তার পর আসে পেল্লাদি। সেও চেষ্টা করে, 'সোনা খায়, মণি খায়'—বলিয়া সাধ্য সাধনা করে। কিন্তু কোন ফল হয় না।

বৈদ্যনাথ বলিল, ছেলেটিকে এখানে আনান শিবুদা।

শিবচন্দ্র কহিলেন, এখন থাক্, তুমি বরং মাথাটা ধুয়ে ফেল।

আপনি জানেন না দাদা, ওই ছেলেটির আমার উপর দাবি কত খানি।

শিবচন্দ্র জানিতেন অনেক কিছুই। কিন্তু সে সম্পর্কে কোন আভাস না দিয়া শুধু কহিলেন, তোমার দায়িত্ব শুধু ওর উপর নয়। তুমি স্থির থাকার উপর হাজারো লোকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

এই সময় পূর্বর ভিটার প্রান্তে শোনা গেল, ওরে আমার ভাইরে, আমার নিশিরে।

হরিচরণ চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসে। পিছনে ঝড়ু। গাব গাছটার দিকে চাহিয়াই হরিচরণ ইস্ বলিয়া জিভে কামড় দেয়। ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কাঠ গড়ার আসামীর মতন মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

জনতার মধ্য হইতে কে যেন বলে, বৌটো বেঁচে থাকতে সোয়ামী স্ত্রীতে মিলে কী জ্বালানোই জ্বালিয়েছে।

ও নয়, জ্বালিয়েছে ওর বৌ—কে একজন প্রতিবাদ করিল।

হরিচরণের কানে এসব যায় না। সে নীলুর কাছে আসিয়া বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে ডাকে, নীলু, নীলু চন্দর, বাপ আমার।

নীলু জেঠার কোলে উঠিয়া, গলা জড়াইয়া তার বুকের উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে।

জনার্দন জিজ্ঞাসা করিল, এতক্ষণ ছিলে কোথায়, হরিচরণ ?

হরিচরণ বলিল, নীলুর জেঠিকে নিয়ে সামতায় গিছলুম।

কে একজন মন্তব্য করিল, গিছল ঘাড়ের ভূত নামাতে।

ঝড়ু বলিল, তাই তোমাকে বাড়ি পাইনি। বাবু আমায় পাঠিয়েছিল, তোমাকে খপর দিতে।

ভাবিনীর শরীর কাহিল, উঠিয়া বসিতে কষ্ট হয়। ঘরে দেখাশুনার কেহ নাই, তার উপর সামনেই মেঘনাদ ঠাকুরের সঙ্গে লড়াইর সম্ভাবনা। হরিচরণ তাই ভাবিনীকে তার বাপের বাড়ি সামতায় রাখিতে গিয়াছিল। প্রহর খানেক বেলায় কুন্তীর খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

ভাবিনী বলিয়াছিল, আমায়ও নিয়ে চল, তাকে দিয়াছে এক ধমক। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম।

এদিকে চাষীদের মধ্যে শুরু হইয়াছিল নূতন এক আলোচনা। কথাটা তোলে পরশুরাম। সে বলে, আমাদের এই কেলেশের কারণ আমরা নিজেরা।

তার পাশেই ছিল বেঁটে বাদল। সে বলিল, কি রকম ?

আমাদের মধ্যে মিল থাকলে এত দুদ্দশা হত না।

দুদ্দশা আনে ত বাবুরা—বলিল বিরিঞ্চি বাগ্দী।

পরশু কহিল, আমরা এককাট্টা থাকলে বাবুদের ক্ষ্যামতা কি যে দুঃখ দেয়, লাচিয়ে বেড়ায় ?

তিনচার জন বলে, ঠিক ঠিক।

এই সময় হরিচরণ আসিয়া পড়ায় আলোচনাটা চাপা পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে পরশুরাম আবার শুরু করে। সে মাতব্বরদের একজন নয়, শিক্ষিত নয়, বক্তা ত নয়ই, গোঁয়ার গোবিন্দ মানুষ, যা ভাবে বলে, যা বলে সেই রকম কাজ করে। কথায় কথায় রাগে। তার লাঠিকে ভয় করে সবাই। সে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ঐযে রূপসী বৌটো ঝুলছে, একরত্তি ছেলেটা খিদের সময়ও ভাত মুখে তুলতে পারছে না, ওরা ত অভিশাপ দিচ্ছে আমাদের।

হরিচরণ চীৎকার করিয়া উঠিল, শাপ দিচ্ছে আমায়। দূষী হনু আমি। যা কিছু পাপ—

পরশুরাম কহিল, বড় দূষী ত তুমিই, তবে দোষ তোমার একলার নয়, আমাদের সবার।

ঠিক ঠিক—বলিয়া উঠিল জনার্দন। জ্ঞাতি বৃদ্ধের এই সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া পরশুরাম এবার গলা চড়াইয়া দিল, বৌটি ঝুলছে কেন ? পেটে ভাত ছিল না, পরনে তস্ত্র ছিল না, ছেলে খিদেখিদে বলে কেঁদেছে, ও ম'ল সেই জন্য।

বেঁটে বাদল বলিল, ওকে ত মেরেছে বংশী।

পরশু বলিল, হয়ত মেরেছে। কিন্তু পেটে ভাত ছিল না বলেই ত ও তার ফাঁদে এসে ধরা দিয়েছিল। খালি ভাতের জন্য। কিন্তু তাকে ভাত হারা করল কে ? করেছে রায়বাবু, করেছে মেঘু ঠাকুর।

বক্তৃতার মোড় এই ভাবে ঘুরিয়া যাওয়ায় বৈদ্যনাথের জন্য শিবচন্দ্রের ভাবনা হয়। তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকান, জনতার উপর পরশুর

কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। দেখেন কেহ কেহ তার সঙ্গে সায় দিয়া মাথা নাড়িতেছে।

পরক্ষণে পরশুরামই তাঁকে আবার নিশ্চিন্ত করিল। সে বলিল, দোষ কিন্তু আমাদেরই বেশী। আমরা কোন কাজে এক জোট হতে পারি না। এক মুঠো খুদ কণার জন্য, দু' পয়সা বেশী মজুরির জন্য নিজেদের বেচে ফেলি।

বৃদ্ধ জহুরী বলিয়া উঠিলেন, বাঃ রে বেচারামের বেটা। তুই যে কলকাতার ন্যাতা বাবুদের মতন বাক্যির তোড় বইয়ে দিলি।

অভিরাম পাশের লোকদের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার কাকামশাইও কম ছিল না। শুনেছি একবার শ্বশুর বাড়িতে কোন্ বংশ বড়, তার শ্বশুরের না আমাদের এই নিয়ে ঝাড়া এক পহর বক্তিমে দিয়েছিলেন।

পরশুরাম প্রসন্নমুখে জেঠতুত ভাইয়ের দিকে তাকায়।

বিরিঞ্চি বলে, নেতারা বক্তিমের সময় মিছে কথাই বেশী কয় কিন্তু পরশু আমাদের হক কথা কইছে।

অভিরাম বলিল, তা আর বলবে না? বংশটাই যে আমাদের হক কথার।

বলরাম বলিল, তা ঠিক, যেমন পরশুদা, তেমনি অভিদা।

বৃদ্ধ জনার্দন বলিল, কিন্তু নায়েবের যা দাপট আমরা কি তার সঙ্গে পারব, পরশু?

পরশুরাম বলিল, দাপটে গারমিণ্টোর চাইতে আর বেশী নয়। চাষীরা সেই গারমিণ্টোর সঙ্গেও ত লড়াই করে।

তেজচন্দ্র বলে, বাদায় গারমিণ্টো আর লাটদারের সঙ্গে লড়াই করে তারা জিতেছে।

জিতব আমরাও—বলিল বিরিঞ্চি বাগ্দী।

ঠিক ঠিক।

পরশু কহিল, নায়েব আমাদের মধ্যে চিড় ধরিয়েছে, কাজেই ত এই অবস্থা।

বেঁটে বাদল বলিল, তা হলে লড়াই করাই ঠিক, পরশুদা ?

নিশ্চয়।

অভিরাম বলিল, মনে নেই বে ঢ়কা'র বাড়িতে আমরা ইট সুরকির গাঁথা দেয়ালের মতন দাঁড়িয়ে ছিলুম ?

পরশু বলিল, তার আগে হরিচরণদার বাড়িতে দাঁড়াতে পারলে নিশির বৌকে ওখানে ঝুলতে হত না।

আলবৎ। আলবৎ।

উত্তেজনা জনতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ধ্বনি ওঠে, বন্দেমাতরং, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সমুদ্র-কল্লোলের মতন সেই উৎসাহ ফুলিয়া ফাঁপিয়া রৌদ্রদগ্ধ আকাশকে যেন ছাইয়া ফেলে।

এই কলরবের মধ্যে দারোগা আসিয়া উপস্থিত। তার সঙ্গে শাস্তি চৌকিদার ও দুটি বন্দুকধারী সিপাই। শাস্তি মালঙ্গীরই লোক, হরিচরণদের স্বজাত সে। কুন্তীর খবর লইয়া থানায় গিয়াছিল।

পুলিসের দলের সঙ্গে ঝড়ুও লাফাইতে লাফাইতে আসিল, কিছুক্ষণ আগে যেমন আসিয়াছিল হরিচরণের সঙ্গে।

দারোগা অল্প বয়স্ক, সদ্য কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। লোকটি ভদ্র। তিনি শিবচন্দ্র ও বৈদ্যনাথকে চিনিতেন না। তাঁদের পরিচয় শুনিয়া শিবচন্দ্রকে কহিলেন, ওদের থামিয়ে দিন, নইলে কাজের অসুবিধা হবে।

শিবচন্দ্র দাঁড়াইয়া হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা শান্ত হয়। দারোগা শাস্তির কাছে ব্যাপারটা আগেই শুনিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বৈদ্যনাথ ও ঝড়ুকে প্রশ্ন করেন, প্রথম কখন কোন্ অবস্থায় তারা শব দেখিয়াছে।

প্রথমে বলে ঝড়ু—শিয়ালের পিছু পিছু ছোটা হইতে শুরু করিয়া পরশুরাম ও ওপেলের লাউ বেগুনের দরদস্তুর করা পর্যন্ত সব জিনিসের উপরেই বেশ রং চড়ায়।

তারপর জবানবন্দি দেয় বৈদ্যনাথ ও পরশুরাম।

দারোগা হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করেন, ছোট ভাইয়ের বৌকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে কেন?

হরিচরণ আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি বরাবরই ওদের ভাল বাসি।

তবে, বৌটির স্বভাব চরিত্র কি?

সমস্বরে আট দশ জন বলিয়া উঠিল, না, না করতা।

তার মধ্যে তেজচন্দ্রের কণ্ঠই সব চেয়ে উঁচু।

দারোগা শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করেন, আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?

তিনি কিছু বলার আগেই অনেকে এক সঙ্গে বংশীর নাম করিল।

দারোগা বলিলেন, আপনারা একে একে বলুন।

বংশীর সম্পর্কে আরও কতগুলি প্রশ্ন করিয়া তিনি হরিচরণের নিকট হইতে নীলুকে নিজের কোলে তুলিয়া তার দু' হাত-ভরতি ল্যাবেনচুষ দেন। নীলু তার মুখের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া একটা ল্যাবেনচুষ মুখে পুরিয়া দেয়।

দারোগা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম কি খোকন?

নীলু।

হরিচরণকে দেখাইয়া দারোগা বলেন, উনি তোমার কে হন?

জেঠামণি।

তোমার মাকে কে মেরেছে খোকন?

পায়েস মামা।

কে, কে?

বড়, খুব লম্বা—

নীলুর পায়েস মামার চেহারার সঙ্গে বংশীর চেহারা অনেকটা মিলিয়া যায়।

দারোগা বলেন, কি করে মারল?

বুকে উঠল। গলাটা—এইটুকু বলিয়া শিশু নিজের গলা টিপিয়া ধরে।

দারোগার মুখ দিয়া বাহির হইল, সোয়াইন।

বংশী তার ন্যাড়ুগোপালকে মধ্যে মধ্যে যে পায়েসের ভোগ দিত সে সম্পর্কেও কয়েকজন সাক্ষ্য দিল।

রিপোর্ট লিখিয়া শব নৌকায় তুলিয়া দারোগা রওনা হইয়া গেলেন। ঝড়ু প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী নদীর পার দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। তিনি তাদের প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

জায়গাটা খাঁ খাঁ করে। শত শত মানুষ তবু অদ্ভুত ফাঁকা। ডালে ডালে পাতায় পাতায় বাতাসের শর্ শর্ শব্দ, মনে হয় মানুষ গুলার পাঁজরে পাঁজরে ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে।

একজন দুইজন করিয়া লোক কমিতে আরম্ভ করে। ভীড় ফাঁকা হইতে দেখিয়া পরশুরাম ডাকিল, দাঁড়াও তোমরা বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি, ওপেল ও বেঁটে বাদল প্রভৃতি এক সঙ্গে যাইতেছিল। তারা ফিরিয়া দাঁড়াইলে পরশুরাম বলিল, তাহলে তোমরা মাঠে নামছ কবে ?

কাল।

পরশু।

এক একজন এক এক কথা বলে। মোটের উপর তারা যত শীঘ্র সম্ভব মাঠে নামিতে চায়।

পরশুরাম এবার তাকায় বৈদ্যনাথ ও শিবচন্দ্রের দিকে।

বৈদ্যনাথ শিবচন্দ্রকে বলে, ওদের বলুন দিন তিন চার পিছিয়ে দিতে।

শিবচন্দ্র জনতাকে তার অভিপ্রায় জানান। সকলেই বলে, বেশ, তাই হবে।

মিয়ার মাঠ। ঝলমল করে আলো। বাতাসে ঘাসের ফুল কাঁপে। চাষীরা মাঠে আসিয়াছে, হিন্দু মোছলমানই বেশী, খৃষ্টানও কয়েকজন।

সবাই তারা বৈদ্যনাথের প্রজা। তাদের কলরবে, গরুর হাম্বা হাম্বা ডাকে মাঠটা মুখরিত। আলোচনা চলে নানা রকম।

ওরা বাধা দিতে আসে না কেন?

হয়ত এখনই আসবে।

আর এসেছে, ভয় পেয়ে গেছে আমাদের দেখে।

মেঘনাদ বাড়ি ফিরেছে, সে ত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়।

হরিচরণের কোলে নীলু। সে কিছু বোঝে না, এদিক ওদিক তাকায়।

সকলের শেষে আসিল বৈদ্যনাথ, সঙ্গে শিবচন্দ্র। বৈদ্যনাথ হরিচরণের কাছে আসিয়া নীলুকে কোলে তুলিয়া লইল। চাষীদের উদ্দেশে বলিল, আমার জমিদারী স্বত্ব তোমাদের ছেড়ে দিলুম।

কৃষক ও কিষাণ কর্মীরা চোঙা লাগাইয়া খবরটা মাঠময় ছড়াইয়া দেয়। জনতা জয়ধ্বনি করে, জয় হিন্দ। ইন-কিলাব জিন্দাবাদ্। বেঁচে থাকুন আমাদের জমিদার।

পরশুরামের অনুরোধে প্রথমে লাঙল ধরিল হরিচরণ।

জহুরী বলিল, নীলুকে কোলে তুলে ওর হাতে লাঙল দেও।

জয়ধ্বনির মধ্যে প্রথমে চলে হরিচরণের লাঙল। নীলুর কচি হাতে লাঙলের অগ্রভাগ দেখিয়া বৈদ্যনাথের মনে হয়, ছোট্ট এই শিশুটি যেন নবযুগের প্রতীক। সে শুধু কুষ্ঠীর ছেলে নয়, হরিচরণের ভাইপো নয়, সে উদ্গাতা নূতন এক ভাব চেতনার।

হরিচরণের সঙ্গে সঙ্গে লাঙল চালায় শত শত চাষী। কেহ তাদের বাধা দিতে আসে না।

আগের দিন রাত্রে মেঘনাদ বাড়ি ফিরিয়াছিল। চাষীদের জয়ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে তার বুক কাঁপে। ভয় হয়, এই বুঝি ওরা তার বাড়ি আসিয়া চড়াও হইল।

পুলিস আসামী খোঁজ করিতে পারিল না। অনেকদিন পরে মালঙ্গীতে

একটা উড়ো খবর রটিল, পাশের গ্রামের কে নাকি বংশীর মতন একজন লোককে কলিকাতার রাস্তায় নগ্ন অবস্থায় ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়াছে। লোকটা পাগল। সে ডাষ্টবিনের এঁটো ময়লা কুড়াইয়া খায় আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে, আয়, ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে আয়। এখনও এলি না?

বলে আর শূন্যে লাথি মারে।

সমাপ্ত